দেশ সমাজ রাজনীতি

শাহ আবদুল হান্নান

দেশ সমাজ রাজনীতি

শাহ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দেশ সমাজ রাজনীতি

শাহ্ আবদুল হান্নান

কামিয়াব প্রকাশন

www.pathagar.com

প্রকাশক
মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
কামিয়াব প্রকাশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
ফোন ৭১১২২০৪

প্রকাশকাল
মার্চ ২০০৩

মূল্য
একশত টাকা মাত্র
(একদামে ক্রয় করুন)

প্রচ্ছদ
প্রিন্টমাস্টার
নয়াপল্টন, ঢাকা, ফোন ৯৩৪৪২৩০

মুদ্রণ
কালারমাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং

ISBN. 984-8285-13-X

Desh Samaj Rajniti by Shah Abdul Hannan. Published by kamiub Prokashon, Banglabazar. Dhaka 1100. Phone 7112204. Fixed price : Tk 100.00 Only.

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমি যখন সচিবের পদ থেকে অব্যাহতি নেই তখন একটি দৈনিকের (দৈনিক অর্থনীতি) এডিটরিয়াল বোর্ডের সাথে যুক্ত হই। সেখানে বছর দুইয়ের মতো তাদের পরামর্শক হিসাবে কাজ করি। সে সময় আমি দেশ সমাজ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখা লিখি। সেগুলো বিভিন্ন সময়ে সেই পত্রিকার সম্পাদকীয় হিসাবে প্রকাশিত হয়। সে সবসহ বিভিন্ন সময়ে আমার লেখা বেশ কিছু প্রবন্ধ এই বইতে একত্রিত করা হয়েছে।

আমার গোটা জীবনের যে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা, আমাদের দেশ, সমাজ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের উপর আমার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেগুলো উক্ত লেখাসমূহে ফুটে ওঠে। সমাজের ঘটে যাওয়া ক্ষুদ্র বিষয় থেকে শুরু করে দেশীয় সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এসবে তুলে ধরা হয়। আমাদের দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও তার সমস্যা, নির্বাচন ও তার সমস্যা, ঋণ খেলাপি সমস্যা, আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্যা রয়েছে সে ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত, পুলিশকে উন্নত করার জন্য কি করা যেতে পারে, এসব বিষয়গুলোসহ শিক্ষাঙ্গণে আমাদের যে সমস্যা রয়েছে তার উপর আমার চিন্তা ভাবনা সেই লেখাগুলোতে ছিল এবং এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। এছাড়া গ্রাম্য বিচারের নামে যে সমস্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে সে বিষয়ের উপরও আমি সে সময় লিখি এবং পতিতাদের উপর আমার দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরি। সরকার কাঠামোর পর্যায়ে আমাদের যে পৌরসভাসমূহ আছে সেগুলোর উন্নয়নে কি করা যেতে পারে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগণের আর কি উদ্যোগ থাকতে পারে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগণকে আরো কিভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে, ছিন্নমূলদের কিভাবে পুনর্বাসন করা যায় সে সম্পর্কেও আমি লিখেছি।

একই সঙ্গে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখি এবং এর সংস্কারের কথাও উল্লেখ করি। ফিল্ম সেন্সর বোর্ড এর ব্যর্থতা ও তার সমস্যা, অশ্লীল সামগ্রীর প্রসার এবং এর ফলে সমাজে কি অসুবিধা হচ্ছে, সমাজের কি ক্ষতি হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে সমাজের কি দায়িত্ব, রাষ্ট্র বা সরকারের কি দায়িত্ব, সে সম্পর্কিত উল্লেখও এখানে আছে।

www.pathagar.com

তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় যেমন আলজেরিয়ার তৎকালীন পরিস্থিতি, ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার তৎকালিন পূর্ব তিমুর সম্পর্কে আমি আলোকপাত করি। সেই সব বিষয়ের কয়েকটি লেখায় সাময়িক প্রভাব থাকলেও তার মধ্যে সুদূরপ্রসারি অন্তর্নিহিত মূল্য আছে। সেই কারণেই সেই সব সম্পাদকীয়ও আমি পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের মধ্যে তুরস্কের বিষয়ও এসেছে। আবার দক্ষিণ এশিয়ায় মানব পাচার, চোরাচালানের আন্তর্জাতিক প্রভাব এবং কি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত সেগুলো তাতে স্থান পেয়েছে। তেমনিভাবে কসোভো সমস্যা সম্পর্কেও একটি প্রবন্ধ এখানে আছে।

আমি বিভিন্ন সময়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখি। তার মধ্যে কতকগুলো এই বইতে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে আছে ইসলামের দিকে কেমন করে আহবান করতে হবে, ইসলামের ম্যাসেজকে কিভাবে তুলে ধরতে হবে, আমাদের উম্মাহকে কিভাবে শক্তিশালী করতে হবে এবং ইসলামের মূলভিত্তি কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যার মূলনীতি কি হবে, ইসলামের যে আইন শাস্ত্র (উসূল আল ফিক্‌হ) রয়েছে তাতে এ ব্যাপারে কি বলা হয়েছে— এই বিষয়গুলো কয়েকটি প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এখানে একটি প্রবন্ধ আছে মুহাম্মদ আসাদের 'দি ম্যাসেজ অব দি কুরআন' এর উপর। এটি এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীর। 'দি ম্যাসেজ অব দি কুরআন' বর্তমান শতাব্দীতে লিখিত প্রধান কয়েকটি তাফসীরের মধ্যে একটি। এর লেখক মুহাম্মদ আসাদ ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী একজন বিখ্যাত জার্মান চিন্তাবিদ ও স্কলার।

তেমনিভাবে, ফতোয়ার উপর একটি প্রবন্ধ আছে। যাতে ফতোয়ার ঐতিহাসিক বিবর্তন ও এর আইনগত প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। আমরা জানি যে, গত প্রায় পনের বছর ধরে ফতোয়া বাংলাদেশে একটি বড় ধরনের ইস্যু হিসাবে দেখা দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রচারণাও চালানো হয়েছে। ফতোয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামে-গঞ্জে কোথাও কোথাও নানারকম বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কিছু নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এখানে ফতোয়া বিষয়ক প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে ফতোয়া নতুন কিছু নয়। কুরআনে তার উল্লেখ আছে। ইসলামী আইনের উন্নয়ন ফতোয়ার মাধ্যমে হয়েছে। যে কোন ভাল জিনিসেরই কিছু অপব্যবহার

www.pathagar.com

থাকতে পারে। এক্ষেত্রেও কিছু অপব্যবহার আমাদের দেশে হয়েছে। তার কারণেই শুধু ফতোয়াকে বাদ দেওয়া মুসলিম উম্মাহ বা মুসলিম জাতির জন্যে কোনভাবেই সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং এই অপব্যবহার রোধ করার জন্য কি করতে হবে তাও বলা হয়েছে।

'ইসলামের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ এখানে আছে। এটা বর্তমান যুগে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয়। আধুনিক বিশ্বে একদিকে রয়েছে একনায়কতন্ত্র অন্যদিকে রয়েছে রাজতন্ত্র। এসবের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা তুলে ধরা দরকার। একই সঙ্গে আধুনিক গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি তাও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা দরকার। এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে ইসলামে একনায়কতন্ত্রের কোন স্থান নেই। রাজতন্ত্রেরও সত্যিকার অর্থে কোন স্থান নেই—তার পক্ষে যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন। গণতন্ত্রের মৌল চিন্তাধারা জনগণের সরকার হবে, পরামর্শক ভিত্তিক শাসন হবে, মৌলিক অধিকার রক্ষিত হবে, নির্বাচিত সরকার হবে, প্রেস ফ্রিডম থাকবে—এসব বিষয় ইসলামের মূল চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এসব কারণেই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে আধুনিক কালের ইসলামের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদরা গণতন্ত্রকে ইসলামের নিকট গ্রহণীয় বলেছেন—শুধু তত্ত্বগত একটি দু'টি বিষয় ছাড়া। তেমনিভাবে এই পুস্তকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপর আমার লেখা আছে। যাদের সম্বন্ধে লিখেছি তারা বর্তমানে কেউ জীবিত নেই। তাদের সঙ্গে পরিচয়ের ভিত্তিতে আমি আমার মূল্যায়ন ব্যক্ত করেছি। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, জনাব মনসুরউদ্দীন প্রমুখ।

এই বইতে মাদরাসা শিক্ষার উপর একটি প্রবন্ধ রয়েছে যেটা আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। মাদরাসা শিক্ষা আমাদের শিক্ষার একটি বড় অংশ। এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো আমরা মাদরাসা শিক্ষা থেকে কি চাই? আমরা কি এই শিক্ষাকে মূলধারার একটা অংশ করতে চাই, না শুধু আলেম তৈরি করার কেন্দ্র হিসাবে রাখতে চাই? যদি একে আমরা আমাদের দেশের শিক্ষার মূলধারার একটি অংশ করতে চাই, তাহলে এখানে উন্নয়নের অত্যন্ত প্রয়োজন হবে। বিশেষ করে আমি বলেছি যে মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষিতরা খুব বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারবে, যদি তারা বর্তমান যে পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়ছে তাতে পরিবর্তন করে। যেমন বর্তমানে যে দাওরাহ হাদীস আছে তার সাথে যদি 'অর্থনীতি'র উপর একটি দাওরাহ খোলা হয় তাহলে তারা

www.pathagar.com

দেশের জন্য অনেক ভূমিকা পালন করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে এরকম আরো কয়েকটি দাওরাহ খোলা প্রয়োজন হবে। আমাদের আলিয়া মাদরাসা সিস্টেমে বর্তমান চারটি কামিল ডিগ্রী দেওয়া হয় (তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ এবং আদব)। এই চারটির সঙ্গে যদি আমরা আরো চারটি কামিল খুলতে পারি কোর্সগুলোর পুনর্বিন্যাস করে (যেমন অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কম্পিউটার সায়েন্স) তাহলে এই আলিয়া মাদরাসাগুলো ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে বলে মনে করি। যেহেতু আলিয়া সিস্টেমেই ইতোমধ্যে নিচের দিকে বিজ্ঞান আছে সেহেতু এখানে কম্পিউটার সায়েন্সের কামিলও সম্ভব।

যাই হোক, এই বইতে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি এবং রাজনীতি সম্পর্কে আমার শিক্ষা ও চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছে। আমি মনে করি এই বইটি পাঠে পাঠকগণ কিছু না কিছু উপকৃত হবেন এবং তা দেশের জন্য কাজে লাগবে।

এই পুস্তক রচনায় আমাকে যারা বিশেষভাবে সাহায্য করেছে তার মধ্যে রয়েছে আমার স্নেহভাজন ও অতি আদরের ওমর বিশ্বাস, যে নিজে একজন কবি লেখক। এছাড়াও অনেকের ভূমিকা রয়েছে। তাদের সবাইকে আমি স্বীকৃতি জানাচ্ছি, দোয়া করছি এবং কল্যাণ কামনা করছি।

আর বইটি বের করার জন্য কামিয়াব প্রকাশন ও এর স্বত্বাধিকারী ভ্রাতৃদ্বয় মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন ও মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শাহ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

সূচিপত্র

দেশ সমাজ

১. সুন্দরী প্রতিযোগিতা অর্থনীতি বা নারীর জন্য কি কল্যাণকর? /১৩
২. ব্যাপক ধর্ষণ মানবিকতার এক বিপর্যয় ঃ কি করা যায়? /১৬
৩. সামাজিক সমস্যা ও আমাদের দায়িত্ব /২০
৪. অহেতুক গ্রেফতার ও জনগণের অসুবিধা /২৪
৫. শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবার ছুটি অসঙ্গত /২৬
৬. চোরাচালান প্রতিরোধে বিদ্যমান নীতিমালা /৩০

আন্তর্জাতিক

১. তুরস্কে মানবাধিকার লঙ্ঘন /৩৭
২. দক্ষিণ এশিয়া মানব ব্যবসা বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন /৩৮
৩. কসোভো সমস্যার ইতবৃত্তি ঃ সমাধান কি? /৪৫

ইসলাম

১. ইসলামী দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি /৪৮
২. শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ্ গঠন /৫২
৩. দি মেসেজ অব দি কুরআন ঃ এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীর /৫৭
৪. হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা দুর করার উপায় /৬৩
৫. যাকাত আদায়ের বিধান /৬৬
৬. উসূলে ফিকাহ'য় কুরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাখ্যার মূলনীতি /৬৯
৭. ফতোয়া ঃ ঐতিহাসিক ও আইনগত প্রেক্ষাপট /৭৭
৮. ইসলাম ও জননিরাপত্তা /৮২
৯. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নবী জীবনের শিক্ষা /৮৪
১০. হজ, ঈদুল আযহা ও কোরবানি /৮৮
১১. কোরবানীর ঈদ প্রসঙ্গে /৯৩
১২. জুমআর খুৎবার মান উন্নয়ন /৯৫

www.pathagar.com

রাজনীতি ও গণতন্ত্র

১. ইসলামের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র /৯৬
২. বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ /১০২
৩. রাজনৈতিক চিন্তাধারার এক অধ্যায় /১০৪

শিক্ষা

১. সহ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শালীনতার সমস্যা /১০৮
২. কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কিছু প্রস্তাব /১১১
৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নির্যাতন /১১৩

বিশিষ্ট ব্যক্তি

১. প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ /১১৪
২. আমার শিক্ষক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন /১১৬
৩. ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঃ আমি যেভাবে পেয়েছি /১১৮
৪. আমার দেখা শহীদ আবুল কাশেম /১২১

বিবিধ প্রসঙ্গ

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি /১২৩
২. প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ /১২৬
৩. নারী-পুরুষের সম্পর্কের কিছু বিচার্য বিষয় /১২৮
৪. মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের ইতিহাস /১৩১

সম্পাদকীয়

১. প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন /১৪০
২. নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করা প্রসঙ্গে /১৪২
৩. ঢাকার যানজট নিরসন করতে হবে /১৪৪
৪. ট্রাক ছিনতাই রোধ করুন /১৪৬
৫. পৌরসভাগুলোর দক্ষতা বাড়াতে হবে /১৪৮
৬. উন্নয়নে জনগণের উদ্যোগ /১৫০
৭. কিডনি রোগের চিকিৎসার সুযোগ /১৫২
৮. চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে /১৫৪

www.pathagar.com

৯. জবাবদিহিতা নিয়ে কথা /১৫৬
১০. আবারো হরতাল! /১৫৮
১১. অশ্লীল সামগ্রীর প্রসার /১৬০
১২. দুর্নীতি দমনে নতুন চিন্তা-ভাবনা /১৬২
১৩. মাদক চোরাচালান ও বাংলাদেশ /১৬৪
১৪. রাজধানীর ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সমস্যা /১৬৬
১৫. পুলিশের কর্মকাণ্ড ও প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন /১৬৮
১৬. সাংবাদিক ও পুলিশের ভুল বোঝাবুঝি /১৭০
১৭. তদন্ত রিপোর্টের ওপর ব্যবস্থা নিন /১৭২
১৮. ঋণখেলাপি সমস্যা ও জবাবদিহিতা /১৭৪
১৯. ব্যাংকিং আইন সংশোধন /১৭৬
২০. ভুল অপারেশনের খেসারত /১৭৮
২১. বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঃ আমাদের করণীয় /১৮০
২২. ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ব্যর্থতা /১৮২
২৩. পণ্য রফতানি হ্রাস রোধ করুন /১৮৪
২৪. বৈদেশিক সাহায্য নীতি প্রসঙ্গে /১৮৬
২৫. প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন চালু /১৮৮
২৬. মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক বেতন ভাতা /১৯০
২৭. প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ /১৯২
২৮. চাঁদাবাজরা অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে /১৯৪
২৯. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সভা /১৯৬
৩০. অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে অবশ্য করণীয় /১৯৮
৩১. জনকল্যাণ ও জবাবদিহিতামূলক স্বাস্থ্যনীতি /১৯৯
৩২. নকল ও ভেজাল পণ্যের সমস্যা /২০১
৩৩. পুলিশ কেন ইউসিবিএল-এ ব্যর্থ হলো? /২০৩
৩৪. বাংলাদেশের নিরাপত্তার আঙ্গিকসমূহ /২০৫
৩৫. মীরবাগের টুকু হত্যা /২০৭
৩৬. ওসমানী উদ্যানের দুরাবস্থা /২০৯

www.pathagar.com

৩৭. মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বস্তি উচ্ছেদ /২১১
৩৮. ছিন্নমূলদের পুনর্বাসন /২১৩
৩৯. ছিনতাই প্রতিরোধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা প্রয়োজন /২১৫
৪০. স্যাটেলাইট টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ /২১৭
৪১. গেস্ট হাউজে অবৈধ কাজকারবার /২১৯
৪২. ঢাকায় ছিনতাই রোধ /২২১
৪৩. দোকানের তৈরি খাবারের মান /২২৩
৪৪. জনসংহতি সমিতির কংগ্রেস /২২৫
৪৫. এগার জন উপার্যের যুক্ত বিবৃতি /২২৭
৪৬. বাংলাদেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা /২২৯
৪৭. অকল্যান্ডে অপেক সম্মেলন /২৩১
৪৮. তুরস্কে কুর্দি পরিস্থিতিতে নতুন মোড় /২৩৩
৪৯. ইন্দোনেশিয়ার নির্বাচনী ফলাফল /২৩৫
৫০. আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি /২৩৭
৫১. চেচনিয়া পরিস্থিতি /২৩৯
৫২. আবদুল্লাহ্ ওজালানের মৃত্যুদণ্ড /২৪১
৫৩. অসলো সম্মেলন ও ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান /২৪৩
৫৪. পূর্ব তিমুরের গণভোট ও স্বাধীনতা /২৪৫
৫৫. আলজেরিয়ায় সমঝোতার জন্য গণভোট /২৪৭
৫৬. মালয়েশিয়ার নির্বাচনী ফলাফল /২৪৯
৫৭. পূর্ব তিমুরের সর্বশেষ পরিস্থিতি /২৫১
৫৮. ইন্দোনেশিয়ায় সর্বশেষ নির্বাচনী অবস্থা /২৫৩
৫৯. ইরাক অবরোধ প্রত্যাহার করুন /২৫৫

www.pathagar.com

সুন্দরী প্রতিযোগিতা
অর্থনীতি বা নারীর জন্য কি কল্যাণকর?

সুন্দরী প্রতিযোগিতা কে বা কারা কখন এবং কোথায় প্রথম শুরু করে সে ইতিহাস আমার জানা নেই। তবে পাশ্চাত্যেও এসব প্রতিযোগিতার শুরু ৬০/৭০ বছরের বেশি হবে না। পাশ্চাত্যেই এ প্রতিযোগিতা প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ভারত, জাপানসহ বিভিন্ন প্রাচ্য দেশেও এটি চালু হয়। বর্তমান ৬০টির মত মুসলিম দেশের মধ্যে কেবল ২/১টিতে এটি চালু আছে। কোন কোন দেশে সরকার, কোন কোন দেশে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। বাংলাদেশে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আমলে এদেশে কখনো সুন্দরীদের কোন প্রতিযোগিতার কথা শোনা যায়নি। সাম্প্রতিককালে কোন কোন মহল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর আজীবন লালিত বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনপূর্বক সুন্দরী প্রতিযোগিতা আয়োজনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এটি করার অনুমতি সরকার দেয়নি। তাই প্রথমে লন্ডনে এক প্রতিযোগিতা করে বাংলাদেশী সুন্দরী নির্বাচিত করা হয়, যে পরবর্তীতে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অবশ্য 'ফ্যাশন শো'র নামে সুন্দরী প্রতিযোগিতা ঢাকায় কিছুটা শুরু হয়েছে।

সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কি দেশের অর্থনীতি বা নারী সমাজের সম্মান বৃদ্ধি পায়? সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মূলত নারীদের শরীর প্রদর্শন করা হয় এবং বিচারকদের সামনে (যারা সাধারণত পুরুষ হন) স্বল্প বসনে হেঁটে চলে তাদের শরীর বিভিন্ন ভঙ্গিতে দেখাতে হয়। এর মাধ্যমে কি নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? নারীর স্বল্প বসন নারীকে অসম্মানিত করে। তারা লালসার বস্তুতে পরিণত হয়। পুরুষরা তাদের পণ্যের মত মনে করে। এটাও বিবেচনার বিষয় যে, কেন এই সুন্দরী প্রতিযোগিতা? পুরুষদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য তো এতো প্রতিযোগিতা হয় না। প্রকৃতপক্ষে একদল ব্যবসায়ী নারীর অবমূল্যায়নের জন্য এসব প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। নারীর শরীর প্রদর্শন পুরুষদের উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটা কেবল সুন্দরী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সত্য নয়, নারীকেন্দ্রিক সকল অশ্লীল অনুষ্ঠানের ফলাফল একই। বিশ্বে যুব সমাজের চরিত্র হননের কারণ এসবই। এরই ফলে নারীর প্রতি আক্রমণ, নারী ধর্ষণ বৃদ্ধি পায়। কাজেই

www.pathagar.com

দেখা যাচ্ছে যে, সুন্দরী প্রতিযোগিতা নারীর সম্মান বা নিরাপত্তা কোনভাবেই বৃদ্ধি করে না। কেবল তাদের অসম্মানিত করে এবং নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় কি অর্থনীতির অগ্রগতি হয়? কোন গবেষণাই বলে না যে, সুন্দরী প্রতিযোগিতার ফলে কোন দেশের অর্থনীতির উন্নতি হয়। তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই। এসব প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় আয় বা Gross Domestic Product (GDP) কোনভাবেই বৃদ্ধি পায় না। কোন কোন সুন্দরী অবশ্য পরে মডেল হন এবং তাদের ব্যক্তিগত আয় কিছু বৃদ্ধি পেতে পারে। এসব মডেলের কারণে হয়তো কোন সাবান, পেস্ট ইত্যাদির কাটতি বাড়তে পারে। কিন্তু তা ঘটে অন্য কোন সাবান, পেস্ট ইত্যাদির বিক্রি হ্রাস পেয়ে। এতে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। তদুপরি পণ্য বিক্রি হয় প্রধানত তার মানের কারণে, কোন ছবির কারণে নয়। সুন্দরী প্রতিযোগিতার কারণে কিছু বিদেশী আসতে পারে ২/১ দিনের জন্য, কিন্তু এটা কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। সার্বিক অর্থনৈতিক বিচারে এ প্রতিযোগিতার কোন গুরুত্ব নেই।

সুন্দরী প্রতিযোগিতা সম্পর্কে নারীদের প্রতিক্রিয়া কি? এ প্রসঙ্গে বুয়েটের ছাত্রী হাসিনা হাবিবের দৈনিক ইনকিলাবে লিখিত 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা বনাম শিল্প' শিরোনামের একটি লেখার প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই। তিনি লিখেছেন, "২রা এপ্রিল বিটিভিতে একটি সুন্দরী প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান দেখানো হলো। অনুষ্ঠানের মাঝে বেশ কয়েকবার বলা হলো, এসব সুন্দরীরা আমাদের দেশের সম্পদ। ঠিক কোন দৃষ্টিতে এরা আমাদের সম্পদ? 'রূপ' দেখিয়ে বিদেশী টাকা কামাই করা অবশ্যই মর্যাদাকর কোন ব্যবসা অথবা শিল্প হতে পারে না। আর যা কিছু মর্যাদাকর নয়, তা সম্পদ হতে যাবে কোন বিচারে? 'রূপ' বলা হচ্ছে এ কারণে যে, তাদেরকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বা বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের জন্যও অনুষ্ঠানটিতে যেসব প্রশ্ন করা হচ্ছিল, সেগুলো মোটেও বুদ্ধিদীপ্ত ছিল না। যেমন 'বড় হওয়া মোটেও মজার নয়, আপনি কি মনে করেন?' অথবা 'হেয়ার স্টাইল বলতে আপনি কি বুঝাবেন?'...ইত্যাদি। এসব অর্থহীন প্রশ্নকে কিভাবে বুদ্ধিদীপ্ত বলা যায়? পোশাক তো মানুষের লজ্জা নিবারণের জন্যই। আর পোশাক অবশ্যই মর্যাদা রক্ষার জন্যও। কিন্তু এসব সুন্দরীরা এমন আঁটো-সাঁটো, আধা-খোলা, আধা-ঢাকা (!) পোশাক পরে এমন উদ্ভট, পুরুষ ভোলানো ভঙ্গিতে হেলে-দুলে হেঁটে বেড়াচ্ছিল যে, সেটা ছিল নগ্নতার মতই ভয়াবহ, ঘৃণ্য। দর্শকদের ভিড়ে অধিকাংশই ছিল পুরুষ, যাদের প্রত্যেকের মুখের অভিব্যক্তি ছিল অশালীন, অশোভন। সেখানে কোথাও কোন স্বচ্ছতা ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গায়ক এন্ড্রু কিশোর। তাকে দেখা গেছে

www.pathagar.com

কপালে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকতে। বাকি সব পুরুষরা বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে এই শিল্প (!)-কে পরখ করছিলেন। শিল্পের সংজ্ঞা পাল্টে কি 'অশ্লীলতা' হয়ে গেছে আধুনিক জীবন ব্যবস্থায়? নারীর শরীর প্রদর্শন কিভাবে সভ্যতার অগ্রগতি হতে পারে? কেন আমাদের দেশকে অন্য সংস্কৃতির মর্যাদাকর উন্নয়ন মডেল অনুসরণ না করে অশ্লীলতা নকল করতে হবে? যদি এটাই হয় অগ্রগতি, তবে অতি সভ্য হয়ে এসব সুন্দরী নারীরা একদিন পোশাক খুলে ফেলতে বাধ্য হবে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর জন্য, সোজা কথা টাকা কামাই করার জন্য। কারণ, পোশাক খুলে নিজেকে প্রদর্শন না করলে বিকৃত রুচিসম্পন্ন পুরুষরা টাকা দেবে না। এভাবে উন্নয়নের জোয়ারে গা ভাসিয়ে সব মানুষই পোশাকহীন পশু হয়ে জঙ্গলে গিয়ে বাঘ-সিংহের সাথে দোস্তী পাতাবে, ব্যাপার দেখে কিন্তু তাই মনে হয়।

তাহলে নগ্ন হয়ে একদল পুরুষ বিচারকের সামনে, যাদের কোন মর্যাদাবোধ নেই তাদের সামনে নিজেকে মেলে ধরে টাকা কামাই করা হয় যখন, তখন সেটাকে চলতি ভাষায় কি পেশা হিসেবে অভিহিত করা হয়?" (দৈনিক ইনকিলাব, ৬ এপ্রিল ২০০২)

হাসিনা হাবিব যথার্থই বলেছেন, সুন্দরী প্রতিযোগিতা যার আর্থ-সামাজিক ও মানবিক কোন মূল্য নেই তা কখনো শিল্প বা সম্পদ হতে পারে না। বিশেষত বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। কথিত সুন্দরী প্রতিযোগিতা যে এ আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থি এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিরোধী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা বাংলাদেশের অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গেও সংগতিশীল নয়। তাই বাংলাদেশের সকল শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠকদের প্রতি আবেদন, আপনারা এসব প্রতিযোগিতা বন্ধে সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করুন। কেবল সুন্দরী প্রতিযোগিতা নয়; যা কিছুই আমাদের নৈতিকতার ক্ষতি করে, নারীকে অসম্মানিত করে তার বিরুদ্ধে আপনারা অবস্থান গ্রহণ করুন। বাংলাদেশের সকল নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের নিকটও আমি একই আবেদন জানাচ্ছি। সরকারের প্রতি আমার বিশেষ আবেদন, যেন ফ্যাশন শো বা অন্য নামে সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সুযোগ সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখার জন্য। বিষয়টি সীমা অতিক্রম করার পূর্বেই ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

দৈনিক ইনকিলাব, ১০ মে ২০০২

www.pathagar.com

ব্যাপক ধর্ষণ মানবিকতার এক বিপর্যয় ঃ কি করা যায়?

গত ৮ মার্চ সারাদেশে পালিত হয়ে গেল বিশ্ব নারী দিবস। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ নারী কর্তৃক অলংকৃত হওয়ায় এদেশে নারী দিবসের আলাদা একটা আমেজ থাকে। তবে এ বছর নারী দিবস ছিল এক রকমের শোকের ছায়াবৃত। সাম্প্রতিককালে ঘটে যায় কিছু ঘটনা, যা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। এর মধ্যে রয়েছে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি গণধর্ষণের শিকার মাহিমার আত্মহত্যা। এক্ষেত্রে ধর্ষণকারীরা শুধুমাত্র তাদের পাশবিক কামনা চরিতার্থ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার ছবি তুলে সারা গ্রামে ছড়িয়ে দেয়। ফলে অপমানের লজ্জা সইতে না পেরে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার কাঠালবাড়ীয়া গ্রামের মাহিমা আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এরপর গত ৩ মার্চ ঘটে অনুরূপ এক নির্মম ঘটনা রাজধানীর মিরপুরের টোলারবাগে। ১০ বছর বয়সী কিশোরী ফাহিমা লাঞ্ছনার শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এছাড়া রয়েছে সিমি আত্মহত্যার মর্মান্তিক ঘটনা। চারুকলার ছাত্রী, স্বাবলম্বিনী সিমি পাড়ার বখাটে ছেলেদের অত্যাচার সইতে না পেরে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ন্যূনতম সাহায্য না পেয়ে থানার ওসির কাছে চিঠি লিখে রেখে আত্মহত্যা করে। সাম্প্রতিক সময়ে নারী আন্দোলনের বিস্তৃতি, প্রতিরোধ ও নতুন নতুন কঠোর আইন প্রণীত হওয়ার পরও নারী নির্যাতনের হার এমনভাবে বেড়ে চলেছে যার কোন তুলনা হয় না। আর এই নির্যাতনের হাত থেকে নারীদের না বাঁচাতে পারছে সমাজ, না পারছে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের আইন। কেবল ধর্ষণ নয়, এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমেও মেয়েদের, বিশেষ করে সুন্দরী তরুণীদের চেহারা বিকৃত করে দেওয়ার ঘটনাও বেড়ে চলেছে।

এছাড়া তথাকথিত আধুনিকতার অন্তরালে এবং এর প্রভাবে এদেশে শুরু হয়েছে এক নতুন ধরনের নারী নির্যাতনের পন্থা। আর তা হচ্ছে মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনই কেবল নয়, তা ভিডিওতে ধারণ করে সিডির মাধ্যমে বাজারজাতকরণ। কিছুদিন আগে প্রকাশ পেল 'রোকন ডট কম'-এর ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং দেশের একটি প্রধানতম ছাত্র সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক রোকনুজ্জামান খান গত বছরের কোন এক সময় তার প্রেমিকার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি গোপন ভিডিওতে ধারণ করে এবং

www.pathagar.com

'রোকন ডট কম' নামে তা ছড়িয়ে দেয়। এছাড়া বেশ কিছুদিন আগে সুমন নামের এক লম্পট পিন্টুর সহযোগিতায় একই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে বিদেশে পালিয়ে যায়।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা আগেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও হয়ত তা পরিপূর্ণভাবে দূর করা যাবে না। কিন্তু বর্তমানে এগুলো যে হারে বাড়ছে এবং ঘটনাগুলো যে ফ্যাশনে ঘটছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। একে মানবিকতার বিপর্যয় ছাড়া আর কি বলা যায়? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ২ মার্চ বিবিসি বাংলা বিভাগের সাথে এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যতটুকু উন্নতি হওয়া দরকার ছিল তা হয়নি। আসলে আমরা কি অস্বীকার করতে পারি যে, সকল মানুষই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং যে কোন নারীই প্রতিহিংসার শিকার হতে পারে? এখানে আবার চলে আসে চারুকলার ছাত্রী সিমির কথা। তার কাজের প্রয়োজনে তাকে রাত করে বাসায় ফিরতে হতো, এটা তার অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পাড়ার কারো কারো চোখে, যার সুযোগ নিয়ে পাড়ার বখাটে ছেলেরা তার ওপর মানসিক অত্যাচার শুরু করে। তারই প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সিমি আত্মহত্যা করে। এ ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, এই সমাজ মেয়েদের প্রয়োজনে রাতে চলাফেরাকেও নিরাপদ রাখতে ব্যর্থ। এদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং সামাজিক অবক্ষয় এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, বখাটে ছেলেরা মনে করে জোর করেই যে কোন মেয়েকে বিয়ে করা যায় এবং সেটা না পারলে এসিড মেরে সেই মেয়ের জীবন ছারখার করে দেওয়া যায়। এছাড়াও সমাজে অবৈধ সম্পর্ক (Adultery), বিবাহ বহির্ভূত বসবাস (Living Together) বেড়ে চলেছে। এগুলোর কারণ মানসিক বিপর্যয় এবং এই মানসিক বিপর্যয় ঘটছে ধর্ম ও ঐতিহ্য থেকে পদস্খলন ও এসবের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কারণে।

তাহলে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমাদের করণীয় কি? এগুলো কেন হচ্ছে তার মূল কারণগুলো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এর কারণ অনেক। কিছু বড় কিছু ছোট। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে বলা যায়, আকাশ সংস্কৃতি (Satellite TV)। আকাশ সংস্কৃতি হচ্ছে পারমাণবিক বোমার মত। এর মাধ্যমে মারাত্মক ধরনের অশ্লীলতা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। নোংরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারক এই সমস্ত টিভি চ্যানেলে মেয়েদের অত্যন্ত নোংরাভাবে স্বল্প পোশাকে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে শরীরী প্রদর্শনে। কোন কোন চ্যানেলে প্রদর্শন করা হয় ব্লু ফিল্ম জাতীয় সিনেমা। এসব দেখে কোমলমতি কিশোররা যে বিপথগামী হবে সেটাই স্বভাবিক। বর্তমানে শহরাঞ্চলের প্রায় সবাই ডিশ-এর কানেকশন নেয়ায় এ সকল নোংরামি সমাজে

www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়ছে। এ সবের জন্য BBC, CNN, National Geographic, Discovery—এসব চ্যানেল দায়ী নয়। যেসব চ্যানেলের মাধ্যমে এই বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে সেগুলো MTV, TV6, STAR, GROUP, SONY, AXN ইত্যাদি বিদেশী চ্যানেল। এই মিডিয়ার কারণে বাংলাদেশে সংঘাত, অবাধ যৌনাচার, মাদক উগ্রতা ইত্যাদি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর জন্য Satellite TV যারা পরিচালনা করে অর্থাৎ ক্যাবল অপারেটরদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে ঐ সমস্ত চ্যানেলের বিরুদ্ধে যা নগ্নতাকে, অশ্লীলতাকে উস্কে দেয়। তথ্য মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে নতুন আইন প্রণয়ন ও তার কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

আরেকটি উদ্বেগজনক বিষয় হলো আকাশ-সংস্কৃতির কুপ্রভাব আমাদের ঢাকাই চলচ্চিত্রের উপরও পড়তে আরম্ভ করেছে। যেসব ছবি ইদানীং ঢাকায় তৈরি হচ্ছে তার একটা বড় অংশ নারীর শরীর প্রদর্শন। ঐসব ছবিতে ধর্ষণের দৃশ্য অপরিহার্যভাবে ধারণ করা হয় এবং তা প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শন করা হয়। একটা অবাক করার মত বিষয় হচ্ছে, দেশে ফিল্মের জন্য সেন্সর বোর্ড আছে এবং সে সব বোর্ডে অনেক গুণী লোকও থাকেন। তারা কেন ঐ সব ছবি প্রদর্শনের অনুমতি দিয়ে যাচ্ছেন। ঐ সব ছবি গ্রাম-গঞ্জে অবাধে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই ছায়াছবি দেখে তরুণরা আরও বখাটে হয়ে উঠছে। তরুণদের বয়সটাই অনুকরণের। তারা ছবিতে একটা ধর্ষণের দৃশ্য দেখে তা অনুকরণ করতে চাইবে তাই স্বাভাবিক। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, চলচ্চিত্রে ধর্ষণ জাতীয় দৃশ্য বারবার দেখতে দেখতে তরুণ-কিশোরদের মনে এক সময় ঐ ঘটনাগুলোর একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে এবং একই রকম ঘটনা ঘটাতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়। এগুলো বন্ধ করার জন্য দরকার সেন্সর বোর্ড কর্তৃক ফিল্ম শিল্পের উপর সামগ্রিকভাবে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। সাম্প্রতিককালে চলচ্চিত্র শিল্পীদের মধ্যেই যে 'অশ্লীলতা বিরোধী আন্দোলন' শুরু হয়েছে তাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে। অশ্লীলতাবিরোধী আন্দোলনে দেশের সাংবাদিক সমাজকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আরও একটি উল্লেখ্য ব্যাপার এখানে আছে, তা হলো এদেশীয় চ্যানেলগুলোতে বিভিন্ন পণ্যের প্রসারের জন্য প্রচলিত বিজ্ঞাপন। বেশির ভাগ পণ্যের বিজ্ঞাপনেই পণ্যের গুণকীর্তন করার জন্য নারীকেই পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা মানবাধিকারের লংঘন। বিজ্ঞাপন নির্মাতাদের মনে রাখতে হবে মানুষ নারীর শরীর দেখে পণ্য কেনে না। পণ্যের উচ্চ গুণগত মানই পণ্যের আসল বিজ্ঞাপন।

www.pathagar.com

উপরিলিখিত সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সরকারের নিকট উপস্থাপন করছি ঃ

১. বিদেশী টিভি চ্যানেলসমূহ আইন করে নিয়ন্ত্রণে আনা হোক, যাতে অশ্লীল অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া যায়। এজন্য ক্যাবল অপারেটরদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

২. ফিল্ম সেন্সরশিপ খুবই শক্তভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৩. বাংলাদেশে প্রধানত অবস্থিত এমন টিভি চ্যানেলসমূহের অশ্লীল বিজ্ঞাপন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যা ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী তাকেই অশ্লীল বিবেচনা করতে হবে।

৪. বখাটেদের শক্তভাবে দমন করতে হবে। এজন্য আইনে ধারা যোগ করতে হবে।

৫. শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতাকে শক্তিশালী করতে হবে যত দ্রুত সম্ভব।

৬. সহশিক্ষা যতদূর সম্ভব বন্ধ করতে হবে।

৭. ছাত্র হলে ছাত্রী প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

৮. নারী নির্যাতনবিরোধী সকল আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ নিতে হবে।

দৈনিক ইনকিলাব, ৫ এপ্রিল ২০০২

www.pathagar.com

সামাজিক সমস্যা ও আমাদের দায়িত্ব

সাধারণত ধারণা করা হয় যে, মানব জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রধান সমস্যা। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাজ জীবনে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, কিন্তু সামাজিক সমস্যাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সামাজিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত যৌতুক প্রথার কারণে আমাদের দেশে শতকরা ৯০টি পরিবার মেয়েদের বিয়ে দিতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, সামাজিক সমস্যা কত বড় সমস্যা। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যা একই সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে।

একটি বড় সামাজিক সমস্যা হচ্ছে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা। আমাদের সমাজের শিক্ষার নিম্নহার সম্পর্কে সকলেই অবগত। হাদীসে আছে, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয।" কিন্তু এ সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে ব্যাপক অশিক্ষা বিরাজ করছে। এ জন্য আমাদের কর্তব্য মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষার প্রোগ্রাম গ্রহণ করা। কুরআন শরীফ চর্চার সাথে সাথে বাংলা, অংক, ইংরেজি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা সবাইকে শিখতে হবে। মহিলাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। উপরে যে হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে পুরুষ ও মহিলাদের শিক্ষার কোন পার্থক্য করা হয়নি। আমরাই বরং নারী-পুরুষের পার্থক্য করেছি। আল্লাহর রাসূল পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপারে কোন পার্থক্য করেননি। ইমাম সাহেবদের উদ্যোগে এ শিক্ষার ব্যবস্থা মসজিদে অথবা মসজিদের সাথে ঘর করে অথবা বারান্দায়ও করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উঠতে পারে, মেয়েদের মসজিদে আসার অধিকার আছে কি? রাসূলের যুগে মহিলারা মসজিদে নামাযে শরীক হতেন (বুখারী হাদীস-৮১৬, ৮১৯, ৮২৪)। তাই প্রয়োজনে মসজিদে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে।

হত্যা, চুরি, ব্যাভিচার, দাঙ্গা, ফ্যাসাদ এবং অন্যান্য ধরনের অপরাধ আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, অপরাধের মূল কারণ দারিদ্র্য। আসলে অপরাধের মূল কারণ দারিদ্র্য কিনা তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। সমাজে হরহামেশা যে সব ধর্ষণ হচ্ছে, তা কি দারিদ্র্যের কারণে? অবশ্যই নয়। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, অনেক অপরাধ দারিদ্র্যের

www.pathagar.com

কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু সকল অপরাধের কারণ দারিদ্র্য, আমরা তা মেনে নিতে পারি না। অপরাধের কারণসমূহের মধ্যে সুশিক্ষা ও নৈতিকতার অভাব এবং ইসলাম নিষিদ্ধ অশ্লীলতার ব্যাপক বিস্তার—এসবও রয়েছে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজে হত্যার পরিমাণ যে হারে বেড়ে যাচ্ছে তাতে চিন্তিত না হয়ে পারা যায় না। এরূপ ব্যাপক হত্যার প্রবণতা থেকে মনে হচ্ছে যেন জীবনের কোন মূল্য নেই। জীবনের যে কি মূল্য তা আল কুরআনের সূরা মায়েদা থেকে বোঝা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

"যদি কেউ খুনের পরিবর্তে কিংবা যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কেউ কাউকে জীবন দান করে তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল।" (সূরা মায়েদা ঃ ৩২)

বিদায় হজ্বে প্রদত্ত নবী (স)-এর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা আমরা ভুলে গিয়েছি যে, আজকের এই দিনের মত তোমাদের জীবন, তোমাদের মান এবং তোমাদের ইজ্জত সংরক্ষিত। এই হাদীস, ইতিহাসের এই ঘটনা এবং কুরআন মাজীদের উপরোল্লিখিত আয়াতের ভিত্তিতে মসজিদের ইমাম সাহেবদের খুৎবা দেওয়া উচিত। যাতে অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হয়। দারিদ্র্য ছাড়া অন্য যে সব কারণে মানুষের চরিত্র খারাপ হচ্ছে, সে সমস্ত পাপ কাজ ও অশ্লীল সাহিত্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে হবে।

তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে নারী নির্যাতন। পত্র-পত্রিকার পাতা খুললে প্রতিদিন পাঁচ সাতটি নারী নির্যাতনের খবর চোখে পড়বে। দেশের সামগ্রিক চিত্রের এটি একটি অংশ মাত্র। কেননা, সব নারী নির্যাতনের খবরতো পত্রিকায় আসে না। মেয়েদের ওপর আজ বিভিন্ন রকম অত্যাচার চলছে। একদিকে তাদেরকে কথায় কথায় তালাক দেওয়া হচ্ছে, খোরপোষ দেওয়া হচ্ছে না, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের ওপর রয়েছে যৌতুকের অত্যাচার। কথায় কথায় তিন তালাক দিয়ে দেওয়া ইসলামের নীতি বহির্ভূত। তালাক সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশেদীন এর সুন্নত অনুসরণ করতে হবে। আল্লামা জামাখসারী তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থে বলেছেন, নিজের স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিয়ে যে লোক হযরত ওমর (রা) নিকট আসতো তিনি তাকে পিটাতেন এবং তার দেওয়া তালাকগুলোকে তিনি কার্যকর করে দিতেন। (দ্রষ্টব্যঃ তাফহীমুল কুরআন, সূরা তালাকের তাফসীর)

www.pathagar.com

মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার প্রসঙ্গে বলা যায়, কুরআনের সূরা নিসার যে আয়াতের বলে পুরুষরা সম্পত্তির অধিকার পায়, মেয়েরা একই আয়াতের বলে সম্পত্তির অধিকার পায়। অথচ আমরা মেয়েদেরকে সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করছি। আমরা আয়াতের একটি অংশের ওপর আমল করছি অন্য অংশের ওপর করছি না। এতে কুরআনের নাফরমানি করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মেয়েরা সম্পত্তির অধিকার না পাওয়াতেই তালাককে এত বেশি ভয় পায়। তারা জানে, তাদের কোন আশ্রয় নাই। এর ফলে অনেক মেয়েকেই শেষ পর্যন্ত রাস্তায় আশ্রয় নিতে হয় এবং ব্যাভিচারের শিকারে পরিণত হতে হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে, সব সময়ে স্বামীদের আনুগত্য করতে হবে, কিন্তু ইসলামে সর্ব অবস্থায় আনুগত্য নেই। নবী (স) বলেছেন, "আনুগত্য শুধু ভাল কাজের।" (মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

পঞ্চম সমস্যা হলো দারিদ্র্য ও ছিন্নমূলদের সমস্যা (নানা কারণে স্থানীয়ভাবে কোন দুর্ভিক্ষ হলে, অথবা নদী ভাঙনের ফলে বহু লোক বিপন্ন হয়ে যায় এবং শহরের দিকে পাড়ি জমায়)। এ বিষয়টির দিকে গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ দিতে হবে। সমবায় বা অন্যান্য পদ্ধতিতে কি করে এদেরকে গ্রামে ধরে রাখা যায়, গ্রামেই পুনর্বাসিত করা যায়, তার জন্য নেতৃবৃন্দের পদক্ষেপ নিতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের গ্রামাঞ্চলে একদল লোক আছে, যারা এ সমস্ত বিপন্ন লোকের শেষ সম্বল একটি ঘর বা এক কাঠা জমি হস্তগত করার জন্য, ঠেকায় ফেলে কিনে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এ ধরনের মানসিকতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে হবে। কমপক্ষে মেয়েরা যেন বাচ্চাসহ শহরের দিকে না আসতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। কেননা রাস্তায় থাকলে একটা মেয়ের সেই বিপদ হয় যা একটি পুরুষের হয় না।

আমাদের দেশে বখাটে ছেলেদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এদেরকে যেভাবে হোক বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে, এদেরকে দূরে রাখলে চলবে না। এদের সঙ্গে মিশে সৎ পথ দেখাতে হবে। সিনেমা ও অশ্লীল সাহিত্য বখাটেদের খারাপ হওয়ার প্রধান কারণ। বখাটে ছেলেরা স্কুলগামী মেয়েদের উত্যক্ত করে। যার বিরুদ্ধে জনমতকে সংগঠিত করতে হবে। মেয়েদেরকে ইসলাম মোতাবেক চলাফেরা করতে বলতে হবে। পবিত্র কুরআনে বাইরে যাওয়ার সময় চাদর পরার জন্য মহিলাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

"হে নবী তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের মহিলাগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। ইহা অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি। যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (সূরা আহজাব ঃ ৫৯)।

মেয়েদের বাইরে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, "আল্লাহ নিশ্চয়ই মেয়েদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

বাংলাদেশের এসব সামাজিক সমস্যাকে যথাযোগ্যভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। সবাইকে বিশেষ করে গ্রামের ইমাম, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, আদর্শবাদী যুবক ও সৎ জনতাকে এসব সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে ও দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

অহেতুক গ্রেফতার ও জনগণের অসুবিধা

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বছর কত লোক গ্রেফতার হয়? একটি অনুমান হচ্ছে যে, বর্তমানে বাংলদেশে প্রায় দু'লক্ষ লোক প্রতি বছর গ্রেফতার হয়ে থাকে। এদের অধিকাংশই হচ্ছে অত্যন্ত দরিদ্র অথবা নিম্নবিত্তের লোক। ধনীদের মধ্যে গ্রেফতারকৃতের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এ হিসাবে রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সেটিও স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনার দাবি রাখে।

অপরাধের কারণে বা অপরাধী অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের অধিকাংশই পরিবারের একমাত্র জীবিকা অর্জনকারী ব্যক্তি। এসব লোকের গ্রেফতার পরিবারের আর্থিক বুনিয়াদকে ধ্বংস করে, পরিবার অসহায়ত্বের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, পুত্র-কন্যারা বিপদাপন্ন হয়। অবশেষে তারা তাদের সম্পত্তির সর্বশেষ অংশ বিক্রি করে ফতুর হয়ে যায় এবং পথের লোকে পরিণত হয়।

সুতরাং এটা অত্যন্ত জরুরি, যেন অহেতুক গ্রেফতারি পরিহার করা যায়। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সত্যিকার অপরাধীকে ছাড়া যাবে না এবং তার শাস্তির বিধান করতে হবে; কিন্তু আমাদের আইন ও ব্যবস্থায় অহেতুক গ্রেফতারের যে সুযোগ রয়েছে (যার সুযোগ নিতে পারেন একদল কর্মকর্তা) তা দূর করা জাতির জন্য অবশ্য কর্তব্য।

আমরা কে না জানি যে, আমাদের দেশে গ্রেফতার মানে ভোগান্তি এবং টাকা পয়সা খরচ। যে দেশে দুর্নীতি ব্যাপক সে দেশে প্রত্যেকটি বিষয়ই গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার যে, জনগণের ওপর কোন পদক্ষেপের বা আইনের প্রভাব কি বাড়ছে। কেউ বলতে পারেন, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি তো জামিন পেতে পারেন, কিন্তু জামিন পাওয়া কি এত সহজ? এর জন্য উকিল ও অন্যান্য যেসব খরচ এ দেশে হয়, শতকরা ৯০ ভাগ লোকের পক্ষে তা বহন করা খুবই কঠিন। তারপর উকিলের খরচ তো একদিনের নয়। তা অনেক সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। লেখক একবার নিজেই তার ভুক্তভোগী হয়েছিলেন।

এর ফলে এটা অত্যন্ত জরুরি যে, অহেতুক গ্রেফতারি কমিয়ে আনতে হবে। আমাদের বর্তমান আইনে এফআইআর (FIR) করলেই (অপরাধটি যদি আমলযোগ্য হয়) পুলিশ FIR-এ দেওয়া ব্যক্তিদের গ্রেফতার করতে পারে।

www.pathagar.com

এটা কতটা ন্যায়সঙ্গত? কারো দেওয়া FIR-এর ভিত্তিতে কারো আনুমানিক নাম দেওয়ার ভিত্তিতে গ্রেফতার করা কতটা যুক্তিসঙ্গত? কেবল ২/১টি মারাত্মক অপরাধ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে তদন্ত না করে কাউকে গ্রেফতার করা, তার স্বাধীনতা নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। Cognizible (আমলযোগ্য) অপরাধের ক্ষেত্রে FIR-এর ভিত্তিতে গ্রেফতার করার ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নপর্যায়ে অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে। যে আইনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ হয় তাকে ভাল আইন বলা যায় না। ইসলামেও কেবল অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করার বিধান আছে বলে আমার জানা নেই।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যেও ইনভেস্টিগেশন ও প্রসিকিউশন ব্রাঞ্চ এক কর্তৃপক্ষের হাতে নেই। উন্নত দেশে গ্রেফতারের পূর্বে যেসব সতর্কতার বিধান আছে তা আমাদের আইনে নিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে যা চলছে তা সঠিক নয়।

মানবাধিকার ও অপরাধ দমনের মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। আমাদের দু'টিই অর্জন করতে হবে। এ ব্যাপারে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, দেশের মানবাধিকার সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৭ই জানুয়ারি ২০০০

www.pathagar.com

শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবার ছুটি অসঙ্গত

গত ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় 'অবিলম্বে সাপ্তাহিক ছুটি একদিন রবিবার করার জন্য ব্যবসায়ীদের দাবি' শিরোনামে খবরে প্রকাশ, 'বিজিএমইএ, বিটিএমএ, বিকেএসইএ, বিএসটিএসপিএ ও বিটিটিএলএসপি-এর সভাপতিগণ গতকাল বুধবার এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে অনতিবিলম্বে সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিনের পরিবর্তে একদিন এবং ছুটির দিনটি রবিবার নির্ধারণ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নিকট জোর দাবি জানিয়েছেন।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট এ রকম একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে দাবি উত্থাপন করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে সেটা তারাই জানেন। আশা করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ ধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি আমলে এবং স্বাধীনতার পরেও ছুটির দিন ছিল রবিবার, যা ছিল ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশদের চালু করা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অংশ। পরবর্তীতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে বাংলাদেশে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে প্রবর্তন করা হয়। এর পরবর্তী বিএনপি সরকার শুক্রবার ছুটি বহাল রাখেন।

১৯৯৬ ইং সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসেন। তারাও তাদের পাঁচ বছরের শাসনকালে শুক্রবারের ছুটির কোন পরিবর্তন করেননি। যদিও এ সময়ে নওয়াজ শরীফ সরকার পাকিস্তানে কোন নির্বাচনী ম্যান্ডেট ছাড়াই কিছু আন্তর্জাতিক চক্রকে খুশি করার জন্য শুক্রবার ছুটি পরিবর্তন করে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করেন এবং এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে কিছু মহল রবিবার ছুটি ঘোষণা করার দাবি করেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সে দাবি মানেননি।

বর্তমানে কিছু ব্যবসায়ী সমিতি এই দাবি তুলেছে যে, ব্যবসায়ীদের কর্মদিবস বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক বিশ্বায়নের জন্য রবিবারকে যেন সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়। তাদের যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে রবিবার ছুটির দিন তাই বাংলাদেশে যদি শুক্রবার ও শনিবার ছুটির দিন হয় তাহলে তা আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করবে।

www.pathagar.com

শুক্রবার ছুটির কারণে আমদানি-রফতানির ক্ষতি হয় এটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক কথা। আজ থেকে ১২-১৩ বছর আগে এদেশে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত কখনোই কোন আমদানি বা রাফতানি শুক্রবার ছুটির কারণে বন্ধ বা নষ্ট হয়নি। শুক্রবার ছুটি হওয়ার পরও প্রতিবছর রফতানি ১০-২০% করে বৃদ্ধি হয়েছে। আমি এক সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছিলাম এবং ব্যাংকিং বিভাগের সচিব ছিলাম। ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকারগণ আমাকে অনেক সমস্যার কথা বলেছেন। কিন্তু কখনো বলেননি যে, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি হওয়ার কারণে রফতানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা কোন কনসাইনমেন্ট শেষ পর্যন্ত রফতানি করা যায়নি অথবা এলসি করা যায়নি।

শুক্রবার ছুটি হলে ব্যবসায়ীবৃন্দ তাদের কাজ হয় পূর্বদিন বা পরের দিন করে নেন। যেমন রবিবার ছুটি থাকাকালেও তারা পূর্বদিন বা পরের দিন তাদের কাজ করে নিতেন। সামগ্রিক বিবেচনায় শুক্রবার ছুটির কারণে জাতির বা দেশের বা আমদানি-রফতানির কোন ক্ষতি হয় না। যেসব দেশে শুক্রবার ছুটি রয়েছে সেসব দেশের আমদানি-রফতানির পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ।

অনেকে সূরাতুল জুমআর উল্লেখ করে বলেন যে, সেখানে শুক্রবার কাজ না করার কথা বলা হয়নি। কিন্তু এটাই যদি যুক্তি হয় তাহলে তো একথাও বলা যায় যে, কুরআন বা হাদীসে কোথাও কোন সাপ্তাহিক ছুটির কথা বলা হয়নি। সে প্রেক্ষিতে রবিবার বা শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি করায় কি যুক্তি আছে? বিশেষ করে যখন শনিবার ইয়াহুদীদের উপাসনার দিন এবং রবিবার খ্রিস্টানদের উপাসনার দিন। ইসলাম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অন্য জাতিকে অনুসরণ করার কথা বলে না। রাসূলুল্লাহ (স) সবসময় মুসলিম জাতির সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র পরিচয় (Identity) গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সূরাতুল জুমআর তাফসীরে একজন বিখ্যাত তাফসীরকার লিখেছেন, 'এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কুরআন মজীদে ইয়াহুদীদের 'সাবত' বা শনিবার এবং খ্রিস্টানদের রবিবারের ন্যায় জুমাআর দিন সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করা হয় নাই, কিন্তু জুমাআর দিনও যে মুসলমানদের নিকট ঠিক তেমনি জাতীয় সংস্কৃতির নিদর্শনের দিন যেমন শনিবার ইয়াহুদীদের নিকট এবং রবিবার খ্রিস্টানদের নিকট জাতীয় সাংস্কৃতিক নিদর্শনের দিন, সেই কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। সপ্তাহে কোন একটি দিন সাধারণ ছুটির দিন রূপে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যদি একটি সামাজিক ও তামাদ্দুনিক প্রয়োজন হয়ে থাকে,

www.pathagar.com

তাহলে ইয়াহুদীরা যেভাবে শনিবার ও খ্রিস্টানরা যেভাবে রবিবার নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, অনুরূপভাবে মুসলমানরাও তাদের মধ্যে যদি ইসলামী চেতনা একবিন্দুও অবশিষ্ট থেকে থাকে জুমাআর দিনটিই নির্দিষ্ট করে নিবে, এটাই স্বাভাবিক। ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিনে নিজেদের ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম করার পর সর্বপ্রথমেই রবিবারের পরিবর্তে শনিবারকে জাতীয় ছুটির দিন রূপে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। বৃটিশ ভারতেও সেই সময়কার মুসলিম দেশীয় রাজ্যের মধ্যে পার্থক্যের নিদর্শন এই ছিল যে, সমগ্র ভারতে রবিবার দিন ছুটি এবং এই সব রাজ্যে শুক্রবার দিন ছুটি প্রচলিত ছিল। তবে যেখানে মুসলমানদের ইসলামী চেতনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে সেখানে মুসলমানের হাতে ক্ষমতা আসা সত্ত্বেও রবিবার দিনের ছুটিই চালু রেখেছে। আর যেখানে এই চেতনাহীনতা খুব বেশি মাত্রায় পৌঁছেছে সেখানে তারা শুক্রবার দিনটির ছুটি নাকচ করে রবিবার দিনের ছুটি চালু করেছে। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা জুমআর তাফসীর, নোট নং-১৬)

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সরকার শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি বহাল করার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কয়েকটি ব্যবসায়ী সংগঠন ২১ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে পত্রিকা মারফত রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানান। সে সময়ে এ বিষয় নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ৯, ১০ ও ১১ জুন ঢাকা শহরের ১৪টি এলাকার ৫৫০ জন লোকের ওপর Democracy Watch নামক প্রতিষ্ঠানের Life skills and life style কোর্সের ছাত্ররা একটি জরিপ চালায়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে সপ্তাহের একদিন বা দুইদিন বেছে নিতে বলা হয়, যার ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

শুক্রবার	৩২%
শুক্র-শনি	২৩%
শনি-রবি	১৩%
রবিবার	১২%
বৃহঃ (অর্ধ)-শুক্র (পূর্ণ)	১১%
শনি (অর্ধ)-রবি (পূর্ণ)	৭%
শুক্র (অর্ধ)-শনি (পূর্ণ)	২%
মোট	১০০%

(সাপ্তাহিক হলিডে, ২০শে জুন, ১৯৯৭)

www.pathagar.com

সার্বিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৬৬% মানুষ শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে চায়। এছাড়া এই ঘটনার সূত্রপাত যে ব্যাপার দিয়ে অর্থাৎ নওয়াজ শরীফের ঘোষণার বিষয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, নওয়াজ শরীফের নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি এ ধরনের কোন পরিকল্পনার কথা বলেননি। তাই, অনুমান করা হয় পরবর্তীতে তিনি কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাপে পড়েই রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জনতা ব্যাপক আন্দোলন করেছিল কিন্তু তিনি যেমন অন্যান্য বিষয়ে জনমতের তোয়াক্কা করেননি, এ ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি জনদাবি মানেননি।

সর্বশেষে আমি বলব যে, পাশ্চাত্যের একটি অংশ সবসময় চায় যেন আমরা তাদের সংস্কৃতি ও নিয়ম-কানুন গ্রহণ করি। রবিবারের বিষয়টিও তাই। এ ব্যাপারে আমরা বহু চিন্তা করেই সাপ্তাহিক ছুটি রবিবার থেকে শুক্রবারে নিয়ে এসেছি। এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কোন সত্যিকার অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক যুক্তি আমাদের নেই। সুতরাং সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন হোক বা একদিন হোক, (কর্মঘণ্টা দু'অবস্থাতে একই থাকে) শুক্রবারকে সর্বাবস্থায় ছুটি হিসেবে বহাল রাখা ন্যায়সঙ্গত ও জনগণের বিপুল অংশের প্রাণের দাবি। আশা করি, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন সরকারই এর বিপরীত কিছু করবেন না।

দৈনিক ইনকিলাব, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১

www.pathagar.com

চোরাচালান প্রতিরোধে বিদ্যমান নীতিমালা

চোরাচালান একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তির (border trade) পর সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের এক অংশ সীমান্ত বাণিজ্যের নামে চোরাচালানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সনে তার উদ্দেশ্যেও যদি সে চুক্তি করা হয়ে থাকে, তথাপি এর পরবর্তী ফলাফল দেশের জন্য শুভ হয়নি। পরবর্তীকালে সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করা হলেও সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের এক অংশের অভ্যাস পরিবর্তন হয়নি।

সাধারণভাবে যে কোন অবৈধ আমদানি ও রফতানিকেই চোরাচালান বলা হয়। কিন্তু ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের ২ (S) ধারা মোতাবেক কেবল অবৈধ পথে আমদানি ও রফতানিকে (অর্থাৎ ঘোষিত শুল্ক বন্দর, বিমান বন্দর ও শুল্ক স্টেশন দ্বারা আমদানি ও রফতানিকৃত হয়) চোরাচালান বলা হয়। একই সঙ্গে বৈধ পথে কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের বেআইনী আমদানি ও রফতানিকেও (স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, মূল্যবান পাথর, বৈদেশিক মুদ্রা) চোরাচালান বলা হয়। কিন্তু ২ (S) ধারায় উল্লেখ করা হলো ঃ

(S) 'Smuggle' means to bring into or take out of (Bangladesh) in breach or any prohibition or restriction for the time being in force, or evading payment of customs-duties or taxes leviable thereon.

(a) Gold bullion, silver bullion, precious stones, currency manufactures of gold or silver or precious stones or any other goods notified by the (Government) in the official gazette, in each case exceeding one thousand (Taka) in value : or

(b) Any other goods by any route other than a route declared under section 9 or 10 or from any place other than a customs-station and includes an attempt, abatement or conveniance of so bringing in or taking out of such goods and all cognate words and expression shall be construed accordingly.

চোরাচালানের পথ

বাংলাদেশে চোরাচালান স্থল, সমুদ্র ও আকাশ পথে হচ্ছে। আমাদের স্থল সীমান্তের প্রায় সব দিক দিয়েই চোরাচালান হচ্ছে। তবে বর্তমানে সাতক্ষীরা,

www.pathagar.com

যশোর, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, সিলেট স্থল সীমান্ত সবচেয়ে কুখ্যাত। সমুদ্র পথে কক্সবাজার থেকে আরম্ভ করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমুদ্র পথই এ জন্য বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। বিমান পথে চোরাচালান কম, তবে স্বর্ণ ও অন্যান্য 'ওজনে কম অথচ মূল্যবান' দ্রব্যাদি চোরাচালানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

চোরাচালানের ফলে ক্ষতি

চোরাচালান জাতীয় অর্থনীতিকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। চোরাচালান সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে আমাদের শিল্পের বিকাশে। অধিকাংশ দেশীয় শিল্পের উৎপাদনের ওপর আবগারি শুল্ক রয়েছে, যার হার শতকরা ৫-২৫ ভাগ। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের প্রয়োজনে এ শুল্ক তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ চোরাচালানকৃত দ্রব্যের ওপর কোন আমদানি শুল্ক দিতে হয় না। এ সুযোগে বিদেশী মাল বাংলাদেশের বাজার দখল করে নেয়। চোরাচালান বন্ধ করা বা অন্তত কমিয়ে আনা না গেলে দেশের শিল্পোন্নয়ন দুঃসাধ্য হবে। চোরাচালানের ফলে যে সব শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা হলো বস্ত্র, সাইকেল, টায়ার, টিউব, যন্ত্রাংশের উৎপাদন ও বহুধরনের ক্ষুদ্র শিল্প। চোরাচালানের মাধ্যমে দেশের ভেতরে আনা দ্রব্যের বিনিময়ে এমন অনেক দ্রব্য বিদেশে পাচার হয় যার দেশেও অভাব রয়েছে (যেমন মাছ) এবং যা কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা বিদেশ থেকে আনা হয়েছে (যেমন ঔষধ, ইলেট্রিক সামগ্রী, ঘড়ি, পুরাতন কাপড়)। এটাও দেশের জন্য একটি ক্ষতির কারণ।

চোরাচালানের ফলে রাজস্ব আদায় কার্যক্রমও ব্যহত হয়। চোরাচালানকৃত দ্রব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমদানির বিকল্প। ফলে এর বৈধ আমদানি কম হয় এবং রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়। যদি চোরাচালান বন্ধ করা যেতো তাহলে অন্তত ১৯৮৯ সনের হিসাবে রাজস্ব আদায় আরো ৫০০ কোটি টাকা অধিক হতো (এতে অনুমান করা হয়েছে যে অন্তত ১০০০ কোটি টাকার মালামাল অবৈধ পথে আসে। যার অন্তত ৫০ ভাগ শুল্ক যোগ্য পণ্য এবং শুল্ক কর হার গড়ে ১০০ ভাগ)। চোরাচালানের ফলে সরকারের পক্ষে আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ পলিসি পুরোপুরি কার্যকরী করা সম্ভব হয় না।

চোরাচালান জাতীয় স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে চোরাচালানীরা হিরোইন, মাদকদ্রব্য ও নিষিদ্ধ ঔষধ চোরাচালানকে লাভজনক মনে করে। এসব অবৈধভাবে আমদানি করে থাকে। হিরোইন ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার যুব সমাজকে ধ্বংস করছে।

চোরাচালানকে কোন অবস্থাতেই দেশের জন্য লাভজনক গণ্য করা যায় না। গরুর অন্তর্মুখী চোরাচালান বা কোন কোন সংযোজন শিল্পের উৎপাদিত পণ্য

www.pathagar.com

দ্রব্যের বহির্মুখী চোরাচালানের ভিত্তিতে চোরাচালানকে লাভজনক হিসাবে গণ্য করা সামগ্রীক বিচারে যথাযথ নয়। দেশের রাজস্ব স্বার্থ উন্নয়নে শিল্পের বিকাশকে বিবেচনা করা হলে পূর্ণাঙ্গ বিচারে চোরাচালানকে দেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করা ছাড়া উপায় থাকে না।

চোরাচালান প্রতিরোধে নীতিমালা

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, কোন দ্রব্যের আমদানি রফতানি নিষিদ্ধ থাকলে তা চোরাচালানের মাধ্যমে আনার প্রবণতা দেখা দেয়। অন্যদিকে চোরাচালান প্রতিরোধ অন্য যে কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক জটিল। কেননা প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের ২৭৫০ মাইল ব্যাপী সীমান্তে কোন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা নেই। সমুদ্রের দিক থেকেও শত শত শাড়ি দেশের ভেতরে প্রবেশ করছে। এসবের প্রেক্ষিতে সরকার গত কয়েক বছর যাবত আমদানি নীতিকে ক্রমাগত উদার করার ব্যবস্থা নিয়েছে। ১৯৮৮-৮৯ সনের আমদানি নীতিতে ১০০টি এইচ এস হেডিং নিষিদ্ধ তালিকা হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এসব হেডিং এর আওতায় যে সব দ্রব্য রয়েছে তার সংখ্যা ১০০ এর অনেক বেশি। কেননা এক একটি হেডিং এ অনেক দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। তেমনিভাবে ঐ বছর ৭৮টি এইচ এস হেডিংকে শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য তালিকা হতে বাদ দেওয়া হয়।

১৯৮৯-৯১ আমদানি নীতি ঘোষণার সময় (জুলাই ১৯৮৯) নিষিদ্ধ তালিকা হতে ৮৩টি হেডিং এ শর্তযুক্ত তালিকা হতে ৪৫টি হেডিং প্রত্যাহার করা হয়। পরবর্তীকালে ২৮-৭-৯০ তারিখে প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তি মারফত ১৯৮৯-৯১ সনের আমদানি নীতি হতে আরো ৭০টি এইচ এস কোর্ড ভুক্ত প্রায় সকল পণ্য নিয়ন্ত্রণ তালিকা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমদানি নীতি অধিকতর অবাধ করায় চোরাচালান নিরুৎসাহিত হবে। তাতে স্থানীয় শিল্প অধিকতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। অন্যদিকে কিছু পণ্য বহির্মুখী চোরাচালানের জন্য আমদানি করার সম্ভবনা দেখা দিলে অতিরিক্ত শুল্ক ধার্যের মাধ্যমে তা মোকাবিলা করতে হবে।

উচ্চহারে শুল্ক কর আরোপ করা হলেও চোরাচালান বৃদ্ধি পেতে পারে। শুল্ক কর দিয়ে আমদানি করা দ্রব্যের মূল্য যদি অনেক বেশি হয় তাহলে চোরাচালানের লাভও বৃদ্ধি পায়। সে জন্য চোরাচালানকারী ঐ সব দ্রব্য চোরাচালান করার সুযোগ গ্রহণ করে। এর জন্য যে সব দ্রব্য চোরাচালান হওয়ার সম্ভাবনা অধিক সে সব দ্রব্যের শুল্ক কর যদি যুক্তিসঙ্গত রাখা যায় তাহলে চোরাচালান কম হতে বাধ্য। সরকার ইতোমধ্যে এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অনেক ক্ষেত্রে শুল্ক কর নীতি গ্রহণ করছেন। কাপড়ের ওপর শুল্ক কর

www.pathagar.com

হ্রাস করায় ১৯৮৮ সনে কাপড়ের চোরাচালান অনেক কমে যায়। অবশ্য গার্মেন্টস শিল্প হতে ব্যাপক হারে বাজারে অবৈধভাবে কাপড় প্রবেশের অভিযোগ আছে। পরবর্তীকালে অবশ্য দেশীয় কাপড় উৎপাদনকে রক্ষা করার জন্য শুল্ক হার ১০০% অব্যাহত রেখে বিক্রয় করে ২০% আরোপ করা হয়েছে। তেমনি চোরাচালান বন্ধের জন্য ইলেকট্রনিক্স শিল্পের যন্ত্রাংশের ওপর ১৯৮৭-৮৮ সনের বাজেটে শুল্ক কমিয়ে ১০% করা হয় (বিক্রয় কর শূন্য)। এর ফলে এ পণ্যের অন্তর্মুখী চোরাচালান বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে স্থল সীমান্ত দিয়ে বহির্মুখী চোরাচালান বন্ধের জন্য শুল্ক কর বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। দেশীয় শিল্পকে রক্ষার প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদেরকে ট্যারিফ প্রটেকশন দিতে হয়, যার ফলে ঐসব দ্রব্যের চোরাচালান বাড়তে পারে। এ প্রসঙ্গে সাইকেল প্রস্তুত শিল্পের উল্লেখ করা যায়।

তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাশের একটি দেশ থেকে চোরাচালান বন্ধ করা খুবই কঠিন। কেননা সে দেশের সঙ্গে আমাদের সীমান্তের মধ্যে প্রাকৃতিক বাধা না থাকায় অতি সহজেই যে কোন দ্রব্য বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে। তেমনিভাবে আমাদের স্থানীয় উৎপাদিত দ্রব্যের আবগারি শুল্ক হ্রাস করেও এ চোরাচালান বন্ধ করা যাবে না। কেননা চোরাচালানকৃত দ্রব্যের ওপর কোন শুল্ক বা কর দিতে হয় না। শুল্ক কর হারের মাধ্যমে চোরাচালান বন্ধ করতে হলে বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের (যার সঙ্গে চোরাচালানী দ্রব্য প্রতিযোগিতা করে) ওপর শুল্ক কর সম্পূর্ণ তুলে দিতে হয়। কিন্তু তা মোটেই সম্ভব নয়। চোরাচালান বিরোধী তৎপরতা বৃদ্ধি করেই এ চোরাচালান বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।

আটক করা চোরাচালানকৃত মালামাল যাতে পুনরায় বাজারে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য শুল্ক বিভাগীয় বিচারে নিষিদ্ধ আমদানি দ্রব্য সম্পূর্ণ রূপে বাজেয়াপ্ত করার বিধান করা হয়েছে। এজন্য শুল্ক আইনের ১৮১ ধারা ১৯৮৫ সনে সংশোধন করা হয়েছে। অন্যদিকে চোরাচালানকৃত আমদানি নিষিদ্ধ মালামাল নিলামে বিক্রি করা হলে নিলামের রশিদ দেখিয়ে বারবার চোরাচালান করা হতো এবং একবার কেনা মাল কোন দোকানেই শেষ হতো না। এজন্য আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য নিলামে বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমদানি নিষিদ্ধ মাল পুনরায় বিদেশে রপ্তানি করার এবং তা সম্ভব না হলে ধ্বংস করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

চোরাচালান মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে চোরাচালানীর দ্রুত শাস্তির বিধান হতে পারে। এজন্য সারাদেশে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ছাড়াও ৭টি বিশেষ ট্রাইবুনাল কায়েম করা হয়েছে। এসব ট্রাইবুনাল ঢাকা, চট্টগ্রাম,

www.pathagar.com

সিলেট, কুমিল্লা, রংপুর, রাজশাহী ও যশোরে কাজ করছে। তাছাড়া আরো ৩টি ট্রাইবুনাল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কতকগুলো মারাত্মক দ্রব্যের চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য ১৯৯০ সনে জারিকৃত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ আইনের ১৯ ধারায় মাদকদ্রব্যের অবৈধ আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদির জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। তাতে ২৫ গ্রামের উর্ধ্ব পরিমাণ হিরোইন, কোকেন এবং কোকা উদ্ভূত মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। একইভাবে অন্যান্য মাদকের অবৈধ আমদানি রপ্তানি ইত্যাদির ক্ষেত্রে শাস্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনে চোরাচালানকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করা হয়েছে এবং সে আইনের ১৫৬ (১) ৮ ধারায় আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হলে ৬ বছরের জেলের বিধান রাখা হয়েছে। অবশ্য স্পেশাল পাওয়ার্স এ্যাক্টে চোরাচালানের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখা হয়েছে। আইনের এসব বিধান চোরাচালানকে প্রতিরোধ করতে সহায়তা করবে। অবশ্য এজন্য চোরাচালান মামলার প্রসিকিউশন ভাল করে হওয়া দরকার, যাতে করে আদালত যথাযোগ্য শাস্তি দান করে। উল্লেখ্য, চোরাচালান মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত ও প্রসিকিউশন ঠিকমত হয় না বলে নানা অভিযোগ রয়েছে। এজন্য চোরাচালান মামলা তদন্তকারী অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ও তাদের বিশেষ ট্রেনিং দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

চোরাচালান দমনে সহায়তার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শুল্ক আইনের ৬ ধারার অধীনে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন পদাধিকারী অফিসার ও কর্মচারীদেরকে শুল্ক আইনের চোরাচালান দমন সংক্রান্ত ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের ক্ষমতা দিয়েছে। পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ব্যাংকের অফিসারদের শুল্ক আইনের ১৫৮, ১৫৯ ও ১৬০ (তল্লাশীর ক্ষমতা), ১৬১ ও ১৬৩ (গ্রেফতার), ১৬৪ (যানবাহন তল্লাশী), ১৬৫ (জিজ্ঞাসাবাদ), ১৬৬ (লোক তলব), ১৬৮ ও ১৭২ (মাল আটক), ১৭৪ (দলিল আহ্বান) ধারায় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

একই কারণে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সীমান্ত এলাকায় নিয়োজিত সব র‍্যাংককে ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১ ধারায় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সমুদ্র পথে চোরাচালান নিরোধের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১ ধারায় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

চোরাচালান দমনে কার্যকরী সমন্বয়ের জন্য জাতীয় চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি বৎসরে কয়েকবার মিলিত হয়ে চোরাচালান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেন ও প্রয়োজনীয় পলিসি নির্ধারণ করেন। এ জাতীয় কমিটির অধীনে একটি চোরাচালান বিরোধী জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ট্রাস্কফোর্স বাংলাদেশ রাইফেসল, পুলিশ, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা বিভাগ, শুল্ক বিভাগ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি আছে। পরবর্তীকালে বিভাগীয় কমিশনারদেরকে এ কমিটিতে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ কমিটি প্রত্যেক মাসে সভা করে থাকে এবং চোরাচালান প্রতিরোধে আন্তঃএজেন্সি সমন্বয় সাধন করে থাকে এবং সার্বক্ষণিকভাবে চোরাচালান পরিস্থিতির ওপর নজর রাখে। বিভাগীয় পর্যায়ে চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রমে সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে সব চোরাচালান প্রতিরোধ এজেন্সিসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আঞ্চলিক টাস্কফোর্স কাজ করছে।

জাতীয় চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটি, কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স ও আঞ্চলিক টাস্কফোর্স গঠনের ফলে অবশ্যই আন্তঃএজেন্সি সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য সমন্বয় আরো বৃদ্ধির অবকাশ সব সময়ই থাকবে। এরপরও যে চোরাচালান হচ্ছে তার কারণ অন্য। সে সম্পর্কে এখানে ব্যাপক কোন আলোকপাত করা হচ্ছে না। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, তার কারণ সংঘবদ্ধ চোরাচালান প্রচেষ্টা, নিত্য নতুন চোরাচালান রুট বের করা, চোরাচালান নিরোধ কাজে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের জাহাজ, যানবাহন, কম্যুনিকেশন ও অন্যান্য ইকুইপমেন্টের অভাব, বেকারী বা অতিমুনাফার লোভে দেশের স্থল সীমান্তের কোন কোন এলাকায় (যেমন সাতক্ষীরা, যশোর, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জের স্থল সীমান্ত) এবং চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলের জনগণের একটি অংশের চোরাচালানে জড়িয়ে পড়া, কোন কোন দেশীয় পণ্যের নিম্নমান, ভারত ও বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্যের কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য, চোরাচালানে ব্যাপক লাভের সম্ভাবনা এবং এজেন্সিসমূহের অনেক সদস্যের দুর্নীতি।

চোরাচালান সম্পূর্ণ দমন করা না হলেও তা অবশ্যই কমিয়ে আনা সম্ভব। এ জন্য পূর্বে নেওয়া ব্যবস্থাসমূহ ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপ বিবেচনা করা যায়।

ক. সমুদ্র পথে চোরাচালানী দ্রব্য ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে প্রবেশ করে থাকে। এর প্রতিরোধের জন্য আমাদের কোন সিভিল এজেন্সি নেই। এজন্য সরকার একটি কোস্ট গার্ড স্থাপন করতে পারেন। যতদিন পর্যন্ত কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠা না করা হয় ততদিন নৌবাহিনীকে এ দায়িত্ব আরো ব্যাপকভাবে পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

খ. স্থলপথে ব্যাপক চোরাচালন বন্ধ করার জন্য সীমান্তের সবচেয়ে চোরাচালান প্রবণ এলাকায় (বিশেষ করে সাতক্ষীরা, যশোর, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জের কোন কোন এলাকায়) কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে যে খরচ হবে তার তুলনায় জাতীয় অর্থনীতি এক বছরেই অনেক বেশি লাভবান হবে।

গ. সীমান্তে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর ফাঁড়িসমূহ অনেক এলাকায় ৮/১০ মাইল দূরে দূরে অবস্থিত। চোরাচালান প্রবণ সীমান্তসমূহে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর ফাঁড়িসমূহের দূরত্ব কমিয়ে আনা দরকার এবং এজন্য বিডিআর-এর শক্তি বৃদ্ধি করা দরকার। বাংলাদেশ রাইফেলস ব্যাটালিয়নসমূহে কমিশনড অফিসারের সংখ্যা খুবই কম। এই সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। কোম্পানিতে বর্তমানে কমিশনড অফিসার নাই। সীমান্তে আউট পোস্টসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির জন্য কোম্পানি পর্যায়ে কমিশনড অফিসার নিয়োগ করতে হবে।

ঘ. আমাদের দেশের শিল্প দ্রব্যের মান বাড়াতে হবে এবং ডিজাইন উন্নত করতে হবে। কেননা, নিচু মানের জন্য দেশীয় পণ্য চোরাচালানী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। বিশেষ করে যখন মূল্য ও মান দু'টোই চোরাচালানী পণ্যের পক্ষে চলে যায় তখন চোরাচালান অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে। এজন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে বাংলাদেশের শিল্প রক্ষা করার স্বার্থে সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. বাংলাদেশের পণ্য মূল্য যাতে বিদেশী পণ্যের মূল্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় সেদিকে যতটা সম্ভব নজর রাখতে হবে। এজন্য সরকারকে বাংলাদেশী ও প্রতিবেশী দেশের পণ্য মূল্যের সার্বক্ষণিক পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে যেখানেই সম্ভব শুল্ক এবং অন্যান্য নীতির ত্বরিত বিন্যাসের মাধ্যমে তার প্রতিকার করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে লাভ কমে আসে। বাংলাদেশী শিল্পের সামগ্রিক দক্ষতা ও ক্যাপাসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য মূল্য যথাযথ করার চেষ্টা করতে হবে।

চ. দেশের অভ্যন্তরে বর্তমানের মত সময়ে সময়ে বড় বড় মার্কেট ও বাজারে চোরাচালান বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। এতে সার্বিক ফল পাওয়া না গেলেও চোরাচালানের লাভ তুলনামূলকভাবে কমে আসবে এবং সে পরিমাণে চোরাচালান নিরুৎসাহিত হবে।

এ সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে চোরাচালান প্রতিরোধে অবশ্যই অগ্রগতি হবে।

www.pathagar.com

তুরস্কে মানবাধিকার লঙ্ঘন

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং বিশ্বের প্রধান প্রধান টেলিভিশন সংস্থার খবরে দেখা যায় যে, কিছুদিন আগে তুরস্কের নির্বাচনে নির্বাচিত ভার্চু (ফাজিলাত) পার্টির পার্লামেন্ট সদস্যা মারভি কাভাকচিকে 'হিজাব' পরিহিত (রুমাল দ্বারা তিনি সুন্দরভাবে মাথা, গলা ও ঘাড় ঢেকেছিলেন) অবস্থায় শপথ নিতে দেওয়া হয়নি। তাকে পরবর্তীতে এক সরকারি আদেশে তুরস্কের নাগরিকত্ব হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে এসব ব্যবস্থা ও আদেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এর পূর্বে গত বছর ইসলামী ভাবধারাপন্ন রাফাহ পার্টির পক্ষ থেকে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজমুদ্দিন আরবাকান ও অন্যান্য কিছু নেতৃবৃন্দকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। তুরস্কে স্কুল, কলেজ ও সরকারি অফিসে 'হিজাব' ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। উপরে উল্লিখিত সকল কাজই মানবাধিকার, ধর্মীয় অধিকার এবং গণতন্ত্রের শিক্ষার বিরোধী। তুরস্কে এ ধরনের অনেক কাজ 'কামালিজম'-এর নামে চলছে। মানবাধিকার এবং ধর্মীয় অধিকারের বিরুদ্ধে এ সকল পদক্ষেপ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। মানবাধিকার এবং ধর্মীয় অধিকারের বিরুদ্ধে এ সকল পদক্ষেপ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এসবের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল গণতন্ত্রকামী, মানবাধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সকল মহলের সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। মারভি কাভাকচি এবং অন্যান্য সকল মুসলিম মহিলা যাতে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক পার্লামেন্টে, অফিসে, স্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে 'হিজাব' বা ইসলামী পোষাক ব্যবহার করতে পারেন তার জন্য সর্বতোভাবে তুরস্ক সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তেমনিভাবে যাতে আরাবাকান ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বাধীনভাবে রাজনীতি করতে পারেন তার জন্যও চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC), গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল, সকল ইসলামী নেতৃবৃন্দের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। আমরা আনন্দিত যে বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতীব এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে বক্তব্য রেখেছেন এবং অধ্যাপক গোলাম আযম একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আশা করি ইসলাম ও মানবাধিকারকে ভালবাসেন এমন সকল ব্যক্তি ও সংস্থা এ ব্যাপারে একটি আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ মে ১৯৯৯

www.pathagar.com

দক্ষিণ এশিয়া মানব ব্যবসা বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন

ভারতের নয়াদিল্লীতে ফেব্রুয়ারি ২৬-২৮, ১৯৯৬ ইং তারিখ শাস্ত্রী ইন্দো-কানাডিয়ান ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়া মানব পাচার (Traffiking in Persons) বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মশালার বিভিন্ন অধিবেশনে নিম্নোক্ত বিসয়সমূহ উপস্থাপন করা হয় ঃ

১. আইন ও পাচার;
২. পাচারের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক উপাদান;
৩. মানুষ পাচার এবং যৌন শিল্প;
৪. পাচার, স্বাস্থ্য এবং মাদকদ্রব্য অপব্যবহার;
৫. পাচার এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা;
৬. শিশু পাচার এবং
৭. পাচার সংশ্লিষ্ট নীতি ও প্রশাসন।

আমি কর্মশালার বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য প্রদানসহ একটি লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করি। আমার লিখিত বক্তব্য পরিশিষ্ট 'ক' হিসেবে দেখানো হল। তবে সংক্ষেপে আমার প্রদত্ত বক্তব্যের কিছু বিষয় উল্লেখ করছি।

বাংলাদেশে শিশু, যুবতী, নারী পাচার একটি বড় সমস্যা। এখান থেকে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে পাচার করা হয়। এমনকি মানব অঙ্গ প্রত্যঙ্গও বর্তমানে একটি ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে অন্য দেশ থেকে মানব পাচার হয়ে আসে না।

বাংলাদেশের সংবিধানে ১৮ (২) নং অনুচ্ছেদে পতিতাবৃত্তি নিরোধের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন অধ্যাদেশের ৪ নং ধারায় নারীদের পতিতাবৃত্তি অথবা অন্য কোন বেআইনী বা অনৈতিক উদ্দেশ্যে অপহরণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তির পরিমাণ ১৪ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

www.pathagar.com

উক্ত আইনের ৫ ধারায় পতিতাবৃত্তি, অন্য কোন বেআইনী অথবা অনৈতিক উদ্দেশ্যে যে কোন বয়সের নারী পাচার, আমদানি, রফতানি, ক্রয়, বিক্রয় অথবা অন্য কোনভাবে অধিকারে থাকা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যা সর্বোচ্চ ১৪ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার মহিলা এবং শিশুদের পাচার বন্ধ এবং পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের জন্য পতিতাদের পুনর্বাসনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে কাজ করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিকভাবে পঙ্গু ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। ইহার উদ্দেশ্য হলো পতিতালয় হতে নারী ও বালিকাদের উদ্ধার করে পতিতাবৃত্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদেরকে শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সংশোধনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ ধরনের মোট ৬টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তবে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে পতিতাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা উন্নত করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মশালায় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করেন ঃ

১. একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা আয়োজনের জন্য শাস্ত্রী ইনস্টিটিউটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনসহ গৃহীত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের বিষয়টি ফলোআপের অনুরোধ জানানো হয়;

২. পতিতাবৃত্তি, জোরপূর্বক শ্রম এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের জন্য নারী, পুরুষ ও শিশু পাচার বন্ধের বিষয়ে সরকারসমূহকে কঠোর নীতি অবলম্বন করা;

৩. মানব পাচার বন্ধের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সরকার কতৃক নির্দেশ প্রদান;

৪. পাচারকৃতদের কার্যকরীভাবে দ্রুত উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন;

৫. পাচারের শিকার ঐসব নারী ও বালিকা যাদেরকে গ্রামে ফেরত পাঠানো সম্ভব নয় তাদেরকে শহরে পুনর্বাসিত করা। তাদেরকে সরকারি আবাসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে;

www.pathagar.com

৬. পতিতাবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত বিষয় যেমন নারী ও শিশু পাচার ইত্যাদি বিষয় স্কুল পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা;

৭. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক পাচারের শিকার নারী, পুরুষ ও বালিকাদের কোনভাবে হয়রানি না করা, বরং সাহায্য করা এবং এ সংক্রান্ত আইন প্রয়োজনে সংশোধন করা;

৮. স্বদেশী কর্তৃপক্ষের নিকট উদ্ধারকৃত পাচারকৃতদের হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সহজতর করা এবং আন্তর্জাতিক প্রত্যাবাসন সংস্থা (IOM) এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে;

৯. পাচারের মূল কারণ মূলোৎপাটনের জন্য শিক্ষা ও ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমে শিশু ও যুবক যুতীদের নৈতিকতা গঠনের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা;

১০. যে সব স্থান হতে নারী ও শিশুদের পাচার করা হয় সে সব স্থানসমূহে কার্যকরী কল্যাণমূলক এবং ক্রেডিট প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া;

১১. সরকার কর্তৃক অশ্লীল পুস্তক, পুস্তিকা ইত্যাদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা;

১২. বিভিন্ন দেশে যে সব বিবাহ ব্যুরো আছে তাদের অপতৎপরতা বন্ধের জন্য তাদের ওপর তদারকি বৃদ্ধি করা ও প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করা;

১৩. পাচারের জন্য প্রতারণামূলক (deceptive) বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা এবং এ ব্যাপারে কঠোর শাস্তির বিধান করা।

এ সবের ভিত্তিতে ওয়ার্কশপের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে বলে আশা করা যায়।

পরিশিষ্ট 'ক'

TRAFFICKING IN PERSONS AND THE SEX INDUSTRY BANGLADESH PERSPECTIVE

INTRODUCTION

Traffic in women and children is a big problem in the modern society. Due to structural inequality at a global level, many poor young women and children in the Third world countries are victims of this traffic. Trafficking in women would include all acts involved in kidnapping and acquisition of woman for trade

www.pathagar.com

and trasport with the intent to sell, exchange or use for any illegal purpuse, such as servitude in the guise of marriage, prostitution, bonded labour or sale of human organs. Trafficking takes place by a variety of means such as promises of jobs or marriages and at times, even by physical violence and kidnapping.

Sex slavary is a pratice that is controlled and dominated sometimes by heavily armed and very menacing gangs and individuals who have been able to buy protection in many countries.

The traffic in women and children depends upon a market procurers work in the poverty stricken countryside to Third world nations as well as bus and train stations of major cities acquiring girls and young women. They maintain a constant supply to serve the market. Poverty, illiteracy and backwardness are the main reasons for the increase in trafficking in young girls and children. Procurers and criminal organizations sell children to brothels.

Trafficking in women and young girls includes all acts involved in kidnapping and acquisition of them for trade and transport with the intent ro sell, exchange or use for such purpose as prostitution, sexual abuse and forced labour. This problem, seems to have increased tremendously in the last two dccades. It is extremely difficult to assess the actual number of prostitutes currently operating, but according to police estimates the number of women in Dhaka and the adjacent port town of Narayangonj is nearly 10,000 some of these are is brothels. Some operate as street prostitutes some are hotel call-girls. There are a few who use park, residential addresses for business. A grave issue is the recent regional linkage established by gangs of criminals for trafficking in women and children. Due to rape and sexual abuse, woman's right to bodily security is violated in the greatest possible way.

THE CAUSES

The problem of unemployment, under employment and poverty has led to the international trafficking and labour migation of women and children. They are being transfered as commodities

www.pathagar.com

from one place to another and forced into prostitution in rural poor families, many men who are socially expected to support their families as heads of houshold and Primary earners, find themselves unable to do so, because of increasing landlessness, unemployment and illiteracy. Getting this opprotunity gangs of crimianals misguide them, make false promise and take women and young girls from the village homes with the promise of jobs in towns and abroad, where there is massive poverty such promises hold new hope for better life for the whole family. But they often become the unwritting and unwilling victims of prostitutions.

According to human right activists 200 to 400 young women and children are smuggled every month from Bangladesh to neighbouring countries and the number has been on the rise since the mid 1980s. The procurers can easily lure young girls and women to leave home for better jobs and when they are trapped, thery either try to escape or end up in prostitution. In this position, the procurers use different borders of Bangladesh and take them to west Bengal, Bombay, Punjab in India and Karachi and Hydrabad in Pakistan. There are networks of traaffickers and brokers with links which extend from Bangladesh through India into Pakistan. The traffickers recruit girls and women through their regional contact persons, promising them jobs.

As discussed, practise of procuring young girsl through marriage is one of the vital factor. Beside this Kidnapping of younn girls is another way of procuring. Sometimes traffickers have taken the young girls with promise to provide them with jobs and better prospects in neighbouring countries of India and Pakistan and the Middle East. Mostly these young girsl and women come from poor families. If a mother wants to take her child along with her, she has to pay for her child to the brokers. In this case mother and child are kept together during the journey. But when they reach their desination, mother and child are seperated and it is told that mother cannot work keeping the child with her. As such it is better that the child goes to an orphanage which will be arranged by the agents. On the other hand, without the knowledge of the mother, the child is sold off at a higher rate. So the child is an extra bonus for the traffickers.

www.pathagar.com

In a survey carried out by the Directorate of Social Welfare, Govt of Bangladesh the following have been identified as causes for joining prostitution.

1) Seduction by others	27%
2) Seduced by brokers in the name of giving jobs	20.5%
3) Torture by husband	11 %
4) Poverty in the family of parents	11%
5) Divorce by husband	5%
6) Others	25.5%

ROUTES OF INTER COUNTRY TRAFFICKING

Regarding trafficking in persons (Women and children) there are many land routs along the border areas of Bangladesh and India. The border areas are Khulna, Jessore, Satkhira, Rajshahi, Dinajpur, Rangpur by which trafficking is made to West Bengal, Bombay, Punjab in India and Karachi and Hyderabad in Pakistan. In Bangladehs Jessore and Satkhira border areas are mostly used for children and women trafficking to India by land routes. As it is well connected by bus and train, procurers can easily reach calcutta where they are sold. Calcutta has been well known for prostitution and selling of children and woman and there are well organized agents to take them to Bombay and karachi in Pakistan. There is a network of agents starting with Bangladesh, India extending to pakistan and the Gulf countries. In both India and Pakistan, children are being sold to brothel owners.

Policy of the Govt of Bangladesh

The constitution of the People's Republic of Bangladesh has the following provision :

"18.2 The State shall adopt effective measures to prevent prostitution and gambling."

Under section 4 of the Cruelty to women (Deterent Punishment) ordinance 1983 kidnapping or abduction of women for prostitition or for any unlawful or immoral purpose has been made punishable. The maximum punishment for which may extend to 14 yeares.

www.pathagar.com

Under section 5 of the same Act Trafficking in women has been made punishable and whoever imports or exports, sells, buys or otherwise obtains possessinon of any woman of any age with intent for their use for the purpose of prostitution or for any other unlawful or immoral purpose shall be liable for imprisonment which may extend to 14 years.

In keeping with the aforesaid, the objective of the Govt of Bangladesh is to combat trafficing in women and children and also to rehabilitate the prostitutes with a view to ultimate elimination of prostitution. Ministry of Social Welfare and the Ministry of Home and other relevant Govt institutions are working in that direction. The Ministry of Social Welfare has undertaken a training and rehabilitation programme of the socially handicapped girls. The objective is to salvage of the socially handicapped girls. The objective is to salvage the adolescent and young girls from the brothels and prostitution to establish centres for correction, education and socio-ecnomic rehabilition of these girls and to create awareness against the evil of prostituion.

Sex industry is the cause of so much suffering, pain and humilation of women. This calls for its elimination from the face of the earth and that should be the objective of the international community. This is the root cause of trafficing in women and girl children. We can not eliminate trafficing in women without totally combating sex industry.

Reference :

1. Women in Development publlished by the Ministry of Women and Children Affairs, Govt of Bangladesh.
2. Regional workshop' for South Asian Platform of Action 1994.
3. Survey of prostitutes, published by the Directorate of Social Welfare, Govt of Bangladesh.

(নয়াদিল্লী, ভারত, ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬-তে অনুষ্ঠিত কর্মশালার প্রতিবেদন)

www.pathagar.com

কসোভো সমস্যার ইতিবৃত্ত ঃ সমাধান কি?

কসোভো এক সময় তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল ছিল। পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বলকান যুদ্ধের পর তুরস্ককে বলকান এলাকা ছেড়ে দিতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়, কসোভো তার অন্তর্ভুক্ত হয় সার্বিয়ার একটি অঞ্চল হিসেবে। যুগোস্লাভিয়া ছিল একটি ফেডারেল রাষ্ট্র, যার প্রত্যেকটি অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন ছিল। অন্যান্য অঞ্চল ছিল স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া, মেসিডোনিয়া এবং মন্টেনিগ্রো। যুগোস্লাভিয়া একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ছিল। যদিও মস্কোর অনুবর্তী এটি ছিল না। মস্কোর সাথে তার বিরোধ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার ধাক্কা যুগোস্লাভিয়াতেও লাগে; বিশেষ করে মার্শাল টিটোর পতনের পর। টিটোর পতনের পর উগ্র সার্বীয় জাতীয়তাবাদী মিলোসেভিচের উত্থান ঘটে।

মিলোসেভিচের আমলে অনেক রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেছে। তার উগ্রবাদী রাজনীতির কারণে ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া ও মেসিডোনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং স্বাধীন হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে তেমন কোন রক্তপাত ঘটেনি। বসনিয়াও স্বাধীন হতে চায়। বসনিয়া জাতিগতভাবে সার্বিয়া থেকে এবং যুগোস্লাভিয়ার অন্যান্য এলাকা থেকে অনেক ভিন্ন। বসনিয়ার সর্বপ্রধান জনগোষ্ঠী হচ্ছে মুসলিম। ক্রোয়েটরাও তাদের সাথে স্বাধীন হতে চায়। তাদের নির্বাচিত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় স্বাধীন হওয়ার জন্য। কিন্তু মিলোসেভিচের সুস্পষ্ট উস্কানিতে বসনিয়ায় সার্বরা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এর ফলে বসনিয়াতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বসনিয়ার কোন পক্ষই যাতে অস্ত্র না পায় তার জন্য অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে অবরুদ্ধ বসনিয়া সরকার অস্ত্র পেতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বসনিয়ার বিদ্রোহী সার্বরা মিলোসেভিচের নিকট থেকে অস্ত্র পেতে থাকে। এর ফলে ৪/৫ বছর স্থায়ী গৃহযুদ্ধে কয়েক লাখ লোক (প্রধানত মুসলিম) নিহত হয়, অসংখ্য নারী নির্যাতিত হয়, অসংখ্য শিশু এতিম এবং অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। দেশের অসংখ্য শহর, গ্রাম এবং অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কয়েক বছর এভাবে পার হবার পর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের টনক নড়ে এবং তারা শেষ পর্যন্ত ডেটন (Dayton) চুক্তির মাধ্যমে ঐ দেশে একটি শান্তি

www.pathagar.com

স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু করে। দেশটিকে দু'ভাগ করা হয়। এক ভাগ সার্বদের এবং অন্যভাগ মুসলিম ও ক্রোয়েটদের। একটি আন্তর্জাতিক শান্তিবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু এখনো যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি হয়নি। অধিকাংশ যুদ্ধাপরাধী সার্বদের মিলোসেভিচ আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। শরণার্থীদের সবাই এখনো তাদের বাড়ি-ঘরে ফিরি যেতে পারেনি।

এসবের পিছনে রয়েছে মিলোসেভিচ এবং এই মিলোসেভিচই কসোভো সমস্যার কারণ। কসোভোর সাম্প্রতিক সমস্যার শুরু হয়েছে যখন এ অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন সার্বিয়া সরকার বাতিল করে দেয়। এ সিদ্ধান্তের পর থেকে কসোভোর জনগণ ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। কসোভোর লোকদের নেতৃত্ব যারা দিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ইবরাহিম রুগোভা। কিন্তু সার্বীয় সরকার এবং তার প্রধান মিলোসেভিচ নির্যাতন ও হত্যার পথ অবলম্বন করেন। এরই ফলে কসোভো লিবারেশন আর্মী-এর (KLA) জন্ম হয় এবং তারা সার্বীয় হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইতোমধ্যে সেখানে বেসরকারিভাবে কসোভোর নেতৃবৃন্দ জনগণের রায় নেওয়ার জন্য একটি গণভোট অনুষ্ঠান করে, যাতে কসোভোর জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। স্বাধীনতার দাবি না মেনে সার্বীয় সরকার তাদের অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দেয়। তারা কসোভো লিবারেশন আর্মিকে দমনের নামে সারাদেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং এর ফলে বহু লোক নিহত ও আহত হয়। নারীরা নির্যাতিতা হয়। এছাড়া প্রায় তিন লাখ লোক ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। তারা বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। মনে রাখতে হবে, এ সংখ্যা হচ্ছে কসোভোর মোট জনগণের ১৫ শতাংশ। অবশেষে অনেক দেনদরবার, জাতিসংঘ ও ন্যাটোর রাষ্ট্রসমূহের প্রচেষ্টায় এ অত্যাচার সাময়িকভাবে বন্ধ হয়।

এভাবে পালানো লোকদের একটি অংশ ঘর-বাড়িতে ফিরে আসে। এসব ঘটনা ঘটে ১৯৯৭ সনের শীতকালে এবং তার পরবর্তী সময়ে। ন্যাটোর রাষ্ট্রসমূহ এরপর এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া শুরু করে। কিন্তু তারা অসংখ্যবার মিলোসেভিচের সাথে সাক্ষাৎ করেও তাকে গ্রহণযোগ্য সমাধানে রাজি করতে পারেনি। তাদের প্রস্তাবিত সমাধানের মূল বিষয় হচ্ছে এ এলাকার জনগণকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া, একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন করা যাতে কসোভোর জনগণের আস্থা ফিরে আসে এবং সার্বীয় সৈন্যবাহিনীর সার্বিয়া প্রত্যাগমন সম্ভব হয়। ফ্রান্সের রামবুয়েতে দু'দুবার আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও কসোভোর জনগণ স্বাধীনতা চায় তথাপি তারা

www.pathagar.com

শান্তির স্বার্থে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব মেনে নেয়। কিন্তু মিলোসেভিচ তা মানতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত কসোভোয় যুদ্ধ শুরু হয়। ন্যাটো বিমান আক্রমণ শুরু করে। সার্বীয় বাহিনী কসোভোর নিরপরাধ জনগণের ওপর হামলাপূর্বক তাদের অসংখ্য লোককে হত্যা ও নির্যাতন করে এবং দেশের ৫০% লোককে দেশান্তরিত করে এবং আরো ২০% লোককে দেশের ভেতরে উদ্বাস্তুতে পরিণত করে। দেশের বাইরে এসব লোক আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়া, মন্টেনিগ্রো ও বসনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছু লোককে অন্যান্য দেশে সরিয়ে নেওয়া হয়। দু'মাসেরও অধিক সময় ধরে বিমান হামলার পর জি-৭ ও রাশিয়ার চেষ্টায় মিলোসেভিচ ন্যাটোর মূল প্রস্তাবসমূহ মেনে নেয় এবং এ ভিত্তিতে বহু আলোচনার পর নিরাপত্তা পরিষদের জন্য একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরি হয় এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ তা গ্রহণ করে। এর ফলে কে-ফোর্স (K-Force) কসোভোতে অবস্থান নেয়, সার্বীয় বাহিনী কসোভো ত্যাগ করে এবং কসোভোর জনগণের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন শুরু হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে সার্বীয় বাহিনী অকল্পনীয় হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা চালায়।

এ পরিস্থিতিতে কসোভো সমস্যার সমাধান কি? কসোভোর জনগণ স্বাধীনতা চায়। কিন্তু ন্যাটো, পাশ্চাত্য শক্তি, রাশিয়া তাতে রাজি নয়। রাশিয়ার বিরোধিতা বুঝা যায়। বসনিয়া ও কসোভো সমস্যায় তারা মানবিক ও যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেনি। তারা সার্বীয় পক্ষ অবলম্বন করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য কি বুঝতে পারে না যে কসোভোর অধিকাংশ জনগণ যারা মুসলিম, তাদেরকে সার্বিয়া বরদাশত করতে পারে না। তারা সার্বিয়ার সাথে একত্রে বাস করতে আর পারবে না। পানি এখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। পানি এখন রামবুয়েতে নেই। তারা মুসলিম বলেই তাদেরকে স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না, এটা সংগত নয়। প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of self-determination) আছে। এটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। কসোভোর জনগণের সে অধিকার পাওয়া উচিত। জাতিসংঘ এ ব্যাপারে কসোভোর মতামত পুনরায় যাচাই করতে পারে। ১০% সার্বদের জন্য কসোভোর একটি অংশ আলাদা করার চিন্তা করা হচ্ছে। তা সঠিক হবে না। তা হলে তো সার্বিয়ার অন্যান্য এলাকার সংখ্যাঘরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র বিবেচনা করতে হবে। সংখ্যালগিষ্ঠদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে এসব দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আশা করি জাতিসংঘ ও ন্যাটো এ পথেই এগুবে।

দৈনিক অর্থনীতি ০৮-০৮-৯৯

www.pathagar.com

ইসলামী দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি

ইসলামী দাওয়াত (Islamic Call) ইসলামী আদর্শ ও বিধানেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী দাওয়াত হচ্ছে ইসলামের সংরক্ষণ এবং ইসলামী সমাজের রূপায়ণ ও অগ্রগতির পদ্ধতি। কুরআন মাজীদেই ইসলামী দাওয়াতকে মুসলমানদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তোমরা ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ কর এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর, বিরত রাখ।" (আল কুরআন ৩ ঃ ১১০)

"তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা উচিত; যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে থেকে বিরত রাখবে।" (আল কুরআন ৩ ঃ ১০৪)

"তোমাদের বানিয়েছি এক মধ্যপন্থী জাতি, যেন তোমরা বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শক হতে পার।" (আল কুরআন ২ ঃ ১৪৩)

ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষকে ইসলামের অনুগত ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করা ও সুকৃতির প্রসার এবং দুষ্কৃতির মূলোৎপাটন করা। যেখানেই সম্ভব সেখানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করাও নিশ্চয়ই ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য। কেননা আল্লাহর রাসূল (স) নিজেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং রাসূলের সুন্নাত হলো আমাদের আদর্শ। ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে, "যখন তাদের দুনিয়ার বুকে ক্ষমতা দেওয়া হয় তখন তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সুকৃতির প্রতিষ্ঠা করে ও দুষ্কৃতির মূলোৎপাটন করে।" (আল কুরআন ২২ ঃ ৪১)

ইসলামী দাওয়াতের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিশ্চয়ই ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা—এমন রাষ্ট্র যা ইসলামী আইন-কানুনের অনুগত হবে ও ইসলামের আলোকে সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে এবং অনৈসলামিক প্রভাব হতে মুক্ত থাকবে। কিন্তু যদি কোন সময়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্যে বাস্তবভাবে কাজ করা সম্ভব নয়, তাহলে ইসলামী সমাজ ও ব্যক্তি তৈরি করাই হবে ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইসলামের দাবি বা শিক্ষা নয়। যেমন কুরআন পাকে ঘোষণা করা হয়েছে, "আল্লাহ কাউকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না।" (আল কুরআন ২ ঃ ২৬৮)

www.pathagar.com

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে, ক্ষমতানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কাজেই ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য হবে. কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা এবং কোথাও ইসলামী সমাজ ও ব্যক্তি তৈরি করা। আর তা নির্ভর করবে পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর। আমাদের দেশে বর্তমানে অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পরিবেশ রয়েছে।

ইসলামী দাওয়াতে এসব লক্ষ্য কার্যকরী করার কর্মপদ্ধতি কী হতে পারে তা নির্ধারণ করার জন্য আমাদেরকে নবী (স)-এর সুন্নাতের দিকে দেখতে হবে। নবী (স)-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি ইসলামী দাওয়াত প্রসারের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি খাওয়ার মজলিসে দাওয়াত দিয়েছেন। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আহ্বান জানিয়েছেন। গোপনে মক্কার আশেপাশে এবং বিভিন্ন মেলায় ঘুরে ঘুরে প্রচার করেছেন। মক্কার বাইরের বিভিন্ন শহরে দাওয়াত দিতে বের হয়েছেন। হিজরত করেছেন, যুদ্ধ করেছেন—অর্থাৎ দাওয়াতের প্রসারের জন্য যখন যা উপযুক্ত মনে করেছেন, তাই করেছেন। তবে ইসলাম যে সাধারণ নৈতিক নিয়মাবলি দিয়েছে, তা কখনো ভঙ্গ করেননি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে নবীর সুন্নাত হলো একটি উন্মুক্ত ও উদার পথ। অর্থাৎ ইসলামের নৈতিক নিয়মাবলির সীমার মধ্যে হলে যে কোন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করাই নবীর সুন্নাত মোতাবেক হবে। ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি একটি মুক্ত ও খোলা বিষয় হওয়ার কারণেই বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

পদ্ধতিগত সুন্নাতের আলোচনার পর দেখতে হবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী দাওয়াতের জন্য কি কি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি পদ্ধতি হতে পারে। প্রথমত রাজনৈতিক, দ্বিতীয়ত তামাদ্দুনিক ও তৃতীয়ত বৈপ্লবিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দল গঠন, স্বাধীন সংবাদপত্র ও প্রকাশনার সদ্ব্যবহার, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সরকার গঠন, আইন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজ করে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে রাজনৈতিক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। অন্যদিকে উন্নত সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষিত জনগণকে এবং অন্যান্য উপায়ে সাধারণ জনগণকে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষিত, অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলাম অনুসরণে উৎসাহিত করাকে ইসলামী দাওয়াতের তামাদ্দুনিক বা সাংস্কৃতিক পদ্ধতি বলা যায়। ইসলামী দাওয়াতের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হলে অথবা মুসলিম জাতির আত্মরক্ষার জন্য অপরিহার্য হলে বৈপ্লবিক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

www.pathagar.com

কোন দেশে দাওয়াতের কী পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, তা নির্ভর করবে সে দেশের পরিস্থিতির ওপর। এমনও হতে পারে যে বিভিন্ন পদ্ধতিকে একই সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে হবে। তবে একটি কথা আমাদের খুব ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব একটি রাজনৈতিক অস্থিরতার (instability) মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে। তার পূর্বে তারা ছিল বিভিন্ন উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের অধীন। সে সময় তাদের গভীর ও সুদৃঢ় কোন রাজনৈতিক ট্রেনিং ছিলনা। ফলে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড যে ধরনের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা অর্জন করেছে, মুসলিম বিশ্ব সে ধরনের কোন স্থিতাবস্থা এখনও অর্জন করতে পারেনি। মুসলিম বিশ্বে এখনো হর-হামেশা সামরিক বিপ্লব, নতুন নতুন দল গঠন, সরকার পরিবর্তন ও পতন লেগেই আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী দাওয়াতের জন্য রাজনৈতিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বৈপ্লবিক পদ্ধতির মাধ্যমেও গত ত্রিশ বৎসরে একমাত্র ইরান ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। অবশ্য মুসলমান যেখানে জাতিগত জুলুমের শিকারে পরিণত হয়েছে সেখানে বৈপ্লবিক পদ্ধতি গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী দাওয়াত ও মিশনের প্রসারের জন্য তামাদ্দুনিক পদ্ধতির ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কেননা বর্তমান পরিস্থিতিতে এ পদ্ধতিই সবচেয়ে অধিক কার্যকর হওয়া সম্ভব। তামাদ্দুনিক পদ্ধতির লক্ষ্য হবে জনগণকে ইসলামী আদর্শ-বিধান, মূল্যবোধ ও ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত করে তোলা, যেন ইসলামী বিধান ও আদর্শ জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিশ্বাস, বিবেক ও চিন্তার অংশে পরিণত হয়। জনগণের চিন্তাকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে হবে, যাতে যে কোন সমস্যা ও বিষয়ে তাদের নজর সর্বপ্রথম স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম ও তার শিক্ষার দিকে নিবদ্ধ হয়। তামাদ্দুনিক পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে হবে একটি শিক্ষা আন্দোলন (Education Movement)। যতদিন পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী রূপ দেয়া না হবে অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে যথাযোগ্য মর্যাদা না পাবে, ততদিন পর্যন্ত উন্নত ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমেই কেবল শিক্ষিত সমাজকে ইসলামী বিধান, মূল্যবোধ ও ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এ পথই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে মুসলিম বিশ্বে গত পঞ্চাশ বছরে এক নতুন ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এ সাহিত্যের ভাষা আধুনিক, এর পরিভাষা আধুনিক। সমাজ-বিজ্ঞানে বর্তমান সময়ের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই সাহিত্য রচনায় যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

উপমহাদেশের আল্লামা ইকবাল, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা আকরাম খাঁ ও ফররুখ আহমদ উল্লেখযোগ্য। আরব বিশ্বের সাইয়েদ কুতুব, ইউসুফ আল কারদাবি, মোস্তফা আল জারকা, সাঈদ রমজান, মুহাম্মদ আল গাজালী ও অন্যদের মধ্যে আলীজা ইজে তাবেগভিচ, মুহাম্মদ আসাদ, মরিয়ম জামিলা জামাল বাদাবী, আব্দুল হামিদ আবু সুলেমান ও টি রি আরভিং-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রচিত সাহিত্যের পর এই নতুন সাহিত্য রচনার ফলে এক বিরাট শূন্যতার কিছুটা পূরণ হয়েছে। আমাদের মুসলিম বিশ্বের প্রতি কোনায় এই বিরাট সাহিত্যভাণ্ডারকে পৌঁছাতে হবে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় এই সাহিত্যের অনুবাদ করতে হবে, যাতে এক ভাষায় সাহিত্যের যে অভাব রয়েছে অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্য অনুবাদ করে তা পূরণ করা যায়।

বর্তমানে যে ইসলামী সাহিত্য রয়েছে তা যদিও যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ের, তথাপি অনেক ক্ষেত্রে আরো প্রচুর সাহিত্য রচিত হওয়া দরকার। তামাদ্দুনিক আন্দোলনের এটাও একটি দিক। ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংগঠনসমূহ অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত রয়েছেন। ইতোমধ্যেই মুসলিম বিশ্বে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি রিসার্চ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এদের তৈরি এসব সাহিত্যকেও দ্রুত অনুবাদ করে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোনায় পৌঁছিয়ে দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে।

সাধারণ জনগণকে অবশ্য এ সাহিত্য দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যাবে না। এ জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে জুমাআর খুতবা ও ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে হবে। অবশ্য জুমাআর খুতবাকে আরো সময়োপযোগী করার জন্য দেশবরেণ্য আলেমদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের কমিটি গঠন করে নতুনভাবে খুতবার বই প্রণয়ন করার দরকার হবে। এ সব কাজই হবে তামাদ্দুনিক আন্দোলনের মূল কর্মসূচি।

ইসলামী দাওয়াতের তামাদ্দুনিক পদ্ধতিকে সফল করতে হলে ইসলামী সংগঠনসমূহকে এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের উচিত তামাদ্দনিক কাজকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া। অবশ্য তামাদ্দুনিক কাজে আত্মনিয়োগ করার সঙ্গে এ সব প্রতিষ্ঠানে সামাজিক খেদমত, কর্মীদের চরিত্র গঠন ও সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। কেননা চরিত্র গঠন ও সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া তামাদ্দুনিক কাজ এগিয়ে নেওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ্ গঠন

মুসলিম উম্মাহ্র অবস্থা আজ খুব ভাল নয়। তা সকলেই জানেন। এখন পর্যন্ত আদর্শিক দিক দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে উম্মাহ্র অবস্থান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে। এখানে বিদআত প্রচলিত আছে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় শিরক প্রবেশ করেছে।

আমি যুক্তরাজ্যের সঠিক অবস্থা বলতে পারব না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ্ গভীর অজ্ঞতা, অনেক বিদআত এবং শিরকে ডুবে আছে। বস্তুগতভাবে বললে অধিকাংশ স্থানই অশিক্ষা, দরিদ্রতা, ভয়াবহ দারিদ্র্য এবং উন্নয়নে অনেক পিছনে রয়েছে। কিছু দেশ ছাড়া আমাদের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতি খুব খারাপ, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও দুর্বল।

আমাদের আদর্শিক অবস্থা, আমাদের বস্তুগত অবস্থা যখন এই—তখন একটি শক্তিশালী উম্মাহ্ গঠন করতে আমাদের কি করা উচিত? প্রসঙ্গত আমি উল্লেখ করতে চাই যে, আমি আলোচনার শেষে আপনাদের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আন্তরিকভাবে প্রস্তুত আছি। আমি বলব না যে আমার সব উত্তর জানা। কিন্তু আমি যা জানি তা আপনাদের জানাবো এবং বাকি আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী।

একটি শক্তিশালী উম্মাহ্ গড়ে তুলতে অবশ্যই আমাদেরকে, আমাদের শিক্ষাকে গড়তে হবে, অর্থনীতিকে গড়তে হবে। আমাদের প্রতিরক্ষাকে গড়তে হবে। আদর্শিক বিষয় দেখার পূর্বে এগুলো হলো অগ্রাধিকার ক্ষেত্র। আমি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত দিক উল্লেখ করছি এবং আমাকে তা করতে হবে। আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সবাই অবগত। সব দেশেই নয়, অধিকাংশ দেশেই ইসলামিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ হচ্ছে না। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি, আমার স্কুল থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত আমাকে কুরআনের বিশটি আয়াতও শিখানো হয়নি। আমি দশটি আয়াতও শিখিনি। আমি শিখিনি নবী (স)-এর জীবনী তিনি আমাদের আদর্শ। তাহলে কি এ শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা আমাদের চাহিদা পূরণ করছে?

এটা পূরণ করছে না। স্বাধীন মুসলিম দেশসমূহের শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা গড়াই লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি জানি, এটা সময়ের ব্যাপার এবং

www.pathagar.com

এখানে আল্লাহ্‌র বিধান এবং অন্যান্য অনেক বিষয় জড়িত। তাই সময় প্রয়োজন। কিন্তু উদ্দেশ্য পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, আমাদের এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা অর্জন করতে হবে যেটা আমাদের সকল বস্তুগত চাহিদা পূরণ করবে, সভ্য-সুন্দর মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার সকল চাহিদা পূরণ করবে। একই সাথে এটা আমাদের ইসলামিক প্রয়োজন মিটাবে। শিক্ষা অবশ্যই সেটা করবে যদিও বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই এই লাইনে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু উম্মাহ্‌র কাছে উদ্দেশ্য পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বৈষয়িক অগ্রসরতার জন্য, আমাদের দীন-ধর্মের অগ্রসরতার জন্য, আদর্শিক উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষা। যদি চলমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন পূরণ না করতে পারে তখন আমাদের দায়িত্ব হবে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন করা এবং ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানা।

ব্যক্তিগত পড়াশুনা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আমাদের অনেক কিছু করার আছে। এর জন্য সকল মুসলিম সরকার, সকল মুসলিম রাজনীতিবিদ-বুদ্ধিজীবিদের অবশ্যই কাজ করতে হবে। সকল মুসলিম অর্থনীতিবিদদের শক্তিশালী মুসলিম অর্থব্যবস্থার জন্য কাজ করতে হবে। আমাদেরকে, আমাদের প্রতিরক্ষাকেও গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের সীমান্ত পাহারা দিতে বলেছেন। সূরা আলে ইমরানের শেষ আয়াতে আল্লাহ্ আমাদেরকে আমাদের সীমান্ত পাহারা দিতে বলেছেন। আল্লাহ্ আদেশ দিচ্ছেন, আমাদেরকে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা উচিত। মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হতে পারি না। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ভাল। কিন্তু এটা শুধু মুসলিমদের জন্যই নয়, সবার জন্য হতে হবে। নিরস্ত্রীকরণ সবার জন্য। আমরা আমাদেরকে নিরস্ত্র হতে বলতে পারি না—অন্যরা যেখানে সশস্ত্র থাকবে। এটা নিরস্ত্রীকরণ নয়, এটা ঠিক নয়।

যোগ্য উম্মাহ্ গড়ার কথা বলছিলাম। বস্তুগত বিভিন্ন দিকের কথা যার কিছু উল্লেখ করেছি। সত্যিকার অর্থে আমাদের এই হিসাব নিতে হবে যে, উম্মাহ্ নিজেই আক্রমণের শিকার, হুমকির সম্মুখীন। আজ আমরা জানি যে অনেক পণ্ডিত সভ্যতার দ্বন্দ্ব (Clash of Civilization) সম্বন্ধে কথা বলছেন। আমেরিকার একজন প্রধান পণ্ডিত হানটিংটন সভ্যতার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কথা বলেছেন এবং তিনি বলেছেন, "পশ্চিমাদের কাছে ইসলামই পরবর্তী হুমকি। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে এর বিরুদ্ধে যে কোন হুমকির অবসান

www.pathagar.com

ঘটাতে হবে।" যেন এটাই সভ্যতার সর্বোচ্চ সীমা, যেন এটাই শেষ কথা। আমরা পশ্চিমা সভ্যতাকে শেষ হিসাবে গ্রহণ করি না। শুধু হানটিংটনই নন, ফুকুআমা তার বই The End of History (ইতিহাসের সমাপ্তি)-তে বলেছেন যে, ইতিহাস তার শেষ গন্তব্যে পৌঁছেছে। তিনি বোঝাচ্ছেন, সত্যিকার অর্থে সেক্যুলার গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ হলো শেষ দৃষ্টিভঙ্গি, যেটা মানব সভ্যতা অর্জন করেছে। তাই কোন নতুন কিছু আসবে না, কোন ভাল কিছু আসবে না। এটাই ইতিহাসের সমাপ্তি। কিন্তু আমরা সেক্যুলারিজমকে শেষ অধ্যায় হিসাবে ধরে নিতে পারি না।

মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তারা আল্লাহ্‌র বিধানকে ভুলে গেছে। এবং এটাই সমস্ত অনৈতিকতার মূল কারণ। আপনি পৃথিবীতে যা দেখেন তাতে অধিকাংশ যুদ্ধ জাতিগতভাবেই হচ্ছে। আমি একমত পোষণ করি যে, ধর্মের ভিত্তিতেও যুদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে, আমরা যদি তা পছন্দ করি তবে ধর্মের ভিত্তিতে সংঘাত বন্ধ করতে পারি। সেক্যুলারিজমের কাছে আমরা নৈতিকতাকে ছেড়ে দিতে পারি না, আত্মসমর্পণ করতে পারি না, যা আল্লাহ্‌র বিধানকে ভুলিয়ে দেয়।

পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব ও পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ

মুসলিম জাতির কাছে পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জ হলো রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সবচেয়ে বেশি এবং মৌলিক হলো বুদ্ধিবৃত্তিক। আমি মুসলিম জাতির রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে বেশি বলা প্রয়োজন মনে করি না। পশ্চিমারা কি চায়? পশ্চিমারা চায় মুসলিম দেশসমূহ তাদের (পশ্চিমাদের) নির্দেশগুলো মেনে চলুক। এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

যখন একটি মুসলিম দেশ আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করতে যায় তখন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ শক্তির প্রেসিডেন্টের টেলিফোনে নির্দেশ পায় যে, "তুমি এটা করতে পার না।" মুসলিম দেশসমূহের ব্যাপারে অনেক বেশি নাক গলানো হয়। তারা আমাদেরকে তাদের নির্দেশমূহ মানাতে চায়। যদিও আমরা তাদের আদেশ মেনে নেই—তারা কখনো মুসলমানদের ভালর জন্য এবং ইসলামের ভালর জন্য কোন নির্দেশ দেবেন। আমি বলি না অন্যের ভাল বিষয়গুলো শুনব না। আমাদের অন্যের ভাল জিনিসকে শোনা উচিত। কিন্তু আমরা পশ্চিমাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে মেনে নিতে পারি না। তারা আমাদেরকে তাদের সাংস্কৃতির কাছে নত হতে বলে—যেটা সবচেয়ে অশোভন, অশ্লীলতাপূর্ণ ও মানবদেহ প্রদর্শনে ভর্তি। নারীদেরকে নোংরাভাবে

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয় এবং পুরুষদের লালসার বস্তুতে পরিণত করা হয়। আমি জানি না মানব ইতিহাসে এরকম বাজে সামাজিক ব্যবস্থা ছিল কিনা? তাদের বিবাহ কম বেশি তিক্তকর, তাদের পিতামাতা অবহেলিত আর না আছে শিশুদের নিরাপত্তা। সত্যিকার অর্থে পিতামাতার নিরাপত্তাও নেই। বৃদ্ধ বয়সে তাদের প্রচুর সমস্যা হয়। তাদের ছেলেমেয়েরা পিতামাতা দু'জনের যত্ন পায় না। সম্ভবত তারা অধিকাংশই একজনের অর্থাৎ মাতার যত্ন পায়। অথচ আল্লাহ্‌র নিয়ম হচ্ছে শিশুদের পিতামাতার যত্ন পাওয়া উচিত। তারা কোন কারণ ছাড়াই অথবা অর্থহীন কারণেই তাদের পরিবার ধ্বংস করে দেয়। বিবাহ ঐতিহাসিকভাবেই সুন্দর ব্যবস্থা। এটা কারোর জন্য ক্ষতিকর নয়, পরিবার কারোর জন্য ক্ষতিকর নয়। তারা এমন এক অবস্থায় এসেছে সেখানে সত্যিই পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। তারা আমাদেরকে অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলতায় পরিচালিত করছে।

অর্থনীতির দিকে আসা যাক। তাদের সত্যিকার লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ। তারা আমাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর, চতুর্থ শ্রেণীর দেখতে চায়। তারা আমাদেরকে তাদের বাজার বানাতে চায়। তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধান পশ্চিমা শক্তির আনুকূল্যে পরিচালিত। আমি তাদেরকে ভালভাবে জানি। তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমার ভালভাবে জানা আছে। তারা বেশিরভাগই পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে এবং সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে কাজ করে না। কিন্তু আমি অবশ্যই বলব, আসল হুমকি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক। অন্যান্য চ্যালেঞ্জও সেখানে আছে; কিন্তু মূল এবং গূঢ় মৌলিক চ্যালেঞ্জ যেটা পশ্চিমাদের থেকে আসছে সেটা সত্যিকার অর্থেই বুদ্ধিবৃত্তিক। তারা অভিযুক্ত করছে এবং আমাদের বলছে যে, ইসলামিক রাষ্ট্রের ধারণা সম্ভবপর নয়। ইসলামিক রাষ্ট্র হওয়া ভাল নয়। তারা বলছে যে, ইসলাম মানবাধিকার দেয় না। তারা বলছে যে, ইসলাম নারীর অধিকার দেয় না। আমি অবশ্যই দুঃখের সাথে বলব, কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু মুসলমানদের কর্মকাণ্ডে এটা প্রকাশ পায় যে, ইসলাম যেন মানুষের অধিকার এবং নারীর অধিকার দেয় না। কোন কোন দেশের কোথাও কোথাও এর কিছু প্রকাশ আছে, যা এই ধারণার জন্ম দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের তা করা উচিত নয়। আমাদের ইসলামের সুনাম ক্ষুণ্ন করা উচিত নয়।

মানবাধিকার এবং নারীর অধিকার ইসলামে খুবই গ্রহণযোগ্য। এর সমর্থনে আমি তিনটি মূল প্রমাণ উল্লেখ করব। ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের

www.pathagar.com

সংবিধান উলেমা দ্বারা প্রণীত। ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের সংবিধান যদিও উলামা দ্বারা তৈরি নয় তথাপি সকল দলের উলামা দ্বারা গ্রহণীয়। এই দুই প্রমাণ এবং ইসলামের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখাগুলো যেমন, মোহাম্মদ আসাদ, আবুল আলা মওদূদী, হাসান তুরাবি এবং এরকম অনেকে এবং বাংলাদেশের একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ মরহুম আব্দুর রহীম, তাঁদের লেখাগুলো। তাই আমি বলতে পারি, এসব দলিল যেগুলো উলামাদের দ্বারা প্রণীত অথবা তাদের দ্বারা সমর্থিত—পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, ইসলাম মানবাধিকার দিয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ওপর একটি অধ্যায় আছে। ইরানের সংবিধানেও জনগণের স্বাধীনতার ওপর অধ্যায় আছে।

তুলনামূলক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে আমি আমার ছাত্রদের ইরান এবং পাকিস্তানের সংবিধান পড়িয়েছি। আমি আমার ছাত্রদের বাংলাদেশের সংবিধান পড়িয়েছি। আমেরিকার সংবিধান পড়িয়েছি। তাই আমি বলতে পারি যে, মুসলিম রাজনৈতিক বিজ্ঞানীদের লেখা (রাজনীতিকদের নয়), গুরুত্বপূর্ণ আলেমদের লেখা এবং উপরোল্লিখিত দুই সংবিধান প্রমাণ করে এবং পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নারীর অধিকারের প্রতি মর্যাদাশীল। সেই জন্য আমাদেরকে একজন দু'জনের কথা শোনা উচিত নয়। আমরা ঐকমত্য হারাতে পারি না। কিছু উচ্চবাচ্যের ভিত্তিতে আমরা ঐকমত্য অবহেলা করতে পারি না। (এ ব্যাপারে মানবাধিকার সম্পর্কে OIC Declaration যেটা OIC ফিক্‌হ একাডেমী কর্তৃক অনুমোদিত তা দেখা যেতে পারে।)

[১৯৯৮ সনের ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের শেফিল্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা হতে]

www.pathagar.com

দ্যা মেসেজ অব দ্যা কুরআন
এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীর

মুহাম্মদ আসাদ যিনি 'দ্যা মেসেজ অব দ্যা কুরআন' তাফসীরটি লিখেছেন, তাঁর লেখার সঙ্গে আমি ১৯৬১ সালের দিকে পরিচিত হই। সে সময় আমি লাহোরে ফাইন্যান্স সার্ভিস একাডেমীতে ট্রেনিংরত ছিলাম। সে একাডেমীর লাইব্রেরিতে মুহাম্মদ আসাদের বইগুলো ছিল। আমি তাঁর The Principle of State and Government in Islam' (ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার) বইটি পড়ি। এটি আধুনিককালে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর রচিত প্রধান কয়েকটি বইয়ের একটি। এরপর আমি তাঁর 'Islam at the Crossroads' (সংঘাতের মুখে ইসলাম) বইটি পড়ি। এতে তিনি আধুনিক যুগে ইসলাম যে সকল সমস্যার সম্মুখীন সেগুলো এবং তার সমাধান কি সে সব বিষয় তুলে ধরেছেন। এ সময়েরই তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Road to Mecca (মক্কার পথ) আমি পড়ি। এ বইয়ে তাঁর জীবনী, তাঁর অভিজ্ঞতা এবং ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন মতামত বর্ণিত হয়েছে। The Message of the Quran (কুরআনের মর্মবাণী) আমি আরো আগে পড়ি। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে এবং আমি এর কপি ১৯৬৬ অথবা '৬৭ সনে পাই। আমি এর অনুবাদে মুগ্ধ হই। আমার মনে আছে যে ইসলামী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ প্রফেসর খুরশীদ আহমদ আমাকে কোন এক সময় বলেছিলেন যে আসাদের অনুবাদ হচ্ছে ইংরেজিতে শ্রেষ্ঠ অনুবাদ।

মুহাম্মদ আসাদের এ তাফসীরের অনুবাদে literal বা শাব্দিক অর্থ না করে বরং মর্মবাণী তুলে ধরা হয়েছে। এরকমটি মাওলানা মওদূদীও তাঁর তাফহীমুল কুরআনে করেছেন। তিনিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে শাব্দিক অনুবাদ না করে অনুবাদে মূলভাব তুলে ধরেছেন। মুহাম্মদ আসাদ অবশ্য তাঁর তাফসীরের নোটে (যেখানে তিনি শাব্দিক অনুবাদ করেননি সে ক্ষেত্রে) শাব্দিক অনুবাদও দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যারা শাব্দিক অনুবাদ চান তারা এ তাফসীরে শাব্দিক অনুবাদ পেয়ে যাবেন। আসাদ এমন এক মহানব্যক্তি ছিলেন যে নিজের মাতৃভাষা না হওয়া সত্ত্বেও দুটি বিদেশী ভাষাকে পুরাপুরি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ইংরেজি ও আরবী। আসাদের আরবী ও ইংরেজি আরব ও ইংরেজদের থেকেও উন্নত। এটি একটি অসাধারণ বিস্ময়।

www.pathagar.com

আসাদ তাঁর তাফসীরে সংক্ষেপে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নোট সংযোজন করেছেন। এসব নোটে তিনি যে কেবল তাঁর নিজের উপলব্ধি তুলে ধরেছেন তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই (বিশেষ করে বিতর্কমূলক বিষয়সমূহে) পূর্ববর্তী আলেমদের মতামতও তুলে ধরেছেন। তিনি ইসলামের মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী ধারার প্রতিনিধি, অবশ্য তিনি কোথাও আমার জানামতে ইসলামের মূল spirit বা ভাব থেকে সরে যাননি বা অকারণে অন্য সভ্যতার নিকট নতজানু হননি (যদিও কেউ কেউ এরকম মনে করে থাকেন)। তাঁর তাফসীরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি gender bias (লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব) মুক্ত। এটি তাঁর সাফল্য। অনেক তাফসীরে এটি দেখা যায় না।

উদাহরণ ঃ সূরা নিসার প্রথম আয়াতের অনুবাদ ও তার নোট দ্রষ্টব্য। তিনি আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এভাবে ঃ

"O mankind! Be conscious of your Sustainer, Who has ereated you out of one living entity, and out of it created its mate, and out of the two spread abroad a multitude of men and women."

সূরা নিসার এক নং নোট দিচ্ছেন এভাবে ঃ

"Out of the many meanings attributable to the term nafssoul, spirit, mind, animate being, living entity, human being, person, self (in the sense of a personal identity), human kind, life essence, vital principle and so forth-most of the classical commentators choose 'human being' and assume that it refers here to Adam. Muhammad Abduh, however, rejects this inerpretation (Manar, IV) and gives instead preference to humankind isasmuch as this term stresses the common origin and brotherhood of the human race (which, undoubtedly, is the purport of the above verse), without, at the same time, unwarrantably tying it to the Biblical account of the creation of Adam and Eve. My rendering of nafs, in this context, as 'living entity' follows the same reasoning. As regards the expression Zawjaha (is mate), it is to be noted that, with reference to animate beings the term Zawj, ('a pair', 'one of a pair' or 'a mate') applies to the male as well as to the female component of a pair of couple; hence, with reference to human beings, it signifies a woman's mate (husband) as well as man's mate (wife). Abu Muslim as quoted by Razi interprets to phrase "He createrd out of it (minha) its mate" as meaning "He created its

www.pathagar.com

mate (i.e. its sexual counterpart) out of its own kind (min jinsiha)" thus supporting the view of Muhammad abduh referred to above. The literal translation of minha as 'out of it' clearly alludes, in conformity with the text, to biological fact that both sexes have originated from the 'one living entity.'

অনুবাদ ঃ 'নফ্স্'-এর যে সব বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আত্মা, মন, জীবিত প্রাণ, জীবন্ত সত্তা, মানুষ, ব্যক্তি, নিজ (ব্যক্তিগত পরিচয় হিসাবে) মানবজাতি, জীবনের মূল, মূলনীতি ইত্যাদি এবং এ সবের মধ্যে প্রাচীন তাফসীরকারগণ 'মানুষ' অর্থটি গ্রহণ করেছেন এবং ধরে নিয়েছেন যে এটা হচ্ছে আদম; কিন্তু মুহাম্মদ আবদুহু এ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন (মানার চতুর্থ খণ্ড) এবং এর পরিবর্তে 'মানব জাতি'কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা এ অর্থ দ্বারা মানবজাতির সাধারণ ভ্রাতৃত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা হচ্ছে এ আয়াতের বক্তব্যের লক্ষ্য। একই সঙ্গে তিনি অযৌক্তিকভাবে একে বাইবেলে বর্ণিত আদম ও হাওয়া সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিতও করেননি। আমার অনুবাদে আমি 'জীবিত সত্তা' (living entity) ব্যবহার করেছি, একই যুক্তির ভিত্তিতে। 'যাওজাহা' (তার সঙ্গী) সম্পর্কে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, জীবজন্তু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে 'যওজ' (জোড়া, জোড়ায় একজন বা একজন সঙ্গী) পুরুষ ও নারী দু'ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় অথবা পুরুষ-স্ত্রী বুঝায়। সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রে এটা বুঝায় একজন নারীর সঙ্গী (স্বামী) এবং একজন পুরুষের সঙ্গী (স্ত্রী)। রাজী উল্লেখ করেছেন, আবু মুসলিম 'তিনি সৃষ্টি করেছেন এ থেকে (মিনহা) তার সঙ্গী' এ বাক্যাংশের অর্থ করেছেন ঃ তিনি সৃষ্টি করেছেন তার সাথী (অর্থাৎ যৌন সঙ্গী) এর নিজ জাতি থেকে (মিন জিনসিহা), এভাবে উপরোল্লিখিত মুহাম্মদ আবদুহুর মতকে সমর্থন করে। 'মিনহা' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'এর থেকে' স্পষ্ট করে আয়াতের শব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, জীব বিজ্ঞানের এ সত্য যে দু'লিঙ্গই (পুরুষ ও নারী) একই 'জীবন্ত সত্তা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

মুহাম্মদ আসাদ তাঁর তাফসীরে অনেকগুলো বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কিন্তু কুরআনের আয়াতের অর্থের আওতাধীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দাসীদের বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীরূপে গ্রহণ এবং হুর সম্পর্কিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যায়।

সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতের প্রথমাংশের অনুবাদ তিনি এভাবে করেছেন ঃ

"And (forbidden to you are) all married women other than those whom you rightfully possess [through wedlock]"

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা নিসার ২৬ নং নোটে বলেন,

"According to almost all the authorities, *almuhsanat* denotes in the above context' 'married women'. As for the expression "ma malakat aymanukum (those whom your right hands possess, i.e. those whom you rightfully possess)", it is often taken to mean female slaves captured in a war in God's cause (see in this connection 8:67 and corresponding note). The commentators who choose this meaning hold that such slave girls can be taken in marriage irrespective of whether they have husbands in the country of origin or not. However, quite apart from the fundamental differences of opinion, even among the companion of the Prophet, regarding the legality of such a marriage, some of the outstanding commentators hold the view that "ma malakat aimanukum" denotes here "women whom you rightfully possess through wedlock", thus Razi in his commentary on the verse, and Tabari in one of the alternative explanations (going back to Abdullah Ibn Abbas, Mujahid and others). Razi, in particular, points out that the reference to 'all' married women (al-muhsanat min annisa) coming as it does after enumeration of prohibited degrees of relationship, is meant to stress the prohibition of sexual relations with any woman other than one's lawful wife.

অনুবাদ ঃ প্রায় সকল তাফসীরকারের মতে উপরের প্রেক্ষিতে 'আল মুহসানাত'-এর অর্থ 'বিবাহিতা নারী' যাদের তোমরা আইনসম্মতভাবে "মা মালাকাত আইমানুকুম" (তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক অর্থাৎ যাদের তোমরা আইনসম্মতভাবে মালিক) দ্বারা প্রায়ই জিহাদে ধৃত নারী দাসীদের বুঝানো হয় (৮ ঃ ৬৭ আয়াতের নোটটি দেখুন)। যে সব তাফসীরকারক এ অর্থ নিয়েছেন তাঁরা মনে করেন যে এমন নারীকে বিবাহ করা যায়, তাদের মূল দেশে তাদের স্বামী থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু এর বৈধতার বিষয়ে নবী (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে এবং পরবর্তীতে সাহাবী অন্যদের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ ছাড়াও বেশ কিছু উচ্চ পর্যায়ের তাফসীরকার মনে করেন "মা মালাকাত আইমানুকুম"-এর অর্থ এখানে "যাদেরকে তোমরা বিবাহের মাধ্যমে আইনসম্মতভাবে অধিকারী হয়েছ"—এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। রাজী এ আয়াতের এবং তাবারী তার এক ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন (আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং অন্যদের উল্লেখ করে)। রাজী বিশেষ করে উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছেন যে এখানে 'বিবাহিত নারী'র (আল মুহসানাত মিনান্ নিসা) উল্লেখ (যেহেতু তা নিষিদ্ধ নারীর উল্লেখের পর এসেছে) জোর দেওয়ার জন্য যে, একজনের বৈধ স্ত্রী ছাড়া আর কারো সঙ্গে যৌন সহবাস নিষিদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে আসাদের সূরা মুমীনুনের তাফসীরের ৩নং নোটও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তেমনিভাবে 'হুর' সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি সূরা ওয়াকিয়ার ৮ নং নোটে লিখেছেন ঃ

"The noun hur rendered by me as 'companions pure'-is a plural of both ahwar (masc.) and hawra (fama.), either of which describes "a person distinguished by hawar" which latter term primarily denotes "in dense whiteness of the eyeball and lustrous black of the iris" (Qamus). In a more general sense, hawar signifies simply 'whiteness' (Asas) or, as a moral qualification 'purity' (cf. Tabari, Razi and Ibn Kathir in their explanations of the term hawariyyun in 3 : 52). Hence the compound expression *hur in signifies,* approximately, "pure beings (or, more specifically "companions" pure), most beautiful of eye" (which latter is the meaning of 'in', the plural of Ayan).

"As regards the term *hur* in its more current feminine connotation, quite a number of earliest Quran commentators, among them Al-Hasan al Basri-understood it signifying no more or no less than "the righteous among the women of the human kind (Tabari)-{even} those toothless women of yours whom God will resurrect as new beings" (Al-Hsan as quoted by Razi in his comments on 44 : 54)"

অনুবাদ ঃ বিশেষ্য 'হুর' শব্দটির আমি অনুবাদ করেছি 'জীবন সঙ্গী'। এ শব্দটি পুংলিঙ্গ 'আহওয়ার' এবং স্ত্রী লিঙ্গ 'হাওরা' শব্দের বহুবচন। আহওয়ার এবং হাওরা দ্বারা এমন এক ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি 'হাওয়ার' দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

'হাওয়ার' দ্বারা প্রধানত বুঝায় 'চোখের গভীরভাবে সাদা হওয়া এবং চোখের মণির উজ্জ্বল কালো হওয়া (কামুস)'। সাধারণ অর্থে 'হাওয়ার' দ্বারা বুঝায় শুধু সাদা হওয়া (আসাস) অথবা একটি নৈতিক গুণ হিসাবে 'পবিত্রতা' (তাবারী, রাজী এবং ইবনে কাসিরে ৩ঃ৫২ আয়াতের 'হাওয়ারিউন' শব্দের ওপর আলোচনা)। সুতরাং যুগ্মশব্দ 'হুর ইন' দ্বারা মোটামুটিভাবে বুঝায় 'পবিত্র

www.pathagar.com

ব্যক্তিগণ (বা আরো স্পষ্টভাবে পবিত্র সঙ্গী), যাদের চোখ খুব সুন্দর (এটি হচ্ছে 'ইন' শব্দের অর্থ, এ শব্দটি 'আয়ান' শব্দের বহুবচন)'।

সাধারণভাবে হুর দ্বারা সাধারণত নারী বুঝানো হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, পূর্বের যুগের বেশ কয়েকজন তাফসীরকার, যাদের মধ্যে হাসান আল বসরীও রয়েছেন, এর অর্থ করেছেন 'মানবজাতির মধ্যে সৎকর্মশীল নারীরা' (তাবারী)। এমনকি বিগত ঐসব দাঁতহীন মেয়েরাও 'নতুন মানুষ' হিসবে পুনরুত্থিত হবেন (আল হাসানকে এভাবেই রাজী উল্লেখ করেছেন তার তাফসীরে ৪৪ঃ৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যায়)।

মুহাম্মদ আসাদের পুরো তাফসীরটিই একটি অনন্য সাধারণ সৃষ্টি। কুরআনের তাফসীরে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সব সময়ই ছিল ও থাকবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মতবিরোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক। বড় চিন্তাবিদদের ক্ষেত্রে এটা সবসময়ই হয়েছে।

মুহাম্মদ আসাদ তাঁর তাফসীরের শেষে চারটি সংযোজনী যোগ করেছেন। এসব সংযোজনীর বিষয় হচ্ছে 'কুরআনের রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার', 'আল মুকাত্তায়াত', 'জ্বীন' এবং 'মিরাজ' সম্পর্কে। এসব কয়টিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী।

যারাই তাফসীর সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে চান তাঁদের অবশ্যই মুহাম্মদ আসাদের তাফসীর পড়া উচিত, যেমন পড়া উচিত এ যুগের এবং পূর্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তাফসীরসমূহ।

www.pathagar.com

হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা দূর করার উপায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহের নির্দেশ অনুসারে কাজ করাই হচ্ছে হাদীসের মূলকথা। তবে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের দরুন কোন কোন হাদীসের নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে না পারার ব্যাপার আলাদা। আসল কথা হচ্ছে কোন কোন হাদীস যদিও বা পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয় মূলত সেগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আমরা হয়তো বা এমন দু'টি হাদীসের সন্ধান পেতে পারি যাতে রাসূলের (স) কার্যাবলি বর্ণিত রয়েছে। একজন সাহাবী একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, রাসূল (স) অমুক কাজটি করতেন, আরেক জন সাহাবী অন্য হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন রাসূল (স) অন্যকিছু করতেন। এক্ষেত্রে হাদীস দু'টিকে পরস্পর বিরোধী বলা যাবে না এবং ধরে নিতে হবে যে, এ দু'টি কাজই অনুমোদনযোগ্য, যদি সেগুলো ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত না হয়। যদি কাজ দুটির একটি ইবাদত বলে মনে হয় এবং অন্যটি তা নয় সে ক্ষেত্রে প্রথমটি মুস্তাহাব ও অপরটি শুধুমাত্র জায়েযগণ্য হবে। এমন যদি হয় যে, দুটি কাজই ইবাদত জাতীয় তবে দু'টি নির্দেশের গুরুত্ব অনুযায়ী ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হিসাবে গণ্য হবে এবং এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অনুসরণ করা যাবে।

হাদীসের হাফেজগণও তাদের হাদীস সংকলনে উপরিউক্ত নীতি সমর্থন করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে বিতরের নামায ১১ রাকাত, ৯ রাকাত, ৭ রাকাত, ৩ রাকাত বা এক রাকাত। তাহাজ্জুদ নামাযের কিরআত উচ্চৈঃস্বরে পড়বে কি নিম্ন স্বরে পড়বে সে ব্যাপারেও একই কথা। রাফে ইয়াদাইন; অর্থাৎ নামাযে হাত কান পর্যন্ত উঠাবে কি কাধ পর্যন্ত সে ব্যাপারেও একইভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। হযরত উমর (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহ্হুদের পার্থক্যও উপরিউক্ত নিয়মে মীমাংসা করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে সকাল, বিকাল বা অন্যান্য সময়ের নানা রকম দোয়ার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

দু'টি হাদীসের মধ্যে কোন অজ্ঞাত কারণেও বাহ্যত বিরোধ থাকতে পারে। যে কারণে একটি কাজ এক সময়ে ওয়াজিব, অন্য সময়ে মুস্তাহাব অথবা কোন কাজ এক সময়ে ওয়াজিব হলেও অন্য সময়ে ভিন্নতর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তা

www.pathagar.com

না করারও অনুমতি আছে। এ ক্ষেত্রে বাহ্যিক বিরোধ বা সংশয় দূরীকরণার্থে গোপন কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

এমনও হতে পারে যে, কোন একটি হাদীসে বর্ণিত কার্য সেই সব কার্যাবলিরই একটি, যা বিশেষভাবে শুধুমাত্র রাসূলেরই (স) করার অধিকার ছিল। এক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানেরা অন্য হাদীসটি অনুসরণ করবে। তাবীল বা ব্যাখ্যার মাধ্যমেও দু'টি হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা যায়। রাসূল (স)-এর কোন ফকীহ সহচরের দেওয়া অতি অস্বাভাবিক ব্যাখ্যাও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কুরআন ও রাসূল (স) প্রদত্ত বিশদ, স্পষ্ট ও সরাসরি নির্দেশাবলির ব্যাপারে কোন কল্পিত ব্যাখাই গ্রহণযোগ্য নয়।

দু'টি হাদীসে বর্ণিত দু'টি ঘটনাই যদি প্রশ্নের জবাব হয় অথবা বিশেষ ব্যাপারে রাসূল (স)-এর সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে এবং দু'টিতে ভিন্নতর কারণ ও অবস্থা বিদ্যমান থাকে তবে ঐসব ঘটনা বিবেচনা করেই সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি হাদীসই ঐ হাদীসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যদি এমন হয় যে, উপরিউক্ত উপায়েও দু'টি হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয় তবে সেগুলোকে পরস্পর বিরোধী বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যদি একটি হাদীসের ওপর অন্যটির অগ্রগণ্যতা নির্ণয় করা যায়, তাহলে যেটি অগ্রগণ্য সেটিকেই অনুসরণ করতে হবে। আর যদি তা নির্ণয় করা সম্ভব না হয় তবে দু'টিকেই বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। তবে বাস্তবে কোন হাদীসই বাতিল করার আদৌ প্রয়োজন হয় না।

একটি হাদীসের ওপর অন্যটির প্রাধান্য বা অগ্রগণ্যতা নির্ণয়ের জন্য লিম্নলিখিত নীতিসমূহ অনুসরণীয় ঃ

ক. বর্ণনাকারীদের (রাবী) মর্যাদানুযায়ী (সনদ) ঃ এখানে অগ্রগণ্যতা নির্ণয়ের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বা ফকীহ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অন্যটির চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অনুরূপভাবে যে হাদীস মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত বা যে হাদীস মরফু পর্যায়ের তা অন্যটির ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। একইভাবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত বা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এমন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের চেয়ে অগ্রগণ্য।

www.pathagar.com

খ. হাদীসের মূল বচন ঃ যে হাদীসে বিশদ বিবরণ আছে এবং তা অন্যান্য হাদীসেও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ঐ হাদীস সেই হাদীসের ওপর অগ্রগণ্যতার দাবিদার, যে হাদীসে সেসব বিবরণ অনুপস্থিত। অর্থাৎ একাধিক সাহাবী কর্তৃক একই কথায় বর্ণিত হাদীস ভিন্ন ভিন্ন কথায় বর্ণিত হাদীসের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য।

গ. বিষয়বস্তু ও যুক্তি ঃ যে হাদীসে বর্ণিত নির্দেশাবলি শরীয়তের নির্দেশাবলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বা এর যুক্তিসমূহ জোরালো সেটি অন্য হাদীসটির তুলনায় অগ্রগণ্য ও গ্রহণযোগ্য (শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থের ৯০ নং অধ্যায় অবলম্বনে)।

www.pathagar.com

যাকাত আদায়ের বিধান

যাকাত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। ইহা ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত।

যাকাতের ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে যাকাতের বিধি বিধান, যাকাত কিসের ওপর ধার্য হয়, কত পরিমাণের ওপর ধার্য হয়, কি হারে যাকাত দিতে হয়, এসবের বিস্তারিত জ্ঞান জনগণকে দিতে হবে। এসব সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান বর্তমানে জনগণের নেই। ফিক্‌হর প্রাচীন পুস্তকসমূহে এ সম্পর্কে যেসব বিধান রয়েছে জনগণকে সে সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত করা হয়নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যাকাত সংক্রান্ত সব বিষয়ের সঠিক জ্ঞান জনগণকে দিতে হবে। তবেই সালাত আদায় করা যেমন জনগণের জন্য সহজসাধ্য, যাকাত আদায়ও তেমনি সহজসাধ্য হবে।

কিসে যাকাত ধার্য হয়

নগদ টাকা, ব্যাংকে রাখা টাকা, স্বর্ণ-রৌপ্য, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু, ক্ষেতের ফসল, ব্যবসায়ী পণ্য, কারখানার কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য, ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি পশু ও খনিজ সম্পদের ওপর যাকাত ফরয। এসব ছাড়াও মুসলিম মালিকানাধীন জমির ফসলের ওপর ওশর ফরয। হানাফী ফকীহদের মতেও জমি যদি খারাজী প্রমাণ পাওয়া না যায় তবে তা ওশরী বলে গণ্য হয়ে থাকে এবং তার ওপর ওশর প্রদান করতে হবে (ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়)।

আর একথা সর্বজনবিদিত যে, বাংলাদেশে যে ভূমিকর ধার্য করা হয় তা খারাজী নয়। বাংলাদেশের জমিও ওশরী ভূমি। (দ্রষ্টব্য ঃ ওশরের শরীয়তি বিধান— সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার।)

বিভিন্ন দেশে যাকাত আইনে বৎসরের শেষের দিনের শিল্প কারখানার কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের স্টকের ওপর যাকাত ফরয গণ্য করা হয়েছে। কাঁচামালের ওপর যাকাতের যুক্তি হচ্ছে স্টকে থাকা কাঁচামাল ব্যবসায়ী স্টকের বা শিল্প উৎপাদনের মতই। অবশ্য কারখানার যন্ত্রপাতির ওপর কোন যাকাত নাই।

www.pathagar.com

নিসাবের পরিমাণ

নিসাব বা কত পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হয়, এ সম্পর্কেও জনগণ পূর্ণভাবে অবহিত নয়। যাকাত বাস্তবায়নের জন্য এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে। রৌপ্য, নগদ অর্থ, ব্যবসায়ীপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিসাব সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য। বর্তমান বাজার দরে প্রায় দশ হাজার টাকা। এ পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরয। এসব ক্ষেত্রে বছর শেষে যে পরিমাণ সম্পদ থাকবে সেই সম্পূর্ণ সম্পদের ওপর যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণের ও স্বর্ণালংকারের ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব হচ্ছে সাড়ে সাত তোলা। যদি রৌপ্য, স্বর্ণ অলংকার ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর একত্রে থাকে তবে নিসাব হচ্ছে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য। ফসলের নিসাব হচ্ছে ৫ ওয়াসাক বা প্রায় ২৭ মন ফসল। তেমনিভাবে গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির নির্দিষ্ট নিসাব রয়েছে। খনিজ সম্পদের বেলায় অধিকাংশ dKxnর মতে কোন নিসাব নেই।

যাকাত দেওয়ার বছর কিভাবে গুণতে হবে?

কোন সম্পদেই বছরে একবারের বেশি যাকাত নেওয়া হয় না। সব ফিক্‌হবিদই এ ব্যাপারে একমত। ক্ষেতের ফসল, খনিজ সম্পদ, সমুদ্র থেকে পাওয়া সম্পদ ও মাছ এর ক্ষেত্রে সারা বছর এ সব সম্পদ হাতে থাকার শর্ত নেই।

ফসল হওয়া ও আহরণের পরপরই এসব ক্ষেত্রে যাকাত দিতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে যাকাত আদায় করার জন্য একটি পূর্ণ বছর ঠিক করে দিতে হয়। যেমন, ১লা রমযান হতে সাবানের শেষ দিন। এ ব্যাপারে ঈমাম মালিক ও শাফেয়ীর মত হচ্ছে যে, শুধু বছরের শেষের হিসাবটা ধরতে হবে। অর্থাৎ যাকাত দেওয়ার জন্য বছরের শেষ দিনে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তবে বছরের শুরুতে বা মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলেও যাকাত দিতে হবে। ঈমাম আবূ হানিফা ও তার সঙ্গীগণ, ঈমাম মুহাম্মদ ও ঈমাম আবূ ইউসুফ মত প্রকাশ করেছেন যে, নিসাব বছরের শুরু ও শেষে থাকলেই যাকাত দিতে হবে। বছরের মধ্যের অবস্থা গণ্য করা হবে না। এটাই অধিকাংশ ফিক্‌হবিদদের মত। এ ব্যাপারেও জনগণকে বিশেষভাবে অবহিত করা দরকার, যেন তারা সহজে যাকাত দিতে পারে। (দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামে যাকাতের বিধান, ৪০২-৪০৩ পৃ.)

কত পরিমাণ দিতে হবে?

অভাবগ্রস্তকে এমন পরিমাণ যাকাত দিতে হবে যাতে আর অভাব না থাকে। এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ ফকীহর মতে, যাকাতের গ্রহীতাকে এক বছরের প্রয়োজন

www.pathagar.com

পূর্ণ করে দিতে হবে। কেউ কেউ সমগ্র জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেওয়ার কথা বলেছেন। এর অর্থ যাকাত গ্রহীতাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ যাকাত দেওয়া, যার মাধ্যমে তার কর্মসংস্থান হয় এবং প্রতি বছরই তাকে যাকাতের জন্য হাত পাততে না হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর মতে, যখন দেবেই তখন স্বচ্ছল বানিয়ে দাও (ইসলামে যাকাতের বিধান, ইউসুফ আল কারদাবি পৃঃ ৩১-৩৭, ২য় খণ্ড)। উপরোল্লেখিত আদর্শ মোতাবেক যাকাত প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশে বিরাজমান সামাজিক পরিস্থিতিতে ধনী লোকেরা অভাবীদের অল্প পরিমাণ অর্থই প্রদান করে থাকে। তবে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির উচিত কমপক্ষে কিছু অভাবীকে অর্থ প্রদনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

প্রাপককে কি জানাতে হবে?

প্রাপককে দেওয়ার সময় যাকাত দেওয়া হচ্ছে, এটা বলা কি প্রয়োজন? অধিকাংশ ফকীহর মত হচ্ছে, তা বলার প্রয়োজন নাই। আলমুগনী'র লেখক ইবনে কুদামা বলেছেন, একজনকে ফকির মনে করে তাকে যাকাতের মাল বলে দেওয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না। মালিকি মাজহাবের কেউ কেউ বলেছেন, বলাটা মাকরূহ। কেননা তা বললে ফকিরের দিল ক্ষুণ্ন হয়। ইউসুফ আল কারদাবির নিজের মত হচ্ছে যে, উত্তম নীতি হলো যাকাত দাতা ফকিরকে জানাবেন না যে এটা যাকাতের মাল, কেননা ঐরূপ করা গ্রহীতার পক্ষে মানসিক কষ্টদায়ক হতে পারে (ইসলামে যাকাতের বিধান, ইউসুফ আল কারদাবি। (২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৪৩)

সামাজিক নিরাপত্তার প্রধান ব্যবস্থা

এ পর্যায়ে ইসলামের সবচেয়ে প্রধান ও মশহুর ব্যবস্থা হচ্ছে যাকাত, কোন সাধারণ কর বা শুল্ক নয়। সব কাজে যাকাতকে ব্যবহার করা যায় না। যাকাত হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি। যাকাতের মাধ্যমে সমাজকে দরিদ্র থেকে ইসলাম উদ্ধার করতে চায়। যাকাতের হকদার হচ্ছে তারা যারা কর্মক্ষমতাহীন এবং যারা কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উপার্জনহীন অথবা যথেষ্ট পরিমাণে উপার্জন করতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেছেন, যাকাত পাবে ফকির, মিসকিন, যাকাত কর্মচারী, যাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা দরকার, ক্রীতাদস, ঋণগ্রস্ত, নিঃস্ব পথিক। আল্লাহর পথে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজেও এ অর্থ খরচ করা হবে যাবে? (আল কুরআন ৯ ঃ ৬০)

www.pathagar.com

উসূলে ফিক্‌হ কুরআন ও সুন্নাহ্‌ ব্যাখ্যার মূলনীতি

উসূলে ফিক্‌হর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে ব্যাখ্যা করা। এর জন্য কুরআন ও সুন্নাহকে বোঝা প্রয়োজন, মানে তাদের Text (পাঠ)-এর অর্থ বোঝা দরকার। এর জন্য যে ব্যক্তিই কুরআন ও সুন্নহকে ব্যাখ্যা করতে চান, তা গভীরভাবেই হোক কিংবা সাধারণ মানেই হোক, আরবী ভাষায় জ্ঞান থাকতে হবে। এজন্য উসূলের পণ্ডিতরা শব্দের প্রকারভেদ ও তাদের অর্থ বা ব্যাখ্যা উসূলে ফিক্‌হ চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

যদি Text-এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা না থাকে (অর্থাৎ Text টি যদি সুস্পষ্ট হয়) তবে তার ব্যাখ্যার তেমন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আইন বা ফিক্‌হর অধিকাংশই ব্যাখার মাধ্যমে গৃহীত হয় বা হয়েছে। কারণ বেশির ভাগ Legal Text-ই self evident (সুস্পষ্ট) নয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, তাবিল (Tawil) বা interpretation এবং তাফসীর বা Explanation এক জিনিস নয়। তাফসীরের উদ্দেশ্য হচ্ছে আইনের উৎসের অর্থকে ব্যাখ্যা করা এবং ঐ বাক্যের সীমার মধ্যে হুকুম (Rule) বের করা। কিন্তু তাবিল (Tawil)-এর ব্যাপ্তি আরও বেশি এবং এর মাধ্যমে Text -এর ভেতরের বা অন্তর্নিহিত অর্থ বের করা হয়, যার উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদ করা হয়।

সকল শব্দই সাধারণভাবে অসীমাবদ্ধ (Absolute বা মুতলাক), সাধারণ (আম) এবং আক্ষরিক (হাকীকী) অর্থ বোঝায় যদি না তার ব্যতিক্রম হবার কারণ বিদ্যমান থাকে। যদি কুরআন বা হাদীসের একাংশের ব্যাখ্যা বা তাবিল কুরআন বা সুন্নাহর অন্য কোন অংশে পাওয়া যায় তবে তাকে তাফসীর তাশরীয়ী বলা হয় (অর্থাৎ যার ব্যাখ্যা শরীয়তেই আছে) এবং এসবকে আইনের অপরিহার্য অংশ বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যদি এ ব্যাখ্যাসমূহ মতামত বা ইজতিহাদের ওপর নির্ভর করে তবে তা আইনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এভাবে প্রাপ্ত আইনের মর্যাদা প্রথমে আলোচিত আইনের মর্যাদার চেয়ে কম এবং এসব আইনের ধারায় আলেমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তাবিল প্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এরকম তাবিল সবার দ্বারাই গৃহীত হয়েছে কিন্তু খুবই দূরবর্তী (harfetched) তাবিল সবার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। জাহেরী আমলেমরা সাধারণত এ রকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। যদিও তাদের এরকম অবস্থান নেওয়া দুর্বল ও বাস্তবতা বিবর্জিত।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা বুঝতে হলে আমাদেরকে শব্দ বুঝতে হবে, শব্দের মাধ্যমে যে বাক্য বা বাক্যাংশ গঠিত হয়, এসব বুঝতে হবে। এজন্য বিভিন্ন শব্দের প্রকারভেদ জানতে হবে। যথা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট শব্দ।

১টি প্রকারভেদ হচ্ছে ঃ

ক. আলফায আল ওয়াযিহা (সুস্পষ্ট শব্দাবলি) ও
খ. আলফায গায়রিল ওয়াযিহা (অস্পষ্ট শব্দাবলি)

এদের প্রতিটিকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১. আল-মুহ্কাম তথা চূড়ান্ত অর্থবোধক শব্দ।
২. আল-মুফাস্সার তথা বিশ্লেষনার্থ শব্দ।
৩. নাস তথা উদ্দেশ্য প্রণোদীত শব্দ।
৪. যাহের তথা সরাসরি অর্থবোধক শব্দ

প্রথম দু'প্রকার শব্দ পুরোপুরি সুস্পষ্ট এবং এদের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। মূলত এ দু'প্রকার শব্দের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই অর্থের বিচারে। কিন্তু উসূলবিদগণ মুহ্কাম শব্দকে বলেছেন যে, এদেরকে রহিতকরণ (Abrogation) সম্ভব নয়। যদিও মুফাচ্ছার শব্দসমূহকে রহিতকরণ করা যাবে। অবশ্য রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর যেহেতু আর নাস্খ বা রহিতকরণ সম্ভব নয় সুতরাং মুহকাম এবং মুফাস্সার এখন বাস্তবে একই হয়ে গেছে (দ্রষ্টব্য ঃ হাশীম কামালী রচিত Principals of Islamic Jurisprudence)।

এর নিচের পর্যায়ের সুস্পষ্ট শব্দকে বলা হয়েছে 'জাহের' ও 'নাস' অর্থাৎ স্পষ্ট বা পরিষ্কার শব্দ। কিন্তু এদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব। মুফাস্সার বা মুহকামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, কিন্তু জাহের ও নাস-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব। জাহের ও নাস শব্দের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, অর্থটি Context বা প্রেক্ষিতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা অথবা অর্থটি মূলপাঠ (Text)-এ প্রাথমিক (Primary) না নির্গত (Secondary) অর্থ।

মুতাশাবিহাত

এমন সব শব্দ যেগুলো আমাদের কাছে রহস্যপূর্ণ বা যাদের অর্থ আমাদের বোঝা সম্ভব নয় বলে মনে করা হচ্ছে। যেমন আল-হারফুল মুকাত্তায়াত (যথা- আলিফ-লাম-মিম, হা-মিম ইত্যাদি); কেউই এদের অর্থ জানে না। অধিকাংশ স্কলার মনে করেন যে, কুরআনের যেসব অংশে আল্লাহর কোন বিষয় মানুষ কিংবা পার্থিব কোন বিষয়ের সাথে তুলনাযোগ্য রয়েছে, সেসব আয়াতই মুতাশাবিহাত (যেমন আল্লাহর হাত, সিংহাসন, আরশ প্রভৃতি)।

www.pathagar.com

মুজমাল

মুতাশাবিহাতের চেয়ে একটু কম অস্পষ্ট শব্দকে বলা হয় মুজমাল। এগুলো এমন সব শব্দ যাদের ব্যাখ্যা বর্ণনাকারী না উল্লেখ করে দিলে বোঝা যায় না। যেমন সালাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি মুজমাল শব্দ। সালাত মুজমাল, কারণ সালাতকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ব্যাখ্যা না করে দেবেন, ততক্ষণ এটা বোঝা যায় না এবং যদি সত্যিকার অর্থেই এসব আল্লাহ্র রাসূল না বুঝিয়ে দিতেন তাহলে সালাত আমরা আদায় করতে পারতাম না। অধিকাংশ মুজমাল শব্দ যা কুরআন ও হাদীসে আছে রাসূল (স) তা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। রাসূল (স) সালাত ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, যাকাত ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, হজ্জ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। ফলে এগুলো আর মুজমাল থাকেনি এগুলো মুফাস্সার হয়ে গেছে। মানে সুস্পষ্ট শব্দ হয়ে গেছে।

কিন্তু এখনও যে সকল শব্দ মুজমাল রয়ে গেছে এবং শরীয়ত প্রণেতা তা ব্যাখ্যা করে দেননি, তা সবই মুজমালই রয়ে গেছে এবং এগুলো অস্পষ্ট শব্দ বলে গণ্য হবে। ১০১ ঃ ১-৫ এ 'আল-কারিয়্যাহ্' শব্দটি মুজমাল। কিন্তু এটি কুরআনেই ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে এবং তা এখন সুস্পষ্ট।

মুশকিল

মুজমালের চেয়ে আরেকটু কম অস্পষ্ট শব্দকে মুশকিল শব্দ বলা হয়। মুশকিল মানে কঠিন (Difficult)। যেমন একটি শব্দের তিনটি অর্থ কোনটি হবে? এগুলো মুশকিল শব্দ। গবেষণা করে এসব শব্দের অর্থ বের করা সম্ভব। যদিও তা সম্পূর্ণভাবে অস্পষ্টতা মুক্ত হয় না।

আল-খাফী

কোন এক শব্দের যদি একাংশ স্পষ্ট হয় এবং অন্য অংশ অস্পষ্ট হয়, তবে সে সকল শব্দকে আল-খাফী বলে। যেমন সারিক (চোর)। আল্লাহ বলেন, যে চোর তার হাত কেটে দাও। এখন চোর কে? একজন পকেটমার কি এ চোরের পর্যায়ভুক্ত হবে? কাফন চোর কি চোর? এসব ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এ শব্দের একাংশ অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তাই এটি খাফী শব্দ। এসবের আইনগত গুরুত্ব ব্যাপক। যারা মনে করেন পকেটমার কুরআনে বর্ণিত চোর এর পর্যায়ে পড়ে না, তারা এক্ষেত্রে হাত কাটার শাস্তি দেন না। কিন্তু তাকে তাজীর তথা আদালতের রায় বা বিচারের অধীনে শাস্তি পেতে হবে।

www.pathagar.com

আ'ম ও খাস

শব্দের প্রকারভেদের আরেকটি বিধান হচ্ছে, আ'ম এবং খাস। এরা শব্দের Scope বা সীমা বা ব্যাপ্তি কতটুকু—একটি শব্দে কি সকলেই অন্তর্ভুক্ত না কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র বা অংশ অন্তর্ভুক্ত তা নির্ধারণ করে। এই সীমার দৃষ্টিকোণ থেকেই শব্দের এরূপ দুই ভাগ।

আ'ম হচ্ছে ঐ সকল শব্দ যার অর্থ একটি এবং খাসও এমন শব্দ যার অর্থ একটি। কিন্তু আ'ম শব্দের আওতায় যত ব্যক্তি বস্তু চলে আসে, তাদের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। আ'ম কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক বোঝায় না। ইনসান (মানব জাতি) একটি আ'ম শব্দ, যা সকল মানুষকে এর অন্তর্ভুক্ত করে। ইনসানের আর দ্বিতীয় কোন অর্থ নেই। তাহলে কোন বাক্যে যদি ইনসান থাকে, তবে ঐ বাক্যের ইনসান অর্থে সকল মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যখন কোন বিশেষ্য পদের বা নামের পূর্বে নির্দিষ্ট সূচক শব্দ 'আল' (The) বসে, তবে সেই শব্দ আ'ম হয়ে যায়। এমনিভাবে জামি (সবকিছু), কাফ্‌কাহ্, কুল প্রভৃতি আরবী শব্দ যখন কোন শব্দের পূর্বে বসে, তখন সেসব শব্দাবলি আ'ম হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন একটি আদেশ কোন আম শব্দ দ্বারা হয়, তখন তা আওতাধীন সকলের ওপর প্রয়াজন হবে। আ'মকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. পুরোপুরি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন "কোন প্রাণী নাই যার রিয্‌ক আল্লাহ্‌র ওপর নাই, (ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদে ইল্লা আলাল্লাহি রিযকুহা)।" (সূরা হুদ ঃ ৬)

২. আ'ম যা নির্দিষ্ট কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন সূরা ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "হে আহলে কিতাবধারী, কেন তোমরা আল্লাহ্‌র কথাকে অস্বীকার করছ?"

৩. আ'ম যাকে নির্দিষ্ট বা বিশেষায়িত করা হয়েছে অন্যত্র কোন আয়াত দ্বারা। ২ঃ২২৮ ও ৩৩ঃ৪৯ আয়াতের প্রথমটিতে তালাকপ্রাপ্তির পর নারীকে তিন মাস (কুরু) ইদ্দত পালনের কথা বলা হয়েছে, অথচ ৩৩ঃ৪৯-এ বলা হচ্ছে "যদি স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও, তখন ইদ্দতের কোন সময় নেই।"

আইন বা আদেশ যদি নির্দিষ্ট (Specific) করে দেওয়া থাকে তখন তা কাত্'ঈ (অকাট্য) হবে এবং তা তাবিলের উপযুক্ত হবে না। খাস (Specific) শব্দকে কাত্'ঈ (সুস্পষ্ট) গণ্য করা হয় মানে এর অর্থ ও প্রয়োগ দুর্বোধ্যতাশূন্য ও পরিষ্কার।

www.pathagar.com

কিন্তু আ'ম শব্দ কাত্'ঈ না যন্নী, এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমদের মতে আ'ম কাত্'ঈ নয়, খাস কাত্'ঈ। তাদের মতে, যদি একই বিষয়ে আ'ম বিধান (Ruling) ও খাস বিধান (Ruling) দু'টিই পাওয়া যায় তাহলে খাসকে বহাল রাখতে হবে এবং আ'মকে সীমাবদ্ধ (Restrict) করে দিতে হবে। যেহেতু আ'ম জান্নী (অকাট্য নয়) ও খাস কাতঈ (অকাট্য), সুতরাং খাসতো বহাল থাকবেই আর আমের উমুমিয়াত (সর্বব্যাপকতা) তার সাধারণ ব্যবহারটি খাস দ্বারা নির্ধারিত ও বিশেষায়িত হয়ে যাবে।

আ'ম-এর প্রভাব হচ্ছে এটাকে বিশেষায়িত না করলে তা আ'ম হিসাবেই প্রয়োগ হবে। এমনকি যদি আংশিকভাবে আ'মকে বিশেষায়িত করা হয়ও সেক্ষেত্রে আ'মের বাকি অংশ অবিশেষায়িত (Unspecified) অংশের জন্য আইনের সাধারণ উৎস হিসাবে বিদ্যমান থাকবে। যেহেতু অধিকাংশের মতে আম কাত্'ঈ নয়, সেহেতু এর তাখসিস (সীমাবদ্ধতা বা Limitation) করা যায়।

হাকীকী ও মাজাযী

শব্দের বিশ্লেষণে আরেকটি বিষয় হচ্ছে শব্দ হাকীকী (Literal বা আক্ষরিক অর্থ) হবে না মাজাযী (রূপক অর্থ) হবে। সকল শব্দ সাধারণত হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে আইনের ক্ষেত্রে কোন শব্দের অর্থ সাধারণত আক্ষরিকভাবে করা হয়, রূপক অর্থ এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না। কুরআনে বেশিরভাগ শব্দই আক্ষরিক অর্থ দ্বারা বুঝা হয়। যেমন মানুষ মানে মানুষই, গরু মানে গরুই। এদের রূপক অর্থ গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআনে মাজাযী অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ৪০ ঃ ১৩-তে আল্লাহ বলেন, 'Allah sends down sustenance from the heavens (অর্থ আল্লাহ আকাশ থেকে রিযিক পাঠান)। এখানে Sustenance অর্থ বৃষ্টি, আল্লাহ্ বৃষ্টি পাঠান, যার মাধ্যমে রিযিক উৎপন্ন হয়। সুতরাং এখানে হাকীকী অর্থ নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। আবার সূরা নূরের ৩৫ নং এ আল্লাহ বলেন, "আল্লাহু নূরুস্সামাওয়াতি ওয়াল আরদ।" এখানে নূর মানে আমরা যে Light দেখি সে Light-কে নূর বা আলো মনে করলে হবে না।

কিন্তু যদি দেখা যায় একটি অর্থের মাজাযী ও হাকীকী এ দুইটি অর্থ থাকে, তখন অধিকাংশের মতে হাকীকী অক্ষরিক অর্থেই নিতে হবে, একটি ক্ষেত্র ব্যতীত। অর্থাৎ যদি রূপক অর্থ প্রধান অর্থে পরিণত হয় এবং অক্ষরিক অর্থের উপরে চলে যায় তখন রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। যেমন তালাক শব্দের

www.pathagar.com

আক্ষরিক ও পরিভাষাগত অর্থ হচ্ছে To release বা মুক্ত করা বা Removal of restriction. কিন্তু এখন আইনে এর মাজাযী রূপটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা তালাক এর প্রধান অর্থ এখন Dissolution of marriage বা Divorce হয়ে গেছে, ফলে এক্ষেত্রে হাকীকী অর্থ গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই।

হাকীকী শব্দকে linguistic (ভাষাগত) Customasy (রীতি বা রেওয়াজ ভিত্তিক) এবং Juridical (আইনগত) এ তিনটি উপভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

হাকীকী ও মাজাযীকে আরও দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. সরিহ (Sarih or Plain) ঃ যাদের অর্থ সহজেই বের করা যায় এবং যাদের অর্থ নিরূপণে বক্তা বা লেখককে কোন প্রশ্নই করতে হয় না।

২. কিনায়াহ (যার মধ্যে অদৃষ্টতা আছে) ঃ যাদের অর্থ বক্তার বা লেককের অন্য বক্তব্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হয়।

আরেক প্রকার হচ্ছে মুশতারাক (Mushtarak)। মুশতারাক হচ্ছে ঐসব শব্দ যাদের একাধিক অর্থ আছে। যেমন 'আইন' (Ayn) একটি মুশতারাক শব্দ, যার অর্থ চোখ বা ঝরণা, স্বর্ণ, গোয়েন্দা—এ চারটিই হতে পারে। এসব শব্দ 'মুশকিল' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কোন আয়াতে এসব শব্দের সঠিক অর্থ বের করার জন্য যোগ্য ব্যক্তির (যোগ্য মুজতাহিদ আলেম) প্রয়োজন। মুজতাহিদদের মধ্যে এসব ব্যাপারে ভিন্ন মতামতের অবকাশ রয়েছে এবং ইজতিহাদ করতে এটা সব সময়ই হয়।

মুতলাক ও মুকাইয়াদ

মুতলাক হচ্ছে এমন সব শব্দ যাদের নির্দিষ্ট বা বিশেষায়িত করা হয়নি (Unspecified & Unqualified word)। যখন আমরা বলি 'একটি বই' তখন তা কোন বাধা (Restriction) ছাড়াই যে কোন বইকে বুঝায়। আর যখন কোন মুতলাক শব্দ অন্য কোন এক বা একাধিক শব্দ দ্বারা বিশেষায়িত করা হয় তখন তা মুকাইয়াদ হয়ে যায়। যেমন 'একটি নীল বই'। আ'ম ও খাস শব্দ যেখানে শব্দের Scope বা ব্যাপ্তি-পরিধি নিয়ে চিন্তা করে, সেখানে মুতলাক বা মুকাইয়াদ শব্দসমূহ শব্দের গুণ বা শর্ত নিয়ে চিন্তা করে (যদিও মুতলাকের সাথে আ'ম ও মুকাইয়াদের সাথে খাসের মিল আছে)। উদাহরণস্বরূপ 'দাস মুক্ত কর' (৫ঃ৯২) একটি মুতলাক আর 'বিশ্বাসী একজন দাস মুক্ত কর' (৪ঃ৯২) মুকাইয়াদের উদাহরণ।

যখন মুতলাক শর্তাধীন হয়ে মুকাইয়াদে রূপ নেয়, তখন মুকাইয়াদ অর্থই গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন ৫ ঃ ৩ আয়াতে 'রক্তপান'-কে হারাম ঘোষণা করা

www.pathagar.com

হয়েছে এবং ৬ ঃ ১৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'প্রবাহিত রক্ত হারাম'-এর কথা। এক্ষেত্রে পরেরটি মুকাইয়াদ ও প্রথমটি মুতলাক এবং মুকাইয়াদ অগ্রগণ্য হবে মুতলাকের চেয়ে। যদি দু'টি Text-এর একটি মুতলাক ও অন্যটি মুকাইয়াদ হয় এবং যদি তা আইনের দিক থেকেও কোন কারণে ভিন্নধর্মী হয় তবে দু'টিই প্রযোজ্য (Operate) হবে, কোনটিই শর্তাধীন হবে না। এটাই অধিকাংশের মত। যদিও ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে কিছুটা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যদি দু'টি Text আইনের দিক থেকে ভিন্ন হয়, কিন্তু কারণ একই থাকে, তখন মুতলাক মুকাইয়াদ দ্বারা শর্তাধীন হবে (৫ ঃ ৭ ও ৪ ঃ ৪৩ আয়াতদ্বয়)।

প্রমাণ গ্রহণের পদ্ধতি ঃ একদল ওলামা প্রমাণ গ্রহণের ৪টি পদ্ধতির কথা বলেছেন। যথা ঃ

১. ইবারাতুন্নাস ঃ এর মানে হচ্ছে একেবারে শব্দের মধ্যেই, ইবারতের মধ্যেই হুকুমের প্রমাণ আছে। যেমন ফরয নামায, রোযা, শাস্তিসমূহ বা উত্তরাধিকার আইন। এসবগুলো প্রধানত ইবারাতুন্নাস শব্দের মধ্যে আছে। এটা হচ্ছে প্রমাণ গ্রহণের প্রথম পদ্ধতি এবং অধিকাংশ আইনের প্রমাণ এ পদ্ধতিতে করা হয়।

২. ইশারাতুন্নাস ঃ শব্দের মধ্যে সরাসরি নাই কিন্তু ইশারার মধ্যে প্রমাণ বা তথ্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনের ২ঃ২৩৬ আয়াত (দোষ হবে না যদি তোমরা তালাক দাও, অথচ তোমাদের মধ্যে কোন দৈহিক সম্পর্ক হয় নাই অথবা তোমাদের মধ্যে মোহর ধার্য করা হয় নাই)। এ আয়াতের ইশারা থেকে প্রমাণ হয় যে, মোহর ধার্য না হয়ে থাকলেও বিবাহ পূর্ণ হয়ে যায়। তবে পরে মোহর-ই-মিসল দিতে হবে।

৩. দালালাতুন্নাস ঃ তেমনিভাবে তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে দালালাতুন্নাস (inferred meaning), অর্থাৎ তার যুক্তি দেখা। যেমন সূরা বনি ইসরাইলের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তাদেরকে অর্থাৎ পিতামাতাকে তোমরা 'উহু' বলবে না।" এখানে কেউ যদি বলে আমি উহু বলব না, কিন্তু অন্য সকল ধরনের খারাপ আচরণ বা মন্দ কথা প্রয়োগ করব—তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আয়াতটির Spirit বা দালালা বা কারণ বলে যে, মা-বাবার সাথে কটূক্তি করা, বাজে আচরণ করা, গাল-মন্দ করা যাবে না।

৪. ইকতিদাউন্নাস ঃ এর অর্থ হচ্ছে Required বা যে অর্থ নেওয়া আবশ্যক সে অর্থ। যেমন সূরা নিসার ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের মায়েরা

www.pathagar.com

ও কন্যারা তোমাদের জন্য (বিবাহের জন্য) হারাম।" এ কন্যারা মানে কোন্ কন্যারা? এখানে কন্যারা বলতে বিবাহের মাধ্যমে কন্যা বুঝায়। তারা হারাম হয়ে যাবে বিয়ের ক্ষেত্রে।

কোন রকম বিরোধের ক্ষেত্রে প্রমাণ গ্রহণে প্রথম পদ্ধতিটি দ্বিতীয় পদ্ধতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে এবং ২য় পদ্ধতি ৩য় পদ্ধতির ওপর এবং ৩য় পদ্ধতি ৪র্থ পদ্ধতির ওপর স্থান পাবে। কেননা, এদের একটি আরেকটি থেকে প্রমাণ পদ্ধতি হিসেবে উচ্চতর।

অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ী প্রমাণ গ্রহণের পদ্ধতিকে দু'টি মৌলিক ভাগে ভাগ করেছে। ১. দালালাহ আল মানতুক (Pronounced meaning), ২. দালালাহ মাফহুম (Implied meaning).

এদের মধ্যে প্রথমটিকে আরও দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—দালালাহ আল ইকতিদা (Required meaning—যে অর্থ গ্রহণ করা জরুরি) এবং দালালাহ আল ইশারাহ (Alluded meaning-যে অর্থ ইশারার মধ্যে আছে)। আবার দালালাহ আল মাফহুমকে মাফহুম আল মুয়াফাকাহ (Harmonious meaning বা সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ) এবং মাফহুম আল মুখতালিফাকে (Divergent meaning বা অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থ) এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শাফেয়ীরা মাফহুম আল মুখতালিফাকে গ্রহণ করে না যদি না নিম্নোক্ত শর্তকে তা মেনে চলে।

১. এর অর্থ দালালাহ আল মানতুকের আওতার বাইরে হতে পারবে না।
২. অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থ প্রধান অর্থ হতে পারবে না।
৩. অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থ কোন প্রচলিত অর্থের পরিপন্থি হবে না।
৪. এর অর্থ অবশ্যই সত্য ভাষণের বিপক্ষে হবে না।
৫. এর অর্থ এমন এক সিদ্ধান্ত আনয়ন করবে না যা কোন Textual আইন বা বিধানের বিপক্ষে হয়।

কিন্তু হানাফী আলেমরা মাফহুম আল মুখতালিফাকে আরও বেশি অগ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। তারা এমন কোন অর্থ গ্রহণ করেনি যা কিনা মূল পাঠের (Text) বা তার মর্মার্থ (Spirit)-এর সাথে খাপ খায় না। তারা কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এদের আদৌ গ্রহণ করেনি।

(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়, Principles of Islamic Jurisprudence by Mohammad Hashim Kamali, Islamic Texts Society, Cambridge.)

www.pathagar.com

ফতোয়া ঃ ঐতিহাসিক ও আইনগত প্রেক্ষাপট

ফতোয়া সম্পর্কে বিতর্ক বাংলাদেশে খুব বেশি আগে শুরু হয়নি। তিন-চার বছর আগে এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। যতটুকু জানা যায়, কিছু এনজিও এ নিয়ে আন্দোলন শুরু করে এবং 'ফতোয়াবাজি' শব্দটি প্রথমবারের মত ব্যবহার করে। কিছু পত্র-পত্রিকা এ বিষয়ে ফলাও করে প্রচার করতে থাকে। তারা কেবল 'ফতোয়া'র অপব্যবহারের ওপর কথা বলেনি; বরং ফতোয়ার বিরুদ্ধেই বক্তব্য রাখে।

সে প্রেক্ষিতে আমি ১৯৯৮ সালে ফতোয়ার ব্যবহার ও অপব্যবহারের ওপর একটা চিঠি লিখি, যা বিভিন্ন ইংরেজি দৈনিকে সে বছর জুন মাসে প্রকাশিত হয়। একটি ইংরেজি দৈনিকে ২৫ জুন ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত পত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো।

ফতোয়ার ব্যবহার ও অপব্যবহার ঃ এটা সত্য যে, আমরা বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ অথবা পণ্ডিতবর্গের গ্রুপের লেখা অনেক ফতোয়ার কিতাব দেখতে পাই। যেমন 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' যা সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ৩০০ আলেম সংকলন করেছেন। তেমনি রয়েছে ফতোয়া-ই-রাশিদিয়া যা দেওবন্দের একজন বিখ্যাত আলেমের লেখা। আরো রয়েছে 'ইমদাদুল ফতোয়া', যা মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) লিখেছেন। অনুরূপ আরো বেশকিছু ফতোয়ার বিখ্যাত সংকলন রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ফতোয়ার আইনানুগ মূল্য কি? আমি কিছুদিন আগে ফতোয়ার একটা ভাল সংজ্ঞা পড়েছি যা এরূপ ঃ ফতোয়া হচ্ছে আলেমগণের আইনানুগ মতামত যা বাধ্যতামূলক নয়। আসলে এটাই সত্য এবং এটাকেই একটা সাধারণ সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য এটা আদালতের রায় বা সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক। রায় হচ্ছে আদালতের সিদ্ধান্ত যা বাধ্যতামূলক; তবে তা উচ্চতর আদালতে আপীলযোগ্য। অথচ ফতোয়া শুধু আইনানুগ মতামত, যা বাধ্যতামূলক নয়। যেমন একজন আধুনিক আইনজীবী বা এটর্নির মতামত। অবাধ্যতামূলক 'ফতোয়া' কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগত ব্যাপারে মেনে চলতে পারে, এমনকি তা সামাজিক ব্যাপারেও মানা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা জোর করে চাপানো হয় অথবা তা রাষ্ট্রীয় আইনের (Public Law) অন্তর্ভুক্ত হয়। ফতোয়ার দ্বারা কোন শাস্তি দেওয়া যায় না। শাস্তি কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত দিতে পারে। ইসলামের ইতহাসে এ নযির নেই যে, কোন আলেম কাউকে শাস্তি দিয়েছেন বরং শরীয়াহ আদালতই এরূপ শাস্তি বিধান করেছে।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য যে, 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি'-এর মতে, ফতোয়ার কিতাব জনগণের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে সহায়তা যেমন করেছে, তেমনি আদালতকেও তাদের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে। সে সময় সংসদের দ্বারা পাস করা কোন আইন ছিল না। ফলে আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এসব কিতাব খুবই সহায়ক ছিল। অবশ্য এসব ফতোয়া আদালতের ওপর বাধ্যতামূলক ছিল না; 'ফতোয়া' গ্রহণ করা না করা আদালতের এখতিয়ার ছিল। আদালত ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতো অথবা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করে রায় দিত।

আমি একমত যে, উপরিউক্ত বিষয়ে অন্য কিছু মুসলিম দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অনেক ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। এটা যোগ্য আলেমদের দ্বারা অবশ্যই দূরীভূত হতে হবে। 'ফতোয়া' অবশ্যই যোগ্য ইসলামিক পণ্ডিতবর্গের কাজ। গ্রাম্য বা স্থানীয় নেতা এমনকি ইসলামী আইন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবহিত নয় এমন সুধীদের কাজ নয়। 'ফতোয়ার' অপব্যবহার কালক্রমে প্রচার মাধ্যমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা জনগণকে অবহিত করতে পারলেই কেবল সঠিকভাবে রোধ করা যাবে। বাংলাদেশে বর্তমান বিতর্কের পূর্বেই আমি এ লেখা লিখেছিলাম। এখন আমি Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World-এর ফতোয়া সংক্রান্ত ৩টি প্রবন্ধ থেকে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। এই প্রবন্ধ ৩টি হচ্ছে, Concept of Fatwa বা ফতোয়ার ধারণা—মুহাম্মদ খালিদ মাসুদ, Process and Function of Fatwa বা ফতোয়ার পদ্ধতি ও কার্যাবলি—ব্রিঙ্কলি মেজিক এবং Modern Usage of Fatwa বা ফতোয়ার আধুনিক রীতি—আহমদ এস দাল্লাল।

ফতোয়ার ধারণা ঃ ফতোয়া শব্দটি 'ফাতা' থেকে উদ্ভূত। 'ফাতা' অর্থ যৌবন, নতুনত্ব, সরলীকরণ বা ব্যাখ্যা। এ সকল অর্থ তার বিভিন্ন সংজ্ঞায় দেখা যায়। কুরআনে এর উল্লেখ দেখা যায় দুইভাবে। প্রথমত কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট উত্তর চাওয়া এবং দ্বিতীয়ত সুনির্দিষ্ট জবাব দান। (সূরায়ে নিসা, আয়াত-১২৭ ও ১৭৬)। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কাঠামোতে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে 'ফতোয়া'র ধারণার উন্মেষ ঘটে? তখন এর বিষয় ছিল জ্ঞান। পরবর্তীতে 'জ্ঞান' যখন হাদীসের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন ফতোয়া রায় ও ফিক্‌হ বা আইন শাস্ত্রের সাথে যুক্ত হয়। ফলে ফতোয়া শব্দটির কৌশলগত ব্যবহার আরও অধিকতর পরিশীলিত হয়।

বিচার সংক্রান্ত কর্তৃত্বের কার্যকারিতার প্রেক্ষাপটে 'ফতোয়া' এবং আদালতের রায় এক নয়। 'ফতোয়া'র আওতা আদালতের রায়ের চেয়ে প্রশস্ততর। ধর্মীয়

www.pathagar.com

আচার-অনুষ্ঠানের আওতাভুক্ত 'ইবাদত' বা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদালতের আওতাবহির্ভূত, যদিও এগুলো ইসলামী আইনের অপরিহার্য অংশ এবং আইনশাস্ত্রে ও ফতোয়ায় এটা উল্লেখযোগ্যভাবে উদ্ধৃত হয়। আরও উল্লেখ্য যে, ফতোয়া কারও উপর বাধ্যতামূলক নয়, যদিও আদালতের রায় বাধ্যতামূলক এবং আইনানুগভাবে কার্যকরী।

পূর্বে ফতোয়া বিচার পদ্ধতি বহির্ভূতভাবেও কাজ করতো, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কোর্টের সাথে মুফতীদের সংযুক্ত করা হতো। আন্দালুসিয়ায় আদালতের উপদেষ্টা হিসেবে মুফতীগণ কাজ করতেন।

আধুনিক পণ্ডিতবর্গও ফতোয়াকে সচরাচর ইসলামী পণ্ডিতগণের দ্বারা প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক আইনানুগ মতামত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য তাদের ভূমিকা উপদেশমূলক এবং তা স্ব-স্ব দেশের ধর্মীয় মন্ত্রণালয়ের অংশ, বিচার মন্ত্রণালয়ের নয়।

ফতোয়া পদ্ধতি এবং কাজ ঃ ফতোয়া সাধারণত একজন মুফতী প্রশ্নকারী কোন ব্যক্তিকে উত্তর আকারে দিয়ে থাকেন। ফতোয়া এমন একটি ইসলামী পদ্ধতি (Institution) যা সকল কালে এবং সকল স্থানে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফতোয়াকে রোমান আমলের আইন পরামর্শদাতাদের (Juris consuls) মতামতের (legal opinion) সঙ্গে তুলনা করা যায়। কোর্টের রায় এবং ফতোয়া ভিন্ন ধরনের (Different category)। কোর্টের রায় বাধ্যতামূলক। কিন্তু ফতোয়া পরামর্শদানের পর্যায়ের (advisory)। মুফতীগণ ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দেন কিন্তু কোর্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে রায় প্রদান করে। ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারক এবং মুফতী নিজস্ব পদ্ধতিতে শরীয়তের ব্যাখ্যা করে থাকেন। যেখানে কোর্ট প্রধানত সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে বিচার করে সেখানে মুফতী কুরআন-সুন্নাহ ও অন্যান্য প্রমাণ দেখে ফতোয়া প্রদান করেন। তত্ত্বগতভাবে ফতোয়া মৌখিকভাবেও দেওয়া যায়। লিখিতভাবে অসংখ্য ফতোয়া রয়েছে বিভিন্ন ফতোয়ার গ্রন্থে। এছাড়া বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য ফতোয়া সংরক্ষণাগারে (archive) সংরক্ষিত আছে।

ফতোয়া 'হ্যাঁ' বা 'না' আকারে প্রশ্নের উত্তরে এক শব্দে হতে পারে। আবার কোন ক্ষেত্রে তা পুস্তিকার আকার ধারণ করতে পারে।

ফতোয়ার সামগ্রিক তাৎপর্য দু'ধরনের। প্রথমত, ফতোয়ার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত বিষয়ে খ্যাতনামা ফিক্‌হবিদগণ (jurist)

www.pathagar.com

তাদের আনুষ্ঠানিক (formal) মতামত দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, অন্যদিকে অসংখ্য অন্যান্য ফতোয়ার মাধ্যমে মুসলিম জনগণ তাদের জীবনকে শরীয়তের আলোকে সাজিয়ে নিয়েছে (arrange their affairs)।

ফতোয়ার আধুনিক রীতি ঃ ফতোয়ার উদ্দেশ্যে মুফতী সাহেবদের জন্য সরকারি অফিস প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই অনানুষ্ঠানিকভাবে ফতোয়ার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় এবং তার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়। উসূলে ফিক্‌হে এর বিষয়বস্তু পরিলক্ষিত হয়। ইজতেহাদের পরেই এ বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে।

ব্যবহারিক আইনের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক মতামতের অনুসন্ধানের নাম ইজতেহাদ। অথচ ফতোয়া আইনের বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে মুজতাহিদের সামাজিক ভূমিকার উল্লেখ করে। এক্ষেত্রে এটা সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত কাজির ভূমিকা থেকে পৃথক। তাই ফতোয়া হচ্ছে একজন মুসতাফতী বা প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসার জবাবে অবাধ্যতামূলক (non-binding) আইনানুগ মতামত। এক্ষেত্রে একজন মুফতী কোন বিবাদের একটি পক্ষের জিজ্ঞাসার জবাবে মতামত দিয়ে থাকেন। এ কারণেই একজন মুফতীর ফতোয়া বাধ্যতামূলক হয় না, যেমনটি হয়ে থাকে একজন বিচারকের রায়।

একাদশ শতাব্দীর আগে যিনি ফতোয়া দিতেন তিনি মুফতী হতে পারতেন। কেবল তাঁর জ্ঞান ও সমাজের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের স্বীকৃতিই এক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হতো। একাদশ শতাব্দীতে এসে মুফতীদের সরকারি অফিস চালু হয়। খোরাসানে কোন নগরের শাইখুল ইসলামই সেই নগরের উলামাদের সরকারি প্রধান হিসেবে বিবেচিত হতো এবং তিনি প্রধান মুফতী হিসেবে তাঁর কাজ করে যেতেন।

মামলুক শাসনামলে প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে আপীল আদালতের অংশ হিসেবে প্রত্যেক মাজহাব থেকে একজন মুফতী নিয়োগদান করা হতো।

উসমানীয় শাসনামলে প্রত্যেক নগরে একজন করে মুফতীকে নিয়োগ দেওয়া হতো। মুফতীগণকে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংঘবদ্ধ করা হতো এবং ফতোয়াদানের কাজকেও একটি দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির আওতায় আনা হতো। দ্বিতীয় সুলতান মুরাদের শাসনামলে (১৪১১-১৪৪৪ এবং ১৪৪৬-১৪৫১) শাইখুল ইসলামের উপাধি পরিবর্তিত হয়ে সাম্রাজ্যের প্রধান মুফতী-তে পরিণত হয়। কালক্রমে মুফতীর অফিস উসমানীয় সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অনুমোদন লাভ করে, যা পূর্বে ছিল না। পরবর্তীতে প্রধান মুফতীর অফিস আবার শাইখুল ইসলামের অফিসে রূপান্তরিত হয়। উসমানীয় খলিফা

www.pathagar.com

সুলাইমান ইস্তাম্বুলে শাইখুল ইসলামের পদে প্রধান মুফতীকে নিয়োগদান করতেন এবং তাঁকেই সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রধান হিসেবে বিবেচনা করতেন। সুলতান শাইখুল ইসলামকে নিয়োগদান ও বরখাস্ত করতেন। আবার সুলতানকে তাঁর পদে স্থায়ীকরণ বা ক্ষমতাচ্যুতি শাইখুল ইসলামের ফতোয়ার ওপর নির্ভর করতো। এক্ষেত্রে অবশ্য শাইখুল ইসলাম তাঁর রায় কার্যকর করতে বিচারপতিদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন।

উসমানীয় সাম্রাজ্যে ফতোয়ার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়ের সংস্কারের ক্ষেত্রেও শাইখুল ইসলামের ফতোয়ার প্রয়োজন হতো। তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সম্ভব ছিল না। আধুনিক মুসলিম বিশ্বেও কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা মুসলিম উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফতোয়া দিয়ে থাকে। OIC-এর 'ফিক্‌হ একাডেমী' ও সৌদী আরবের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান 'দারুল ইফতা' এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উত্তর আমেরিকার মুসলমানদের রয়েছে নর্থ আমেরিকান ফিক্‌হ কাউন্সিল। ফতোয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলি সুস্পষ্ট। যেহেতু প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই ইসলামী বিধিবিধান জানা ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য তাই এ ব্যাপারে জানার জন্য কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে প্রশ্ন করা বা মতামত চাওয়াও ফরযের অঙ্গ। আর আলেমদের জন্য কেউ দ্বীন ও শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) দিয়েছেন। কোন আলেমের কাছে শরীয়াহ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হলে সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নকারীকে অবহিত না করলে পরকালে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে বলে রাসূল (স) বলেছেন। তাই শরীয়াহ বিষয়ে আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করা এবং আলেমদের পক্ষ থেকে সে বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা বা ফতোয়া প্রদান করা ইসলামী শরীয়াতের অপরিহার্য অঙ্গ। আর এ বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবীদের আমল এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বকালের আলেমদের ভূমিকা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

উপসংহার ঃ সুতরাং ফতোয়া বন্ধ করা কোনভাবেই ইসলামসম্মত কাজ নয়। এরকম করা হলে মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ইসলামী আইনের অগ্রগতি বিনষ্ট হবে এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে নতুন সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইনের ভূমিকা ব্যাহত হবে। তবে ফতোয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তার দায়িত্ব সমাজের সকল মহলের।

www.pathagar.com

ইসলাম ও জননিরাপত্তা

রাষ্ট্র ও সমাজের অস্তিত্বের মূল কারণই হচ্ছে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এক সময় রাষ্ট্র ছিল না। তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করাই স্বাভাকি ছিল। এ বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে সমাজে নিরাপত্তা বিধান করার জন্য রাষ্ট্র গঠন করা হয়।

ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনাতে পৌঁছেই একটি সংঘবদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাষ্ট্র গঠন ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অবশ্যই ইসলামী আইন-কানুন ও আদর্শ কার্যকরী করা ছিল। তবে এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

জননিরাপত্তা নষ্ট করাকে ইসলাম একটি বড় অপরাধ গণ্য করে। ইসলামের পরিভাষায় 'ফাসাদ ফিল আরদ' (পৃথিবীতে বিপর্যয়) সৃষ্টি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং তার জন্য মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। (সূরা মায়িদা ঃ ৩২)

জননিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ইসলাম জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তাসহ সব ধরনের প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার দিয়েছে। বিদায় হজ্জের বাণীতে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "হে লোক সকল! তোমাদের পরস্পরের জানমাল ও সম্মান পরস্পরের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এই নগরী, এই মাস, এই দিনের মত হারাম সাব্যস্ত করা হলো।" (সকল হাদীস গ্রন্থ)

জীবন, মাল ও সম্মানের ওপর হস্তক্ষেপের নিষিদ্ধতা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের শুরুতে ও মদীনার সনদে একই অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সে সনদের কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

খোদাভীরু মুমিনগণ তাদের মধ্যকার বিদ্রোহী, ঘোরতর নির্যাতক, অপরাধী, মুসলিম সমাজের স্বার্থের ক্ষতিকারক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারকদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিবে এবং এ ধরনের অপরাধীর বিরুদ্ধে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে পদক্ষেপ নিবে। চাই সে তাদের কারো ছেলেই হোক বা অন্য কেউ হোক। মুসলিম রাষ্ট্রে অনুগত অমুসলিমের অধিকার সমান। একজন সাধারণ অমুসলমানকেও মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তাসহ আশ্রয় দেবে।' (সীরাতে ইবনে হিশাম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৪৭)

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলাম অনেক সময় 'অধিকারকে' 'দায়িত্ব' হিসাবে উল্লেখ করেছে। যেমন সূরা নিসায় আল্লাহ পাক বলেছেন, "হে ইমানদারগণ তোমরা একে অপরের মাল অবৈধভাবে ভোগ করো না।" এখানে অবৈধ সম্পত্তি বা সম্পদ ভোগ না করার দায়িত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য মানুষের অধিকার আদায় সুনিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। প্রত্যেকে যদি তার দায়িত্ব পালন করে তাহলে অন্যের অধিকার রক্ষিত হয়।

জননিরাপত্তা কেবল আইন দ্বারা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এ জন্য প্রয়োজন নাগরিকদের নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলাম কেবল শিক্ষাকে সবার জন্য ফরয ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি, শিক্ষা যাতে সুশিক্ষা হয় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সাধ্যমত কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। ইসলামের প্রথম যুগে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল তাতে কুরআন ও হাদীস শিক্ষার বিশেষ স্থান ছিল। কেননা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানই মানুষকে নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। অবশ্য সব প্রয়োজনীয় জ্ঞানই মুসলমানদের অর্জন করতে হবে।

জননিরাপত্তা রক্ষিত হতে পারে যদি সঠিক বিচার কায়েম থাকে। এ জন্য ইসলাম ন্যায়বিচার কায়েম করার চেষ্টা করে। ইসলাম ন্যায়ভাবে সকল মানুষের মধ্যে বিচার করার কথা বলেছে।

"তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।" (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

ইসলাম সবাইকে যথাযথ সাক্ষ্য দিতে বলেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করতে নিষেধ করেছে। (সূরা বাকারা ঃ ২৮২-২৮৩)

প্রাথমিক যুগে ইসলামের বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ ছিল। বিচার পেতে কারো পয়সা খরচ করতে হতো না। আজকেও ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে হবে যাতে বিনা খরচ অথবা সামান্য খরচে বিচার পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা।

ইসলাম নারীর নিরাপত্তাকে পুরুষের চেয়েও অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম নারীর প্রতি লালসার নজরে তাকানো নিষিদ্ধ করেছে। রাসূল (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অন্য নারীর সৌন্দর্যের দিকে লালসার নজরে তাকাবে কিয়ামতের দিনে তার চোখে গলিত লোহা ঢেলে দেওয়া হবে।" (তাফসীরে ফাতহুল কাদীর)

ইসলাম প্রমাণ ছাড়া কোন নারীকে অসতী বলাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করেছে। "যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি কশাঘাত কর এবং আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, তারা তো ফাসেক।' (সূরা নূর; আয়াত-৪)

এসব কার্যকরী করা আমাদের দায়িত্ব। এসবকে কার্যকরী না করে ইসলামী সমাজের বর্তমান অবস্থার জন্য আমরা ইসলামকে দোষারোপ করতে পারি না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নবী জীবনের শিক্ষা

রবিউল আউয়াল মাসে আমরা নবী জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার কথা নতুন করে স্মরণ করে থাকি। বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জনের অধিক মানুষ মুসলিম হওয়ায় এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এটা আরো স্বাভাবিক এজন্যে যে, ইসলাম ও নবীর শিক্ষা মুসলিম জীনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। মুসলমানের ঈমান ও ইবাদতই কেবল নবীর জীবন দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, তাদের জীবনবোধ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্য সবদিকই নবী (স)-এর শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইসলাম ও নবী জীবনের শিক্ষার ব্যাপকতার উল্লেখ করতে হয়। বাস্তবিকই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও বিধান। যে কেউ কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করবে সে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকতা অস্বীকার করতে পারবে না। এ বিধান আমরা পেয়েছি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে। তাই যা কিছু রাসূল (স) থেকে আমাদের কাছে প্রমাণিত সূত্রে পৌঁছেছে তাই ইসলাম, অন্য কিছু নয়। অবশ্য ইসলামী পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও ইসলামে গুরুত্ব রয়েছে।

মানবজাতির ইতিহাসকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর থেকে বেশি কেউ প্রভাবিত করেনি—এটা মুসলমানদের বক্তব্য নয় বরং পাশ্চাত্যের গবেষকের মন্তব্য। 'দ্যা হান্ড্রেড' বইতে পৃথিবীর ইতিহাসকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এমন একশ' জনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বইতে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে আনা হয়েছে মানব ইতিহাসে তাদের প্রভাবের ক্রমানুসারে। সে বইয়ের খ্রিস্টান লেখক হযরত মুহাম্মদ (স)-কে প্রথমে স্থান দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, মানব ইতিহাসকে তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা জীবনের কোন একটি বা কয়েকটি দিককে প্রভাবিত করেছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনের সবদিককে প্রভাবিত করেছেন। মানব জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, আইন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিকতা সবকিছুকে তিনি প্রভাবিত করেছেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ব্যাপক বিপুল জীবন বা তাঁর শিক্ষা কোন একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ্র জীবনের কিছু শিক্ষা ও কয়েকটি দিক এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের নারীরা আজ নির্যাতনের শিকার। রাসূলুল্লাহ্র শিক্ষাকে অনুসরণ করা হলে বাংলাদেশে কখনো এ পরিস্থিতি হতে পারতো না। নারীকে হীন ও অযোগ্য মনে করা নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে, "পুরুষ যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে এবং নারী যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে।" (সূরা নিসা ঃ ৩২)

"তাদের প্রভু তাদের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন আমলকারীর আমল নষ্ট করবো না সে আমলকারী পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা একজন অন্যজন হতে হয়েছ।" (সূরা আলে ইমরান; আয়াত-১৯৫)

আল্লাহ্ আদম সন্তান সবাইকে সম্মানিত করেছেন; এ প্রসঙ্গে কালামে পাকের ঘোষণা, "এবং বনি আদমকে আমি সম্মানিত করেছি।"(বনি ইসরাইল ঃ ৭০)

এ সম্মানে নারী-পুরুষ সমান অংশীদার। নারী-পুরুষ বা মানুষে মানুষে সম্মানের পার্থক্যের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহকে মেনে চলা (তাকওয়া)।

আল্লাহর ঘোষণা, "হে মানব জাতি! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি, অতপর তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। বস্তুত, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানী সে-ই, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

এ আয়াতের মাধ্যমে চিরকালের মতো মানবজাতির মধ্যে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে কে সম্মানিত তার ভিত্তি বলে দেওয়া হয়েছে, আর তা হচ্ছে তাকওয়া বা খোদাভীতি। পুরুষ হলেই নারী থেকে কেউ অধিক সম্মানিত হয় না। আজকের সারা বিশ্বের কোন পুরুষের সম্মানই হযরত খাদিজা, হযরত আয়শা ও হযরত ফাতিমা (রা)-এর সমান হবে না।

নবী করীম (স) নারীদের মান-মর্যাদা ও অধিকারের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তিনি নারীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকেও খেয়াল রাখতেন। মদীনার মসজিদে রাসূলের পিছনে জামায়াতে অনেক মহিলা সাহাবী শরীক হতেন। নামাযের সময় যদি রাসূলুল্লাহ্ কোন বাচ্চার কান্না শুনতে পেতেন তাহলে তিনি

www.pathagar.com

নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন এবং কারণ স্বরূপ বলতেন যে বাচ্চার কান্না নামাযরতা মায়েদের কষ্টের উদ্রেক করে থাকে। (বুখারী, হাদীস ৬৬৫-৬৭)

একবার রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উট চালক আনজাশা হুদী (আরবী রাখালী গান) গেয়ে গেয়ে জোরে উট চালাচ্ছিল। উটের ওপর মহিলারাও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন বললেন, হে আনজাশা, আস্তে চালাও, কেননা তোমার পিঠে 'কাঁচ' রয়েছে। (বুখারী, হাদীস ৫৭০৯, ৫৭২১)

রাসূল্লাহ্ (স) নারীদের কাঁচের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এ ছিল রাসূলের নীতি। আজকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে রাসূলের এসব শিক্ষা আমরা ভুলে গিয়েছি। তাই বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এত বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ইসলামে নারীর অধিকার পুরুষের মতই। কুরআন বলছে, "পুরুষদের ওপর নারীর তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমন নারীদের ওপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

এ কথা সত্য যে, সম্পত্তির অধিকার, পরিবারের কর্তৃত্ব এসব বিষয়ে পুরুষের অধিকার বেশি। কিন্তু মোহরানার অধিকার, ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার, তালাকের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের জিম্মা পাওয়ার অধিকার নারীদের বেশি। সবকিছু বিবেচনা করে বলা যায় যে, ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকারের পার্থক্য অতি সামান্য।

আজকের বাংলাদেশের আর একটি দিক হচ্ছে, কথা ও কাজের অমিল। এটা সর্বপর্যায়ে বিরাজমান। রাসূলের জীবনে কথা ও কাজের কোন অমিল ছিল না। ইসলাম কথা ও কাজের অমিলকে 'মোনাফেকী' বলে থাকে। কুরআন বলছে ঃ "তোমরা এমন কথা কেন বলো যা তোমরা কর না?" (সূরা সাফ ঃ ২)

নবীর জীবন থেকে আমরা এ আদর্শটি গ্রহণ করতে পারি। তিনি ছিলেন আদর্শ নেতা। নৈতিকতার সর্বোচ্চ মানদণ্ড তিনি স্থাপন করে গেছেন।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির অন্য একটি দিক হচ্ছে অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়া। ইসলাম ও নবীর জীবন এ ব্যাপারে আমাদের পথ দেখায়। ইসলাম সৌন্দর্যের ভক্ত কিন্তু অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআনের ঘোষণা ঃ

"নিষেধ করা হয়েছে তোমাদের জন্য অশ্লীলতা।" (সূরা নহল ঃ ৯০)

অশ্লীল সাহিত্য, ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা অপরাধ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। তেমনিভাবে মদ ও জুয়াও অপরাধের সহায়ক, যা ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

অপরাধ দমনে নবীর মাধ্যমে পাওয়া ইসলামের শিক্ষা খুবই কাজে লাগতে পারে। ইসলাম হত্যা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির জন্য অপরাধীকে অত্যন্ত কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী। ইসলাম অপরাধের প্রকাশ্য শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী, যাতে জনগণের মধ্যে অপরাধের পরিণতি সম্পর্কে সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এসব নীতি আমরা গ্রহণ করে অপরাধ দমনে অগ্রগতি সাধন করতে পারি।

বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রেও নবীর থেকে পাওয়া শিক্ষাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। ইসলাম দারিদ্র্য দূর করতে চায়। কেননা নবী (স) বলেছেন, দারিদ্র্য মানুষকে অবিশ্বাসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ইসলাম উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চায়, কেননা ইসলাম জমি বা সম্পদকে অব্যবহৃতভাবে ফেলে রাখতে নিষেধ করেছে। ইসলাম কেবল ধনীদের মধ্যে যেন সম্পদ সীমাবদ্ধ না থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষকে আইনের আওতায় কর্ম ও ব্যবসার স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে যাকাতের উল্লেখ করা যায়। ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ করে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করতে চেয়েছে। এসব নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে গড়ে তুলে জনগণের অভাব ও দারিদ্র্য দূর করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট হয় যে, নবীর জন্মদিবসে তাঁর শিক্ষা স্মরণ করা আমাদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। নবীর জীবনী আমাদের জীবনকে আলোকিত করুক এ প্রার্থনা করি।

www.pathagar.com

হজ্জ, ঈদুল আযহা ও কোরবানি

আরবী ভাষায় 'হজ্জ' শব্দের অর্থ যিয়ারতের সংকল্প করা। যেহেতু মুসলমানরা কাবা শরিফ যিয়ারতের জন্যে পৃথিবীর চারদিক থেকে মক্কায় আসে, এ জন্যে ইসলামের এই মৌলিক ইবাদতের নাম রাখা হয়েছে হজ্জ।

হজ্জের প্রচলন হয় চার হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহিম (আ) হতে। তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈলকে অত্যন্ত অল্প বয়সে তাঁর মা হযরত হাজেরাসহ মক্কায় রেখে যান। আল্লাহ পাক মক্কার সে বিরান প্রান্তরে তাঁদের রক্ষা করেন এবং ক্রমে ক্রমে হযরত হাজেরার অনুমতিক্রমে মক্কায় জনবসতি গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) কাবা শরিফ প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"এবং স্মরণ কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকালে দোয়া করছিল প্রভু! আমাদের প্রচেষ্টা কবুল কর, তুমি সবকিছু জান ও শোন। প্রভু! তুমি আমাদের দু'জনকেই তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতি বানাও যারা একান্তভাবে তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদত করার পন্থা জানিয়ে দাও, আমাদের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (আল বাক্বারা ঃ ১২৭-২৮)

"মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘর (ইবাদতের জন্যে) নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তা ছিল মক্কার ঘর। এ ঘর অত্যন্ত পবিত্র, বরকতপূর্ণ এবং সারা জাহানের জন্য হেদায়াতের কেন্দ্রস্থল।" (সূরা আনকাবুত, ঃ ৯৬)

এ ঘরের হজ্জ করার জন্যেই আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ) মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ এবং স্মরণ কর! যখন ইবরাহীমের জন্যে এ ঘরের স্থান ঠিক করেছিলাম এবং এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, এখানে কোন শিরক করবে না এবং আমার এ ঘরকে তওয়াফকারী ও নামাযীদের জন্যে পাক-সাফ রাখবে। আর লোকদের হজ্জ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহ্বান জানাও।' (সূরা হজ্জ ঃ ২৬)

আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আহ্বানের ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের ইন্তেকালের অনেক পরে জাহেলিয়াতের যুগে হজ্জ অনুষ্ঠানে নানা কুসংস্কার ও অশ্লীলতা

www.pathagar.com

ঢুকে পড়ে। যেমন কাবা শরিফে মুর্তি রাখা হয়, লোকেরা উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতে শুরু করে, তাওয়াফের সময় হাততালি, বাঁশি বাজায় ও শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হতে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (স) এসব কুসংস্কার ও অশ্লীলতাকে আবার দূর করে তাওহীদের শিক্ষার ভিত্তিতে হজ্জকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ পাক প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরয ঘোষণা করেছেন।

মানুষের ওপর আল্লাহর এ অধিকার রয়েছে যে, যার এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে, সে যেন হজ্জ সম্পন্ন করে। আর যে এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে, তার জানা উচতি যে, আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন।' (সূরা আল ইমরান ঃ ৯৭)

এখানে সামর্থ্য অর্থ শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য। হযরত মুহাম্মদ (স) হজ্জকে ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের একটি বলে বর্ণনা করেছেন। কেননা হজ্জের অসংখ্য কল্যাণকারী দিক রয়েছে। হজ্জের কল্যাণকারী দিকের মধ্যে প্রথমেই মনে হয় যে, এ অনুষ্ঠান মুসলমানদের জন্যে একটি মহাসম্মেলন। দুনিয়ার অন্যান্য সম্মেলন কোন না কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর। অন্যান্য সম্মেলন হয় রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অথবা বৈজ্ঞানিক, লেখক, সাংবাদিক বা অন্য গোষ্ঠীর সম্মেলন। কোন সম্মেলনই সর্বব্যাপক ও সার্বজনীন নয়। হজ্জ হচ্ছে এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এ বাৎসরিক সম্মেলনে শরিক হয় সব দেশের, সব স্তরের বিপুল সংখ্যক লোক। এর মাধ্যমে মুসলিম জাতির ব্যাপক যোগাযোগের যে ব্যবস্থা আল্লাহ নিজে করে দিয়েছেন তার কোন তুলনা হয় না। এর মাধ্যমে সব কল্যাণকর ধারণা (আইডিয়া) মুসলিম বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। মুসলমানরা পরস্পরের সংহতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এতে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর হয় এবং মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে শরিকভিত্তিক যুক্তিসঙ্গত ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে। হজ্জ মুসলিম পুনর্জাগরণ, জ্ঞান বিস্তার, ব্যবসায়িক যোগাযোগ, রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবেলার প্লাটফরম হিসেবে কাজ করতে পারে। আজ হয়তো এসব ক্ষেত্রে হজ্জের পূর্ণ ব্যবহার মুসলিম জাতি করতে পারছে না। কিন্তু এ ধরনের অধিকতর ব্যবহারের সুযোগ ক্রমেই সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হজ্জ আমাদের কল্যাণের বড় ভিত্তি হতে পারবে। অবশ্য হজ্জকে কোন দেশ ও দলের বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা সঠিক হবে না। হজ্জে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অব্যাহত রেখেও আমরা সাময়িক গোষ্ঠীগত, রাজনৈতিক স্বার্থও অর্জনের চেষ্টা পরিহার করতে পারি। হজ্জের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট কারো কল্যাণ করবে না। এরকম করাকে কেউ সমর্থনও করতে পারবে না।

www.pathagar.com

হজ্জের অন্য বিরাট কল্যাণের দিক হচ্ছে মুসলিম জনতার ট্রেনিং। আজকাল সৌদি আরবের বাইরে থেকে প্রায় ১৫ লাখ লোক প্রতি বছর হজ্জ করে থাকে। যারা মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় তারা কোন আর্থিক স্বার্থের জন্যে তা করে না। কিছু লোক ব্যতিক্রম হয়ে থাকলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অন্তত এক দু'মাসের জন্যে এসব হজ্জ যাত্রীকে বাড়ি থেকে দূরে থাকতে হয়। এ সময় তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত থাকে। এর ফলে তাদের মন-মানসিকতায় স্বাভাবিকভাবে অনেক পরিবর্তন আসে। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তাদের দীনহীনতার কথাই তাদের মনে হয়। মিনাতে পাথর মারার সময় তারা প্রকৃতপক্ষে নিজের মনের শয়তানকেই পাথর মারে। আরাফাত, মুজদালিফা ও মিনাতে লাখ লাখ হাজী একত্রে অবস্থান করে। এর মাধ্যমে তারা ধৈর্য, সহনশীলতা ও মিলেমিশে থাকার শিক্ষা পায়। সবকিছু মিলে হজ্জকে পবিত্রতা অর্জনের এক বিরাট ট্রেনিং বলা যায়। প্রতি বছর মুসলিম সমাজ এভাবে একদল নতুন লোক পায়, যাদের ভাল থাকার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে অবশ্যই অনেকের জীবন পরিবর্তিত হয়ে যায়, যা নিঃসন্দেহে সমাজের জন্যে কল্যাণকর।

ঈদুল আযহা

হজ্জের সাথে ঈদুল আযহার নিকট সম্পর্ক। মক্কায় যখন হজ্জ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে সময় সারা মুসলিম বিশ্বে ১০ই জিলহজ্জ ঈদুল আযহা পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হজ্জের আনন্দে ও ইবাদতে সারা বিশ্বের মুসলিমকে একাত্ম করা। ঈদুল আযহায় একত্রে জামায়াতে দু'রাকায়াত নামায আদায় করতে হয়। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা সম্বন্ধে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী (স) যখন মক্কা থেকে মদিনা এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, লোকেরা বছরে দু'টি নির্দিষ্ট দিনে খেলাধুলা ও আনন্দ উপভোগ করে। নবী (স) বলেন যে, আল্লাহ এ দু'টি দিনের পরিবর্তে দু'টি উৎকৃষ্টতর দিন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। একটি ঈদুল ফিতরের দিন এবং অন্যটি ঈদুল আযহার দিন। (দ্রষ্টব্য ঃ আসান ফিকাহ, ১ম খণ্ড; মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী, প্রকাশক, আধুনিক প্রকাশনী)

কোরবানি

ঈদুল আযহার দিন মুসলিম জাতি কোরবানি করে থাকে। ঈদ অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে নবী (স)-এ কোরবানির বিধান দেন। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ তিরমিযী-তে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হতে

www.pathagar.com

বর্ণিত হয়েছে, "নবী করীম (স) মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। এই সময় তিনি প্রতি বছরই কোরবানি করতেন।"

ফিক্হ'র গ্রন্থে কোরবানি ওয়াজিব অথবা সুন্নাত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নববী তার মুসলিম শরীফের ভাষ্যে লিখেছেন, সামর্থ্যবান ব্যক্তির (অর্থাৎ যাকে যাকাত দিতে হয়) জন্য কোরবানি ওয়াজিব না সুন্নাত এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। অধিকাংশের মতে, কোরবানি সুন্নাত। এঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক, বেলাল, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, আলকামা, আসওয়াদ আতা, মালিক, আহ্মদ, আবূ ইউসুফ, ইসহাক প্রমুখ। ইমাম আবূ হানিফা, আওজায়ী, রাবিয়া প্রমুখ একে ওয়াজিব মনে করেন।

(সহীহ মুসলিম, উর্দু অনুবাদ, ইমাম নববীর টীকাসহ প্রকাশক ঃ মালিক গোলাম আলী এন্ড সন্স, করাচী)।

ঈদ অর্থ আনন্দ-উৎসব। এ আনন্দ উৎসবের প্রয়োজনেই কোরবানির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় আনন্দ অনুষ্ঠানে ভোজের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (স) কোরবানির ঘটনাকে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক হযরত ইসমাঈলকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি করতে উদ্যত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত করে দিয়েছেন। এর ফলে আমরা কোরবানিকে যেমন আল্লাহর জন্য মহাত্যাগের প্রস্তুতি বলে গণ্য করতে পারি, তেমনিভাবে আনন্দ উৎসবের অংশ বলেও গণ্য করতে পারি।

কোরবানির জন্যে বিশ্বে এখন পর্যন্ত কোন পশু সংকট দেখা দেয়নি। কোরবানির কারণে বরং পশু পালন বৃদ্ধি পায় এবং যারা ব্যবসা করেন তারা উপকৃত হন। তবে যদি সত্যিই কোন সময় কোন দেশে পশু সংকট দেখা দেয়, তাহলে সে দেশের শ্রেষ্ঠ আলেম অথবা ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ফিক্হ একাডেমীর (যাতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ রয়েছেন) পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

ঈদের কিছু বৈশিষ্ট্য

ইসলামে ঈদ নানাদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ঈদে প্রত্যেক মুসলিমের তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের সব সাফল্যের জন্য উৎসব পালন। প্রথম ঈদ হচ্ছে রমযানের রোযা রাখার দায়িত্ব পালনে সাফল্যের জন্য। দ্বিতীয় ঈদ হচ্ছে মক্কায় হজ্জ পালন সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার, যে হজ্জ দুনিয়ার দৈনন্দিন বিষয়সমূহ প্রয়োজনে পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহর আহ্বানের দিকে সাড়া দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

www.pathagar.com

প্রত্যেক ঈদ হচ্ছে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা। এ শোকরিয়া হচ্ছে আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালনের। এ শোকারিয়া অধ্যাত্মিকতা প্রকাশের মাধ্যমে হয় না। এর অনেক মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের দিক আছে। সাধারণত ঈদুর ফিতরের পর দরিদ্র জনগণকে সাদকা দেওয়া হয়। তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে এবং তাদের জীবনে শরীক হয়ে থাকে। ঈদুল আযহায় মুসলিমগণ কোরবানি দিয়ে থাকে। যার গোশ্ত সাধারণত গরীব জনগণ এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করা হয়। ঈদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এভাবে জনগণের সাথে শরীক হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

প্রত্যেক ঈদ হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করার দিন। মুসলিম জনগণ সব সময় সকল আনন্দ আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে শুরু করে থাকে অর্থাৎ ঈদের ক্ষেত্রে সালাত বা নামায আদায় করে। তারা নামায আদায় করে এবং আল্লাহর তাকবীর বা শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে। এর সাথে সাথে তারা তাদের দোয়ায় মৃতদের স্মরণ করে। তারা রোগী ও দুস্থদের কথাও স্মরণ করে এবং তাদের দেখতে যায়। এ সবই ইসলামের মূল শিক্ষার অংশ।

ঈদ একটি বিজয়ের দিন। প্রত্যেক ব্যক্তি যে সঠিকভাবে তার আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে, সে ঈদে নিজেকে বিজয়ী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এ বিজয় হচ্ছে নিজের কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তির দুর্বলতাকে বিজয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের বিজয়।

প্রত্যেক ঈদ হচ্ছে এক অর্থে ফসল কাটার দিন। কেউ এ দিনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানসিক শান্তি অর্জন করবে, আবার কেউ ন্যায়ভাবে আর্থিক সাহায্য লাভ করবে। এ অর্থে এদিন হচ্ছে কোন না কোনভাবে সাফল্য অর্জনের দিন।

ঈদ হচ্ছে ক্ষমার দিন। ঈদের জামায়াতে যারা শরীক হয় তাদের মধ্যে একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ঘটে। এই সুযোগে পুরোনো শত্রুতার অবসান ঘটে এবং হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়, যদি কেউ ঈদের বাণীকে সঠিকভাবে গ্রহণ করে।

প্রত্যেক ঈদ হচ্ছে শান্তির দিন। ব্যক্তি মাত্রই তার দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে একাত্মতায় বিলীন হতে পারে। কেউ যদি নিজে শান্তি পায় তাহলে সে দুনিয়াকে দিতে পারে।

এসব হচ্ছে ঈদের প্রকৃত অর্থ। এটা হচ্ছে ইসলামের দিন, যা আল্লাহর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝার দিন।

www.pathagar.com

কোরবানির ঈদ প্রসঙ্গে

গত ঈদের কিছু অভিজ্ঞতার কারণে ঈদুল আযহার পূর্বেই কিছু কথা লিখা প্রয়োজন। ঢাকার কোন এক মহল্লার এক ধনী শিল্পপতি বাইশটি গরু কোরবানি করেন। এসব গরুর প্রত্যেকটির মূল্য ছিল দশ হাজার টাকা বা তার বেশি। তার সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বলেছিলেন যে, এসব গরুর গোশত তিনি তার কয়েকটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা তারা সম্ভবত সারা বছর গোশত খেতে পারে না।

এসত্ত্বেও এ ঘটনায় পাড়ার ছেলেদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ সে শিল্পপতির বাড়ির সামনে ছিল একটি বস্তি। তাতে না আছে শিক্ষার বন্দোবস্ত, না আছে চিকিৎসা ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা। এসব ছেলেরা মনে করেছিল যে এ শিল্পপতি যদি একটি গরু কোরবানি করে বাকি অর্থ দিয়ে সেই বস্তির লোকদের স্বাবলম্বী করতেন অথবা তাদের চিকিৎসা বা পানির সুবন্দোবস্ত করে দিতেন তাহলে বরং বেশি কল্যাণ হতো। কেননা কারো পক্ষে একটির বেশি কোরবানিকে মুস্তাহাব গণ্য করা যায় অথচ বঞ্চিত জগণের খেদমত করা বা তাদের উপকার করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। এ ধরনের ফরযকে 'ফরযে কেফায়া' বা সমাজের অবশ্য করণীয় দায়িত্ব গণ্য করা হয়।

আমাদের নবী (স) তাঁর সারা জীবনে ঈদুল আযহায় একটি বা দুটি দুম্বা বা ছাগলের বেশি কোরবানি দেননি (সহীহ মুসলিম, সহীহ বুখারী)।

মুসলিম শরীফের হাদীসে একটি দুম্বা কোরবানির পর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দোয়া এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"হে আল্লাহ, এ কোরবানিকে মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পরিবার ও মুহাম্মদের উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল কর (মুসলিম, কোরবানি অধ্যায়)।"

তাহলে আমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (স) থেকেও বেশি 'মুত্তাকী' হয়ে গেছি যে, দেশের পরিস্থিতির বিচার বিবেচনা না করে যে সংখ্যক গরু মনে চায় তাই কোরবানি করছি।

www.pathagar.com

কোরবানি সম্পর্কে আলেমদের মতামত কি? এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী লিখছেন, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির (অর্থাৎ যাকে যাকাত দিতে হয়) জন্য কোরবানি ওয়াজিব বা সুন্নাত। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। অধিকাংশের মতে কোরবানি সুন্নাত। এদের মধ্যে রয়েছেন; হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, বেলাল, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, আলকামা, আসওয়াদ, আতা, মালিক, আহ্‌মদ, ইসহাক প্রমুখ। ইমাম আবু হানিফা, আওজায়ী, লাইস ও রাবিয়া প্রমুখ একে ওয়াজিব মনে করেন। (সহীহ মুসলিম, উর্দু অনুবাদ, ইমাম নববীর টিকাসহ, মালিক গোলাম আলী এন্ড সন্স, করাচী কর্তৃক প্রকাশিত, কোরবানি অধ্যায়)

www.pathagar.com

জুমআর খুৎবার মান উন্নয়ন

দীর্ঘদিন যাবত জুমআর খুৎবা শুনে আমার ধারণা জন্মেছে যে, অধিকাংশ মসজিদে ব্যবহৃত খুৎবার পুস্তকসমূহের মান উচ্চ পর্যায়ের নয় এবং আমাদের যুগের জন্য পুরোপুরি উপযোগী নয়। মুসলিম জাতির নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মান উন্নয়নে জুমাআর খুৎবা ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের উচিত স্থানীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে উন্নত মানের খুৎবার পুস্তক তৈরি করা। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে প্রচলিত খুৎবার পুস্তকসমূহ পূর্বের যুগের আলেমদের তৈরি করা বলে সেগুলোর পরিবর্তে আরও উন্নত পুস্তক তৈরি এবং ব্যবহার বৈধ ও যুক্তিসংগত। আমি আনন্দিত হয়েছি যে, ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী-এর অধীনে একটি খুৎবার পুস্তক প্রকাশ করছে, যাতে ১৮টি খুৎবা রয়েছে। আরও পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেবগণকে ঈদে এবং জুমআতে নির্বাচিত খুৎবা নামে এ পুস্তকটি ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করছি। উল্লেখ্য বাংলাদেশের একদল প্রখ্যাত আলেম এ বইটি রচনা করেন।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র একটি পরিচিত শব্দ। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্বে একটি স্বীকৃত ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা। অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন মতামত। বিভিন্ন ইসলামী দলের এজেন্ডায় রয়েছে গণতন্ত্রের কথা, অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। আবার এমনসব দল বা ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যায়, যারা গণতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত মনে করেন না, কেননা গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আমাদের সূক্ষ্ম ও গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শব্দগত মারপ্যাচের উর্ধ্বে গিয়ে বিষয়টি ভালভাবে বোঝা দরকার। আমরা দেখছি আধুনিক বিশ্বে ইসলামী দলসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ, ইসলামী পণ্ডিতগণ এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন যেখানে সরকার পার্লামেন্টের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করবে। সকলের মত প্রকাশের অধিকার তথা ভোটাধিকার থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা থাকবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে, মৌলিক মানবাধিকার রক্ষিত হবে ইত্যাদি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলা হয় তখন তার পূর্বশর্ত হিসেবে এসবের কথাই বলা হয়। অর্থাৎ গভীর বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামী দলগুলোর সরকার ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গঠন কাঠামো একই ধরনের।

তত্ত্বগতভাবে বলা যায় যে, কেবল সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে যেখানে ইসলামে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মুখ্য সেখানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। যদিও এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না যে সার্বভৌমত্বের ধারণা পাশ্চাত্যে এক রকম নয়। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ রকম কথা বলেছেন যে, সার্বভৌমত্বের ধারণার কোন প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তকে সার্বভৌমত্বের ধারণাকে তেমন গুরুত্বের সাথে আলোচনাও করা হয় না। তবে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে সার্বভৌমত্ব শব্দটির আপত্তি সম্পর্কে এ সময়ের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ 'আল্লামা ইউসুফ আল

www.pathagar.com

কারযাভী' রচিত 'Priorities of The Islamic Movement in The Coming Phase' বইয়ের 'The Movement and Political Freedom and Democracy শীর্ষক আলোচনার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করছি ঃ

The fear of some people here that democracy makes the people a source of power and even legislation (although legislation is Allah's alone) should not be heeded here, because we are supposed to be speaking of a people that is Muslim in its majority and has accepted Allah as its Lord, Mohammad as its Prophet and Islam as its Religion. Such a people would not be expected to pass a legislation that contestable Islam and its incontestable principles and conclusive rules. Any way these fears can be over come by one article (in the constitution) that any legislation contradicting the incontestable provisions of Islam shall be null and void.

অনুবাদ ঃ কিছু সংখ্যক মানুষের ভয় গণতন্ত্র মানুষকে ক্ষমতার উৎসে পরিণত করে এবং আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেয় (যদিও আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার), তার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত হবে না। কারণ আমরা এমন এক মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে কথা বলছি যারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আল্লাহকে তাদের প্রভু হিসেবে, মুহাম্মদ (স)-কে তাদের নবী এবং ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছে। আশা করা যায়, এ ধরনের মানুষ এমন আইন প্রণয়ন করবে না, যা ইসলামের অকাট্য নীতি ও সিদ্ধান্তমূলক আইনের পরিপন্থি হবে। যা হোক এ ব্যাপারে সকল ভয় দূর করা যেতে সংবিধানে একটি ধারা যোগ করে যে ইসলামের অকাট্য বিধান ভঙ্গ করে কোনো আইন করা যাবে না।

এছাড়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ তথা উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে মহাকবি 'ড. আল্লামা স্যার মুহাম্মাদ ইকবাল এর মতামত হচ্ছে এরকম ঃ

"ইসলাম গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়েছিল যে, বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারক ও বাহক হল উম্মত এবং যেসব কার্যক্রম নির্বাচকমণ্ডলী তাদের নেতা নির্বাচনের নিমিত্ত গ্রহণ করে তার অর্থ শুধু এই যে, তারা তাদের সম্মিলিত ও স্বাধীন নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা উক্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এমন একজন নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মাঝে ন্যস্ত করে দেয়, যারা তাকে উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে। ইসলামী আইন প্রণয়নের ভিত্তি মিল্লাতের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি ও যৌথ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত।'

www.pathagar.com

('ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', লাহোর ১৯১০-১৯১১, দ্রষ্টব্য ঃ 'মহাকবি ইকবাল', ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৩৪)

আমরা দেখছি যে অনেক ইসলামী পণ্ডিত গণতন্ত্র শব্দকে শর্তসাপেক্ষে ইসলামের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। 'ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন' এর 'মহাকবি ইকবাল' বইতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লামা ইকবাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন যে গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। 'রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম'-এর ৬ষ্ঠ ভাষণে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে ইকবাল আরো বলেন, "ইসলামী রাষ্ট্র স্বাধীনতা, সাম্য এবং স্থিতিশীলতার চিরন্তন বিধানসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির নীতিমালা শুধু ইসলামের মৌলিক ভাবধারার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং যে সব শক্তি মুসলিম বিশ্বে কার্যরত রয়েছে তাকেও সুসংহত করা অপরিহার্য।" (দ্রষ্টব্য ঃ 'মহাকবি ইকবাল', লেকক ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৩৫)

ইকবালের মতে, গণতন্ত্রের ভিত্তি যদি রূহানী ও নৈতিক হয় তাহলেই তা হবে সর্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক পদ্ধতি। ইসলামী রাষ্ট্রকে এ কারণেই তিনি 'রূহানী গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইংরেজি পত্রিকা 'নিউ এরার' ২৮ জুলাই ১৯১৭ সালের সংখ্যায় লেখেন, 'ইউরোপে গণতন্ত্র অধিকাংশ ইউরোপীয় সমাজসমূহের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ থেকে জন্ম নেয়। কিন্তু ইসলামী গণতন্ত্র অর্থনৈতিক সুযোগের সম্প্রসারণ থেকে উৎপন্ন হয় না; বরং এটা একটি রূহানী নীতি, যা ঐ কথার ভিত্তিতে এসেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলো সুপ্ত শক্তির এমন একটি আধার, যার সম্ভাবনাসমূহকে এক বিশেষ গুণ ও চরিত্রের দ্বারা উন্নত করা যেতে পারে।' (দ্রষ্টব্য ঃ 'মহাকবি ইকবাল', ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, পৃষ্ঠা-২৩৯)

অর্থাৎ ইসলাম এমন এক গণতন্ত্র দিয়েছে যা আল্লাহর আইনের অধীন।

অন্যদিকে আমরা দেখি মাওলানা মওদূদী পঞ্চাশ বছর পূর্বে তার 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' বইতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য The-Democracy শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি Democracy বা গণতন্ত্র শব্দটি পরিত্যাগ করেননি বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে তাকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তার জীবনের শেষ অধ্যায়ে প্রদত্ত বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

করাচীর 'আখবারে জাহান' পত্রিকায় ১৯৬৯ সালের ২রা এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইন্টারভিউয়ে তিনি বলেন, "ইসলাম ও গণতন্ত্র পরস্পরের

www.pathagar.com

বিরোধী নয়। গণতন্ত্র সেই শাসনব্যবস্থার নাম, যেখানে জনমতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত, পরিচালিত ও পরিবর্তিত হয়। ইসলামী শাসনব্যবস্থাও তদ্রূপ। তবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভিন্ন। কেননা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র লাগামহীন হয়ে থাকে। জনগণের রায় হালালকে হারাম করে দিতে পারে, যেমন বৃটেনে হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে ইসলামী গণতন্ত্র কুরআনও হাদীস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। গোটা জাতি চাইলেও ইসলামের সীমানার বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সমাজতন্ত্র এর ঠিক বিপরীত। সমাজতন্ত্র একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের নাম। তার রয়েছে নিজস্ব আকীদা বিশ্বাস, দর্শন ও নৈতিকতা। ইসলামের সাথে তার কোনোই মিল নেই। (দ্রষ্টব্য ঃ মওলানা মওদূদীর সাক্ষাৎকার, আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৬৩)

লন্ডনের মাজাল্লাতুন গুরাবা পত্রিকায় ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইন্টারভিউয়ে তিনি বলেন, "যুগের লোকদের কথা বুঝানোর জন্য আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করা তো অপরিহার্য। তবে এগুলো ব্যবহারে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোনো কোনো পরিভাষা বর্জন করা ভালো, এবং ওয়াজিব, যেমন সমাজতন্ত্র। আর কোনো কোনোটার ব্যবহার এ শর্তে জায়েয যে, তার ইমলামী তাৎপর্য ও পাশ্চাত্য তাৎপর্যের পার্থক্য পুরোপুরিভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন গণতন্ত্র, সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও সংসদীয় পদ্ধতি। (দ্রষ্টব্য ঃ মওলানা মওদূদীর সাক্ষাৎকার, আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৫৫)

আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি, পাকিস্তানে যখন বিশ্বের প্রথম ইসলামী সংবিধান রচিত হচ্ছিল তখন তার মধ্যে গণতন্ত্র শব্দটি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে আলেমদের সমর্থনে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে শাসনতন্ত্রের ভূমিকা আলেমরাই প্রণয়ন করেছিলেন প্রথমত একটি আদর্শ প্রস্তাবনা রূপে। এই ভূমিকায় গণতন্ত্রের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে ঃ

Wherein the principles of democracy freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed.

অনুবাদ ঃ যেখানে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা নীতি ইসলামে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পুরোপুরি সেভাবে মান্য করা হবে। (দ্রষ্টব্য ঃ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা)

www.pathagar.com

Wherein the principles of democracy freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, should be fully observed.

অনুবাদ ঃ যেখানে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা নীতি ইসলামে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পুরোপুরি সেভাবে মান্য করা হবে। (দ্রষ্টব্য ঃ ১৯৭৩ সালের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা)

অর্থাৎ ইসলাম গণতন্ত্রকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তা সেভাবেই অনুসৃত হবে। এর অর্থ হচ্ছে আলেমগণ, ইসলামী রাজনীতিকগণ শর্তসাপেক্ষে গণতন্ত্র শব্দটি, গণতন্ত্র পরিভাষাটি এবং তা দ্বারা যা বোঝায় তা গ্রহণ করেছেন। আমরা আরো দেখতে পাই যে, আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী তার Priorities of The Islamic Movement in the Coming Phase, বইয়ের একটি আলোচনার শিরোনাম করেছেন, 'The Movement and Political Freedom and Democracy.' তিনি এতে দেখিয়েছেন যে, ইসলাম কোন স্বৈরাচার এবং রাজতন্ত্র সমর্থন করে না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, Political Freedom এর মধ্যেই ইসলাম বিকশিত হয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, যদিও ইসলাম গণতন্ত্র থেকে ব্যাপক একটি বিষয়, একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, তথাপি তিনি গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেন এবং ইসলামে মানুষের জন্য যে সকল মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা গণতন্ত্রের মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব। তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে লিখেছেন। তবে যারা ভয় পায় যে, গণতন্ত্রের নামে ইসলাম বিরোধী আইন প্রণীত হতে পারে, তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য সংবিধানে 'কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাশ করা যাবে না' এমন ধারা সংযোজনের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন,

"However, the tools and guaranties created by democracy are as close as can ever be to the realization of the political principles brought to this earth by Islam to put a leash on the ambitions and whims of rulers. These principles are: shura (consultation), good advice enjoining what is proper and forbidding what is evil, disobeying illegal orders, resisting unbelief and changing wrong by force whenever possible. It is only in democracy and political freedom that the power of Parliament is evident and that people's deputies can withdraw confidence from any government that breaches the Constitution, and it is only in such an environment that strength of free Press, free Parliament, opposition and the masses is most felt.

www.pathagar.com

অনুবাদ ঃ যাহোক, গণতন্ত্র যে সকল নীতি ও নিশ্চয়তা দান করেছে তা শাসকদের উচ্চাশা ও খেয়ালীপনার ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ আরোপের নিমিত্তে ইসলাম পৃথিবীতে যে সকল রাজনৈতিক নীতির অবতারণা করেছে তার নিকটতম। এ সকল নীতিসমূহ হচ্ছে, শূরা (Consultation), নসীহত (পরামর্শ প্রদান), যা সংগত তার আদেশ দেওয়া, যা খারাপ তা বর্জন করা, অবৈধ আদেশসমূহ অমান্য করা, নাস্তিকতা প্রতিরোধ করা এবং যখনই সম্ভব শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবিধান করা। স্বাধীন রাজনৈতিক পরিবেশ এবং গণতন্ত্রেই কেবল সংসদীয় পদ্ধতির বৈধতা ও ক্ষমতা স্বীকৃত এবং জনগণের প্রতিনিধিগণ যে কোন সরকারের ওপর সংবিধান লংঘনের অপরাধে অনাস্থা স্থাপন করতে পারেন এবং এটা (গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা) এমন একটি পরিবেশ যেখানে স্বাধীন সংবাদপত্র, নিরপেক্ষ সংসদ, বিরোধী দলের অবস্থান এবং জনসাধারণের মতামত সর্বাপেক্ষা প্রতিফলিত।

(দ্রষ্টব্য ঃ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাবি রচিত "Priorities of The Islamic Movement in The Coming Phase" বইয়ের "The Movement and Political Freedom and Democroacy" শীর্ষক আলোচনা)

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিম জনগণ ভোটাধিকার, আইনের শাসন এবং জনগণের নির্বাচিত সরকারই চায়। এসব বোঝাবার জন্যই আজকাল 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সার্বিক প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, শর্তাধীনে 'গণতন্ত্র' শব্দ গ্রহণ করার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে পাশ্চাত্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে যে ইসলাম আগ্রাসী এবং একনায়কত্ববাদী (Violent, Authoretarian) —এসব দূর হবে। মুসলিম বিশ্বেও এর ফলে রাজা বাদশাহ ও স্বৈরশাসকগণ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন শাসনতন্ত্র এবং বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইতোমধ্যেই শর্তসাপেক্ষে 'গণতন্ত্র' পরিভাষাটি গ্রহণ করেছেন। এটাই সংগত এবং মুসলিম জনগণ এ মত গ্রহণ করতে পারে। আমরা আশা করি এ আলোচনা 'গণতন্ত্র' পরিভাষা সম্পর্কে বিতর্ক দূর করতে সাহায্য করবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ

বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম এবং ইসলামে বিশ্বাসী জনগণের ভূমিকাই মুখ্য। আদর্শভিত্তিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের তেমন কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। এর মূল কারণ ইসলামের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ ইত্যাদি সবই রয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল পণ্ডিতই একমত পোষণ করেন যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জন্যই ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর কেবল মুসলিম লেখকগণই নন অমুসলিম পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও শত শত বই লিখেছেন। এসব লেখার ক্ষেত্রে মার্কসবাদী ও সমাজবাদীরাও বাদ যাননি।

ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। যারা ইসলামকে সরাসরি আক্রমণ করতে চান না অথবা রেখে ঢেকে বলতে চান, তারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শ্লোগান তোলেন। কিন্তু এটি হচ্ছে আসল বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়ার একটি দুর্বল প্রচেষ্টা। আবার প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনার জন্য একটি আদর্শের প্রয়োজন রয়েছে কিনা। এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়, কোন রাষ্ট্রের যদি উন্নতি করতে হয়, তবে সে জাতির একটি দিক-নির্দেশনা ও আদর্শের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গণ্য হবার অধিকার নিঃসন্দেহে অন্য যে কোন কিছুর তুলনায় ইসলামের অনেক বেশি রয়েছে। কেননা, এ দেশের শতকরা ৯০ জন লোক কেবল মুসলিমই নন, তারা ইসলামকে জাতীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, দাবি জানাচ্ছেন; ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের এবং আলেমদের কর্তৃক অনুষ্ঠিত হাজার হাজার ইসলামী সভা ও তাফসীর মাহফিলই তার প্রমাণ। কোন কোন মাহফিলে কয়েক লক্ষ লোক উপস্থিত হয়ে সামাজিকভাবে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে থাকেন। মুসলিম নামধারী কিছু মুসলমান, যারা ইসলামের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, এরকম কিছু লোক অবশ্যই এর থেকে বাদ পড়তে পারে।

এ দেশের শতকরা ১০ জন লোক মুসলিম নন, এই বিষয়টি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কোন অজুহাত হতে পারে না। আদর্শবাদীরা নিজেরাই

www.pathagar.com

জানেন যে, যেসব দেশে কমিউনিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেসব দেশে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা শতকরা দুই বা তিনজনের বেশি নয়। অথচ বাংলাদেশে মুসলিম মিল্লাতের সদস্য সংখ্যা শতকরা ৯০ জন। এ কারণে বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শের বিরোধিতা করা কোন সমাজতন্ত্রীর পক্ষে মানায় না এবং তা যুক্তিযুক্ত নয়।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে ইসলামে বিশ্বাসী জনগণই রাজনীতির ক্ষেত্রে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তারাই কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এসব দলের কোন কোনটি এখন জতীয় পার্টিতে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। এটি একটি ঐতিহাসিক মিথ্যাচার যে, বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ সনে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ১৯৭০ সনের নির্বাচনের ম্যান্ডেট ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল না। এজন্যেই ১৯৭২ সনের প্রণীত সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত মূলনীতিটি পরিবর্তন করে 'আল্লাহ্‌র ওপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস'কে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শাসনতন্ত্রের ৮ (১ক) ধারায় আল্লাহ্‌র ওপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসকে রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজের ভিত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত গণভোটের (রেফারেন্ডাম) মাধ্যমে জনগণ এই সংশোধনীকে বিপুলভাবে সমর্থন করে। তৎকালীন সরকার নিজে থেকে এ পরিবর্তন করেননি, এ পরিবর্তন ছিল ব্যাপক গণ-ইচ্ছারই প্রতিফলন। এজন্যই পরবর্তীকালে শাসনতন্ত্রের 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' ও 'আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস', এ সংযোজন দুটি তুলে দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর পক্ষে কোন গণদাবিও নেই।

কেউ কেউ ইবনে খালদুনকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তা হিসেবে হাজির করেছেন। এ তথ্যটি মোটেও যথার্থ নয়। ইবনে খালদুন ছিলেন সমাজবিজ্ঞানের স্রষ্টা। তিনি ছিলেন আলেম, ফকীর ও ইতিহাসবেত্তা। তিনি ইসলামী খিলাফতের প্রধান বিচারক হিসেবেও অনেক দিন কাজ করেছেন। তৎকালীন রাষ্ট্রের ভিত্তি ও আইন ছিল ইসলাম। বিচারপতি হিসাবে তার দায়িত্ব ছিল সেই আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তিনি তা-ই করে গেছেন। তাঁর যুগে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধারণা অজ্ঞাত ছিল। ইবনে খালদুনের মতো একজন বিশ্বখ্যাত আলেমকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হিসেবে পেশ করা অজ্ঞতারই নামান্তর।

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শের শিকড় অত্যন্ত গভীরে ভিত্তিবদ্ধ। এদেশের জনগণ ঐতিহাসিকভাবেই তাদের সত্তার সঙ্গে, তাদের চেতনার সঙ্গে ইসলামকে আঁকড়ে আছেন।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক চিন্তাধারার এক অধ্যায়

রাজনৈতিক ইতিহাস জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কলেজ স্তরে সামান্য কিছু আলোচনা হলেও একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেই রাজনৈতিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গভাবে পড়ানো হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই ইতিহাসের নামে যা পড়ানো হয় তাতে রয়েছে মৌলিক গলদ। কেননা, রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা সব সময়েই বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া উচিত। কেবলমাত্র কোন একটি বা দু'টি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে এই ইতিহাসের নামে শুধু পশ্চিমের চিন্তাধারাই শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য দেশ ছাড়া অন্য কোন জাতির ও অন্য কোন দেশের রাজনীতি প্রবাহের ওপর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। মনে হয় যেন রাজনৈতিক চিন্তা ও তার অনুশীলনে একমাত্র পশ্চিমের লোকদেরই অবদান রয়েছে। প্রাচ্যের কোন দার্শনিকই বুঝি এ সম্পর্কে চিন্তা করেননি কোনদিন। এই এক-দেশদর্শীতার হয়ত বা কিছু কিছু কারণও দর্শানো যেতে পারে, কিন্তু কোন যুক্তিতেই শুধুমাত্র পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পটভূমিকায় লেখা রাজনৈতিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

এক্ষেত্রে উল্লিখিত সীমিত চিন্তাধারার আলোচনার ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের প্রথম পড়ানো হয় গ্রীক রাজনীতির কথা। বিশেষ করে সক্রেটিস, এরিস্টটল ও প্লেটোর চিন্তাধারা। তাদের পূর্বাপর অনেক দর্শন এবং গ্রীক সমাজের সাধারণ অবস্থাও তার সাথে গুরুত্বসহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এ যুগের পর আসে রোমান রাজনৈতিক ইতিহাস, বিশেষ করে সিসেরুর রাজনৈতিক মতবাদ। প্রসঙ্গত রোমান আইনের ওপরও আলোকপাত করা হয়। অতপর খ্রিস্টীয় যুগের আরম্ভ। এ পর্যায়ে এসে প্রধানত অগস্টাইন, এমবোর্জ, গ্রেগরি প্রমুখ খ্রিস্টান যাজকদের সঙ্গে এদের দর্শনের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে। এ যুগের শেষ সীমা খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক অবধি। পঞ্চম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় চিন্তাজগতে কোন প্রতিভাবান রাজনৈতিক চিন্তাবিদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় না, নতুন কোন রাজনৈতিক তত্ত্বেরও সন্ধান মেলে না। সর্বশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর সাধু টমাস একুনাহ ও পদুয়ার মার্সিলিও থেকে

www.pathagar.com

আধুনিক কাল পর্যন্ত পশ্চিমের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পড়ানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয়বাদ আন্দোলন বা কনসিলিয়ার মুভমেন্ট বিশেষ প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে গতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং আমরা দেখতে পাই একের পর এক মেকিয়াভেলী, মন্টেস্ক, হব্‌স, লক, রুশো প্রমুখ আরো অনেক রাজনীতিবিদকে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীর কিয়দংশ ছাড়া পঞ্চম শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত এক বিরাট রাজনৈতিক শূন্যতা। এই সুদীর্ঘ সময়ে সাধারণভাবে রাজনৈতিক চিন্তা সামান্যই ছিল; যা ছিল তা-ও অত্যন্ত দুর্বল স্তরের। এ কারণেই দেখতে পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দীর সাধু একুনাহ, পদুয়ার মার্সিলিও-এর দর্শন এবং সমন্বয়বাদী আন্দোলন—সবই গীর্জা ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের মত সাধারণ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে প্রবলভাবে আলোচিত হয়েছে। যদিও এ সমস্যা রাজনীতির মূল অধ্যায়ে পড়ে না, তথাপি ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এই সামান্য ব্যাপারকেই খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখেছেন। এসব কারণে মধ্যযুগকে, বিশেষ করে আদি মধ্যযুগকে ইউরোপীয় রাজনীতিবিশারদরাই অরাজনৈতিক যুগ বা আন্‌পলিটিক্যাল এজ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আসলে তাদের এই মন্তব্য সত্য কিনা তার যৌক্তিকতা বিচার করা দরকার। এ বিচার গোটা দুনিয়াকে সামনে রেখেই করা উচিত। আমাদের মতে উপরের মন্তব্য শুধু ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, সারা বিশ্বের জন্য সত্য নয়।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ঊষর আরব মরুর বুকে এক বিপ্লব এসেছিল, যা অনেক দিক থেকে ছিল অনন্য, অভূতপূর্ব। এ বিপ্লবের পুরোধা আল্লার রাসূল হযরত মুহম্মদ (স)। এ বিপ্লব অন্য যে কোন বিপ্লবের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। চিন্তা ও মতবাদের ক্ষেত্রে ইসলাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলো, বিশেষ করে রাজনৈতিক দর্শন ও চিন্তাধারায়। পুরাতন রাজনীতির ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেওয়া হল, উঠে দাঁড়াল এক নব রাজনৈতিক আলোড়ন। নতুন নতুন পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন সৃষ্টি হল এ যুগে। এ বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল থিওরি ও প্র্যাকটিস্ বা আদর্শ ও বাস্তবায়নের সমান্তরাল অগ্রগতি। থিওরির সাথে সাথে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন কায়দা-কানুন, শাসন-সংবিধান এবং বাস্তবে হয়েছে তার রূপায়ণ। কুরআনে যে রাজনৈতিক মতবাদ ঘোষিত হল, পরবর্তীকালে তারই বিভিন্নমুখী বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে বিভিন্ন দার্শনিকের হাতে। আল মাওয়ার্দী, ইমাম গাযালী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম,

www.pathagar.com

ইবনে রুশদ, ইবনে খালদুন ও আল-ফারাবীর ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের বিস্তৃত চিন্তাধারা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পর্যালোচনা সম্ভব নয়। তবে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। দশম শতাব্দীর বিখ্যাত আইনবিদ আল মাওয়ার্দী অনেক বই লিখেছেন রাজনীতির ওপর। তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে আল আহকামুস সুলতানিয়া অর্থাৎ রাষ্ট্র চালনা বিধি। এ গ্রন্থে তিনি খেলাফত ও ওজারত সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তা যে কোন আধুনিক চিন্তাবিদকে চমৎকৃত করবে। তিনি রাষ্ট্র প্রধান ও মন্ত্রিসভার দু'ধরনের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। এ দুটি ব্যবস্থা বর্তমান যুগের প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম ও কেবিনেট সিস্টেমের অনুরূপ। সুতরাং এই দু'রকম শাসন ব্যবস্থার আদি গুরু হিসাবে আল-মাওয়ার্দীকে গ্রহণ করতে পারি।

একাদশ শতাব্দীর ইমাম গাযালীর রাজনীতিক পুস্তকাবলির মধ্যে কিতাব আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, কিতাব আল মুসতাজহাবী ও তিবরুল মাসবুক সুপ্রসিদ্ধ। তিনি গ্রীক চিন্তাধারার ওপর অনেক পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, পাশ্চাত্য দার্শনিক টমাস একুনাহ গাযালীর মত ধারারই প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। গ্রীক চিন্তাধারা নিয়ে আরো যারা বিশেষভাবে গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে আল ফারাবী ও ইবনে রুশদের নাম উল্লেখযোগ্য। ফারাবী গ্রীক চিন্তাধারার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অনেক দিন পর্যন্ত তা ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্স্ট বুক হিসাবে পাঠ্য ছিল। ইবনে রুশদ এরিস্টটলের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাতা বলে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর দর্শন ইউরোপে এভাররোস্ট এরিস্টটলিয়ানিজম নামে পরিচিত ছিল। পদুয়ার মার্সিলিওর প্রায় সবগুলো যুক্তিই ইবনে রুশদের কাছ থেকে ধার করে নেওয়া। অথচ দুঃখের বিষয়, মার্সিলিওর চিন্তাধারাকে বর্তমানে আমাদের দেশেও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পড়ানো হয়, কিন্তু সেখানে ইবনে রুশদের নামমাত্র উল্লেখ নেই।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বা গীর্জা ও শাসন-ক্ষমতার সম্পর্ক চিরদিন ইউরোপের চিন্তাবিদদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছে। তার ফলে শত শত বছর যুক্তির ও অস্ত্রের যুদ্ধ চলেছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তাধারার এছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য ইউরোপে ছিল না। মুসলিম চিন্তাবিদগণ এ সম্পর্কে সুস্থ মত ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম চিন্তাবিদগণ গীর্জা ও রাষ্ট্র তথা ধর্ম ও রাজনীতি কখনও আলাদা করে দেখেননি। ইসলামের দৃষ্টিতে একটার ওপর অন্যটার প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নই ওঠে না, দু'টো মিলেই এক। ইবনে খালদুন তার কিতাব আল ইবার বা বিশ্ব-

www.pathagar.com

ইতিহাস নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ধর্ম ও রাজনীতিকে এক বলে উল্লেখ করেছেন। এ চিন্তাধারা আজ পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে অক্ষুণ্নভাবে বিদ্যমান। ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে আল্লামা ইকবালের তীব্র প্রতিবাদও এক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "একনায়কত্বের বিক্রমই হোক কিংবা গণতন্ত্রের তামাসাই হোক, রাষ্ট্র ও ধর্ম আলাদা হলে থাকে শুধু বর্বর শক্তি।" মুসলিম চিন্তাবিদদের এই সুস্থ চিন্তাও আমাদের দেশের পাঠ্য রাজনৈতিক ইতিহাসের তালিকায় স্থান পায়নি। পক্ষান্তরে স্থান পেয়েছে সাধু অগস্টাইন, এমবোর্জ ও গ্রেগরি প্রমুখ পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদদের কথা।

অন্যদিকে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের সত্যিকার প্রথম বিকাশ ঘটে মুসলিম চিন্তাবিদদের হাতে। আইন শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের অবদান অতুলনীয়। অধুনা যে জুরিস প্রুডেন্স অব ল' পড়ানো হয় তার প্রথম নিয়ম মাফিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায় মুসলিম মনীষীদের হাতে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফীর নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয়, মধ্যযুগের জার্মানদের আইন পড়ানো হয় অথচ মুসলিম আইনবিদদের চিন্তা-জগতের সঙ্গে পরিচয়ের কোন ব্যবস্থাই নেই আমাদের পাঠ্য পুস্তকে।

উপরের আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগ আন্ পলিটিক্যাল ছিল না। ইউরোপের জন্যে তা অরাজনৈতিক যুগ হলেও আরব ও মুসলিম বিশ্বে তখন পূর্ণ রাজনৈতিক যুগ। আমাদের উচিত রাজনৈতিক চিন্তাধারার এ শূন্যতাকে দূর করে বিশ্বে রাজনৈতিক ইতিহাসকে নতুন করে লেখা। রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্তানায়কদেরকে তাদের যথাযোগ্য স্থান দিলে এ শূন্যতা দূর হবে—রাজনীতির ইতিহাস পাবে পূর্ণাঙ্গতা, সংশোধিত হবে একটি ঐতিহাসিক ভুল।

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও মুসলিম মনীষীদের চিন্তাধারাকে প্রচলিত এবং আমাদের পাঠ্য রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসের অংশ করে নিলে একদিকে যেমন বর্তমান ইতিহাসের ইউরোপীয় একঘেয়েমী দূর হবে, অন্যদিকে পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলো শাসন-সংবিধানে পাশ্চাত্য মতামত গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পথ খুঁজে পাবে। বস্তুত যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে উল্লিখিত মুসলিম রাজনীতিবিদদের ধ্যান ধারণা, চিন্তা-গবেষণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হবার গুরুত্ব আদর্শের সংঘাতময় বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়।

(১৯৬০-৬১ সনের ফজলুল হক হল বার্ষিকীতে প্রকাশিত)

www.pathagar.com

সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শালীনতার সমস্যা

বাংলাদেশে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন কিছু নয়। ইংরেজ আমলে যখন থেকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকে বাংলাদেশে সহশিক্ষা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এখানে সহশিক্ষা রয়েছে। অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়েও একই অবস্থা।

কলেজ ও স্কুল পর্যায়ে অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। অধিকাংশ স্কুল ও কলেজে সহশিক্ষা নাই। অধিকাংশ স্থানে ছাত্রীদের জন্য আলাদা স্কুল ও কলেজ রয়েছে। তবে যেখানে মেয়েদের পর্যাপ্ত স্কুল ও কলেজ নাই সেখানে স্কুল ও কলেজগুলোতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

মাদরাসাগুলোতে সহশিক্ষা নাই বললেই চলে। পূর্বে মেয়েদের জন্য মাদরাসা ছিল না। এটা একটা সামাজিক ব্যর্থতার দিক। এখন মেয়েদের মাদরাসা হচ্ছে। যেখানে মেয়েদের মাদরাসা নেই সেখানে কিছু কিছু মাদরাসায় বিশেষ ব্যবস্থায় মেয়েদের পড়ার সুযোগ আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে যেখানে পূর্বে ছাত্রীরা কম ছিল, সে সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গভীর মেলামেশা (free mixing) ছিল না বা খুব কম ছিল। এর ফলে তেমন কোন সমস্যাও পূর্বে দেখা দেয়নি। এখন অবশ্য সঙ্গত কারণেই ছাত্রী সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রভাবও পরিবেশের ওপর পড়তে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সহশিক্ষার কারণে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মেলামেশা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই একত্রে বসে গল্প করতে দেখা যায়, যেখানে সব ধরনের হাসি-ঠাট্টা চলে। কিছু ছাত্র-ছাত্রী আরো এগিয়ে যায়। হাত ধরাধরি করে চলে, একত্রে রিকশায় চলে। এর কোনটিই ইসলাম অনুমোদিত নয়।

এর ফলাফলও অনেক ক্ষেত্রে খারাপ হচ্ছে, নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্কের দিকে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে ১৯৯৮ সনের ১৪ মে সংখ্যা বাংলাদেশ অবজার্ভার পত্রিকায় ডা. সাবরিনা কিউ রশীদ লেখেন,

www.pathagar.com

"পূর্বে কখনো আমরা ডাক্তাররা এত অধিক সংখ্যক অবিবাহিত অল্প বয়স্ক (in teens) মেয়েকে গর্ভবতী হতে দেখিনি।" তিনি এ মন্তব্য সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সম্পর্কে করতে গিয়ে লেখেন।

ডা. সাবরিনা রশীদ তার প্রবন্ধে বলেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত সৎ (innocent) থাকে না। এগুলো পরবর্তীতে স্পর্শ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন হরমোনের নিঃসরণ হওয়ায় যে কোন স্পর্শ শরীর ও মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। কেননা মেয়েরা একটু ঠাণ্ডা (cold) হলেও ছেলেরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। সুতরাং মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু হিসাবে নিতে চাইলেও ছেলেরা তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে।

সে জন্য ডা. রশীদ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা না করতে এবং নিরাপদ দূরত্ব (safe distance) রক্ষা করে চলতে বলেছেন। ডা. সাবরীনা রশীদের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত। সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টা informal হওয়া উচিত নয়। তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সতর্ক এবং ফর্মাল ধরনের হওয়া উচিত। আমরা একটি অফিসে গেলে যেভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কথা বলি, ব্যবহার করি, এটাই হচ্ছে ফর্মাল (formal) ধরনের ব্যবহার।

প্রাইভেট টিউশনির ক্ষেত্রেও একই সতর্কতা প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার প্রয়োজনেও শিক্ষকদের সঙ্গে বা ছাত্রীরা ছাত্রীদের সঙ্গে এবং ছাত্ররা ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করাই সঙ্গত। অন্যরকম হলেও শেষ পর্যন্ত (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) পরিস্থিতি ঐ দিকে চলে যেতে পারে যা ইসলাম আমাদের অনুমোদন করে না। কিশোরী মেয়েদের যুবকদের কাছে একা নিভৃতে পড়া উচিত নয়। কিশোরী মেয়েদের ছাত্রীদের বা মহিলাদের কাছেই পড়া উচিত। এ জন্য উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশনি করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। তাহলেই এ সমস্যার সমাধানে সাহায্য হবে। আমাদের সবারই জানা যে প্রাইভেট টিউশনির কারণে ছেলে-মেয়েরা বাল্য বয়সে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে, যা তাদের এবং পরিবারসমূহের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

এ বিষয়ে অবশ্য অনেক চিন্তাশীল লোক অন্য রকম সমাধানের কথা ভাবেন। তারা মনে করেন যে, উচ্চ পর্যায়ে সহশিক্ষা তুলে দিয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় বা আলাদা ক্যাম্পাস করাই ভাল। অবশ্য এ ধরনের পদক্ষেপ

www.pathagar.com

নেওয়া সময়ের ব্যাপার। তবে কয়েকটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ তো অবশ্যই করা সম্ভব। একই সঙ্গে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে সহশিক্ষা পুরোপুরি তুলে দেওয়া যেতে পারে, কেননা পাশ্চাত্যে এ পর্যায়ে যৌন উশৃঙ্খলতা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হয়। এ জন্য আরো অধিক সংখ্যক গার্লস স্কুল ও কলেজ স্থাপনের উদ্যোগও নিতে হবে। যে সকল স্কুল ও কলেজে এখন সহশিক্ষা আছে সেগুলোকেও ছেলে ও মেয়েদের দু'টি আলাদা সেকশনে ভাগ করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

পাকিস্তানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা ক্যাম্পাস রয়েছে। মালয়েশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য সহশিক্ষাই বহাল রেখেছে। কিন্তু তারা সুন্দর পোষাক বিধি (dress code) এবং অন্যান্য নির্দেশাবলি চালু করেছে যা পরিস্থিতিকে শালীন রাখে। বাংলাদেশেও এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলে-মেয়েদের সে পথই অবলম্বন করা উচিত যা ডা. সাবরিনা রশীদ বলেছেন এবং এ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দেশের সরকার, সকল শিক্ষাবিদ, সমাজতন্ত্রবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদসহ অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীদের এ প্রস্তাবসমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সকলকে এসব ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করার অনুরোধ করছি।

www.pathagar.com

কওমী মাদরাসা শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কিছু প্রস্তাব

এ প্রবন্ধে আমি যেসব মাদরাসা কওমী মাদরাসা বলে পরিচিত তাদের মান উন্নয়নের জন্য কিছু প্রস্তাব রাখার চেষ্টা করব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পদ্ধতির মাদরাসা এ উপমহাদেশে ছড়িয়ে যায়। তারপর থেকে এ পদ্ধতির মাদরাসাসমূহের ব্যাপক কোন সংস্কার এখন পর্যন্ত হয় নাই। এ পদ্ধতির মাদরাসা থেকে যারা পাশ করেন তারা সাধারণত অন্যান্য মাদরাসায় কাজ করেন বা মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং প্রশাসন-এ তাদের সাধারণত কোন স্থান হয় না, হলেও তা খুবই কম।

কওমী মাদরাসাসমূহের পরিচালকগণ তাদের মাদরাসা কোর্সের কি ধরনের সংশোধনের চিন্তা ভাবনা করছেন, তা আমার জানা নাই। এ ধরনের কোন রিপোর্টও আছে কিনা তাও আমি অবগত নই। যদি থেকে থাকে তাহলে তার ওপর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সঙ্গত।

এ নিবন্ধে আমি কওমী মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামের জন্য আরো কল্যাণকর করার লক্ষ্যে কিছু পরামর্শ দিতে চাই। ইসলামের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন যে, মাদরাসা শিক্ষিত ছাত্ররা যেন সমাজের সর্বস্তরের প্রয়োজন মিটাতে পারেন। তারা যেন ইমাম, মাদরাসা শিক্ষক ছাড়াও ব্যাংকার, প্রশাসক ও অর্থনীতিবিদ হতে পারেন।

অধিকাংশ বড় মাদরাসাকে জামেয়া বলা হয়। জামেয়া অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় (University)। জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎপর্য হচ্ছে যে, এখানে সব প্রয়োজনীয় বিষয় বা subject শিক্ষা দেওয়া হবে। সব ছাত্র সবকিছু শিখবে তা নয়, প্রতিটি subject বা বিষয় কিছু ছাত্র শিখবে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমানে যে দাওরাহ ডিগ্রি আছে তার সঙ্গে যদি আমরা আর মাত্র দু'টি দাওরাহ কোর্স সব জামেয়ায় খুলতে পারি তাহলে মাদরাসার ছাত্ররা যে কোন স্থানে প্রশাসক হতে পারবে এবং সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হতে পারবে। বিষয় দু'টি হচ্ছে অর্থনীতি (ইকতিসাদ) এবং গণ প্রশাসন বা Public Administration যদিও সব বিষয়ে দাওরাহ খোলা সম্ভব নয়, কিন্তু দু'টি নতুন বিষয়ে দাওরাহ

www.pathagar.com

খোলা খুবই সম্ভব। এর ফলে সারা দেশে প্রশাসনে এ সব ছাত্ররা যেতে পারবে এবং গোটা জাতির ইসলামিকরণে তারা ভূমিকা রাখতে পারবে। ইতোমধ্যে Islamic Economics বা ইসলামী অর্থনীতি একটি নতুন বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। Public Administration-এ অনেক কাজ হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমি কওমী মাদরাসাসমূহে দু'টি নতুন দাওরাহ খোলার প্রস্তাব করছি। এর ফলে নিচের ক্লাশসমূহে কোর্স পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন করতে হবে। কওমী মাদরাসায় একাদশ-দ্বাদশ ক্লাশে অর্থনীতি ও Public Administration এর দু'টি পত্র (paper) যোগ করতে হবে। যে কেউ যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবে। দু'টি বিষয় একত্রে নেওয়া যাবে না। যারা এ পর্যায়ে অর্থনীতি বা পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন নেবেন কেবল তারাই দাওরাহ পর্যায়ে এ সব বিষয় পড়তে পারবেন।

আর যে কয়টি পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, আরবী ভাষা শিক্ষা আরো শক্তিশালী করা দরকার। বাংলা ভাষা শিক্ষাকেও পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, যাতে মাদরাসার ছাত্ররা এ দেশে প্রখ্যাত লেখক হতে পারেন। ইংরেজি ভাষাকেও উপযুক্তভাবে সব পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তাহলে তারা কেবল জাতীয় পর্যায়ে নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের ও ইসলামের খেদমত করতে পারবেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ ছাড়া খুব ভাল হবে যদি দাওরাহ কোর্সে আধুনিক কালে তাফসীর, হাদীস ও ফিক্‌হর ওপর যে সকল মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলোকে অর্ন্তভুক্ত করেন। তাদের সকল কোর্স রিভিউ বা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পুরানো কিছু বই বাদ দিয়ে নতুন কিছু বই অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। তাহলে তাদের কোর্সসমূহ এ যুগে ইসলাম ও সমাজের চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

আমাদের মাদরাসাসমূহে যে আরবী শিখানো হয় তাতে তারা আরবীতে দক্ষ হন না, তারা আরবীতে বলতে লিখতে পুরোপরি সক্ষম হন না। আরবী শিখার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নির্যাতন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নামাযী ছাত্রদের ওপর নির্যাতনের খবর প্রায় সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব ছাত্রকে মারপিট করা হয়েছে এবং তাদেরকে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অনেকে গুরুতর আহত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে সহায়তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় একশ' ছাত্র বের করে দেওয়া হয়েছে। হয়তো আরো বের করা হবে। প্রায় সকল হলে এ কাণ্ড ঘটেছে। মেয়েদের হলেও হামলা হয়েছে।

আমি অবাক হই এমন অকারণ অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সকল শিক্ষক কেন সোচ্চার হচ্ছেন না, কিন্তু আজ পর্যন্ত (২৬শে সেপ্টেম্বর) তা তারা হননি। শিক্ষকবৃন্দ একত্রে বসতে পারতেন এবং এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিতে পারতেন। ভাইস চ্যান্সেলর হলগুলো পরিদর্শন করতে পারতেন, শিক্ষকদের সঙ্গে বসতে পারতেন, বহিষ্কৃত ছাত্রদের রুমগুলো দেখতে পারতেন এবং ঐসব নির্যাতিত ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করে যথাসময়ে তাদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে পারতেন, কিন্তু এসব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

অভিযোগ করা হয়েছে যে, এরা ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী। যদি তাই হয়, তাহলে কি অপরাধ হয়েছে? ছাত্রশিবির তো সারাদেশে কাজ করে। প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদরাসা এবং মহল্লায় তাদের কাজ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির মিটিং-মিছিল করে না। কেননা, তা তাদের করতে দেওয়া হয় না। তারা নীরবে কাজ করে এবং এখানে সংঘর্ষ-সংঘাত পরিহার করে চলে। এটা তো ভাল। যারা মানবিকতায় বিশ্বাস করেন, যারা মানুষের অধিকারে বিশ্বাস করেন, তারা কি করে এসব নিরীহ ছাত্রদের ওপর অত্যাচার চলতে দিতে পারেন। বিবেকবান মানুষের এ ধরনের ক্ষেত্রে চুপ থাকা তো নিদারুণ অন্যায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শান্তি স্থাপনের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। তারই ছাত্র সংগঠন এ অত্যাচার করেছে! আমি আশা করি, তিনি এ অত্যাচার বন্ধ করার উদ্যোগ নিবেন। আমি আরো আশা করি, সকল বিবেকবান মানুষ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। আমি এও আশা করি যে, সরকার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন এবং নির্যাতিত ছাত্রদের দ্রুত হলে ফিরিয়ে আনবেন।

(দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)

www.pathagar.com

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

ইবরাহীম খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমার সরাসরি পরিচয় ও আলোচনা হয় ১৯৬৭ সনে। তিনি তাঁর এক নাতির বিবাহ উপলক্ষে আমার চট্টগ্রামের বাসায় আসেন। তাঁর অন্যতম নাতি ছিলেন ড. শামসুল আলম। তিনি তখন চট্টগ্রাম মিউজিয়ামের দায়িত্বে ছিলেন এবং মিউজিয়ামটি গড়ে তুলছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ইতালী থেকে তার ডক্টরেট করেন এবং বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক হয়েছিলেন। সে পদ থেকেই তাঁকে অবসর দেওয়া হয়। তিনিও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন বলে আমাকে বলেছিলেন। তাঁর প্রতি যেন সুবিচার হয় সে জন্য আমি বেশ কিছু চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারিনি।

এই ড. শামসুল আলমের বরযাত্রা আমার চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের বাসা থেকে হয়েছিল। কেননা যুবক শামসুল আলম আমার বন্ধু ছিলেন। এ বন্ধুত্ব চট্টগ্রামেই হয়েছিল। একজন তরুণ অফিসার হিসাবে চট্টগ্রামে আমার পোস্টিং হয়। কনের বাসাও ছিল চট্টগ্রামের একই কলোনীতে। জনাব ইবরাহীম খাঁ সে বিবাহে যোগ দিতে চট্টগ্রামে আমার বাসাতে আসেন।

ইবরাহীম খাঁকে যারা দেখেছেন তারা জানেন যে তিনি আচকান পাজামা পরতেন। তাতে তাঁকে অত্যন্ত মানাতো। তিনি লাঠি ব্যবহার করতেন। লাঠিটি খুবই মানানসই সাইজের ছিল এবং তাঁর হাতে সেটি খুবই মানাত। তিনি চট্টগ্রামে কয়েকদিন ছিলেন এবং সে সময় নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হতো। আলাপ হতো দেশ ও ইসলাম নিয়ে। কেননা তিনি ছিলেন একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। সে সময়ে গুটি কয়েক ইসলামী চিন্তাবিদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন।

আমাদের কলেজ সিলেবাসে তখন তাঁর 'ইসলামের মর্মকথা' নামে একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত ছিল। লেখাটি অত্যন্ত সুলিখিত। এর মাধ্যমেই আমরা ইসলামের মর্মকথা উপলব্ধি করেছিলাম। তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন ধর্ম হচ্ছে সেই আদর্শ ও বিধান যা গোটা জীবনকে ধরে রাখে। ইসলাম একটি জীবনবাদী ধর্ম, এখানে fatalism এর কোন স্থান নেই। তিনি ইকবালের কবিতা তাঁর

www.pathagar.com

প্রবন্ধে উদ্ধৃত করে বলেন, 'খোদা পুছতা হ্যায়, হর তকদীর, বননেছে পাহলে, বাতা তেরি রেজা কিয়া হ্যায়" (খোদা তাকদীর নির্ধারণের পূর্বে বান্দাহকে জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি কি চাও?) অর্থাৎ রূপকভাবে ইকবাল বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তকদীর কর্মবাদের বিরুদ্ধে নয়।

আমাদের শিক্ষাজীবনে (সম্ভবত ইন্টারমিডিয়েটে) আমরা ইবরাহীম খাঁ সাহেবের 'কাফেলা' নামে একটি নাটিকা পড়েছিলাম। তাতে তিনি ইসলামের নামে যে কূপমণ্ডূকতা, নারী শিক্ষার বিরোধিতা সে সময়ে ছিল তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের জাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি ইসলামের যথাযথ সেবক ও অনুরাগী ছিলেন। তিনি মুসলিম জাগরণের অন্যতম পথিকৃত ছিলেন। কেউ কেউ এটাকে সাম্প্রদায়িকতা বলতে চাইবেন। এটা ভুল। নিজের জাতিকে অনগ্রসর দেখতে পেয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা মহৎ কাজ ও গৌরবজনক। অন্যের উপর অবিচার না করলেই হলো।

ইবরাহীম খাঁ বড় মাপের শিক্ষাবিদ ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে তিনি ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের জনগণ তাকে চিরদিন স্মরণ রাখবে। তবে এজন্য তাঁর পূর্ণ পরিচয় আমাদের তুলে ধরতে হবে।

www.pathagar.com

আমার শিক্ষক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন

আমি ১৯৫৫ সনে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। তখন মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন সাহেব ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সে সময়ই প্রথম মনসুরউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে। তিনি আমাদেরকে বাংলা গদ্য পড়াতেন। শিক্ষায় তিনি ছিলেন যথেষ্ট কঠোর। কোন ছাত্র পড়াশুনায় অবহেলা করুক এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।

১৯৫৭ সনে আইএসসি পাস করে আমি ঢাকা কলেজ থেকে বের হয়ে যাই। ১৯৫৮ সনের শেষ দিকে আমার পিতা শান্তিনগরে বাসা নেন। সে পাড়াতেই মনসুরউদ্দিন সাহেব নিজের বাড়িতে থাকতেন। সে সময়ে আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এক সময় তিনি আমাকে তাঁর এক কন্যার গৃহশিক্ষকতা করার জন্যও বলেছিলেন। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে তা আর করা হয়ে ওঠেনি।

চাকুরি জীবনে সব সময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৯৮০ সন থেকে পুনরায় আমি তাঁর সান্নিধ্যে আসি। তিনি প্রায়ই আমার বিজয়নগরস্থ বাসায় আসতেন। তখন তিনি একা চলাফেরা করতে পারতেন না। তাই তার সঙ্গে কোন না কোন কন্যা বা আত্মীয় থাকত। তিনি আমাকে একেবারে নিজের ছেলের মত জানতেন এবং পরিবারের নানা সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতেন। এসব সমস্যা সমাধানে আমার মতামতও নিতেন।

তিনি আমার বাসায় বসে সবসময় আমার বইপত্রগুলো দেখতেন। যদিও আমার বইগুলো অগোছালোভাবে রাখা ছিল তবুও তিনি সেগুলো খুটে খুটে দেখতেন। তিনি আমাকে ইউরোপীয় লেখকদের লেখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। প্রায়ই দেখা যেতো সেগুলো আমার পড়া ছিল না। তিনি সে সব বই পড়ার জন্য আমাকে বলতেন। তাঁর সাহচর্যে এসে আমি জানতে পারি যে, পারসীক সুফীদের ও ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের ইসলাম সম্পর্কিত অনেক বই তাঁর পড়া ছিল। তাঁর ওপর সুফিবাদের অত্যন্ত গভীর প্রভাব ছিল বলে আমার ধারণা।

ইসলাম সম্পর্কে আমি তাঁর মতামত বিভিন্ন সময়ে জানতে চেয়েছি। তিনি গভীর বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

করতেন এবং শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করতেন। ইসলামের মধ্যেই মানবতার মুক্তি এসব বিষয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন। আমি তাঁকে তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তা লিখে যেতে বলেছিলাম। তিনি লিখবেন বলেও আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু সময়ের অভাবে এবং শারীরিক কারণে তিনি তা বোধহয় লিখে যেতে পারেননি।

তিনি আমার ছেলে-মেয়েকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি বাসায় আসলেই তাদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের সঙ্গে অনেক কথা বলতেন। তিনি আমার কন্যাকে বলতেন একই সঙ্গে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হবে। তিনি খাওয়া-দাওয়া ভাল করার ওপর জোর দিতেন। তিনি তাকে লোকসাহিত্য পড়তে ও বানানের ব্যাপারে সতর্ক হতে বলতেন। তিনি ব্যাকরণ পড়তে ও বিশুদ্ধ বানানের ওপর বিশেষভাবে জোর দিতেন।

অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন সাহেবের মৃত্যুতে আমি কেবল আমার এক শিক্ষককেই হারাইনি, আমার পরিবার এক মুরুব্বীকেও হারিয়েছে।

www.pathagar.com

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঃ আমি যেভাবে পেয়েছি

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এ দেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ছিলেন এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে স্বনামে এবং বেনামে লিখতেন। এসব সংবাদপত্রের মধ্যে দি অবজারভার, দৈনিক সংগ্রাম এবং লন্ডনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকা ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল অন্যতম।

আমি তাঁকে চিনি যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। তিনি ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি অত্যন্ত Formal ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্ররা তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করে চলত। তিনি সবসময় স্যুট-টাই পরতেন এবং পোশাক-আশাকের ব্যাপারে যথেষ্ট কেতাদুরস্ত ছিলেন। তিনি ইংরেজি প্রয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন এবং কারো কোন ত্রুটি এ ব্যাপারে সহ্য করতে পারতেন না। উচ্চারণের ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং কোন ধরনের ভুল উচ্চারণ তাঁর সামনে কেউ করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে সংশোধন করে দিতেন। আমাকেও তিনি বেশ কঠোরভাবে আমার উচ্চারণের ভুল দেখিয়ে দিতেন।

পরবর্তীকালে দেখেছি তিনি আরবী ভাষার ব্যবহার ও উচ্চারণ বেশ তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। আমি আমার এক বন্ধু জয়নাল আবেদীনকে 'জয়নাল' বলে ডাকতাম। একদিন তিনি আমাকে কঠোরভাবে বলেন, "তোমার কাছে আমি এ রকম ভুল আশা করি না। তোমার আরবী ব্যবহার ভুল হয়েছে। এটি হবে জাইন অথবা জাইনুল আবেদীন।" এরপর থেকে আমি ঐ বন্ধুকে জাইনুল আবেদীন বলেই ডেকেছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আরবী ভাষার দৃষ্টিতে 'নজরুল' ব্যবহার সঠিক নয়। এটি হবে 'নজর' অথবা 'নজরুল ইসলাম'। এখন আমরা নজরুল ইসলাম-ই বলে থাকি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। তিনি তখন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবেও পরিচিত ছিলেন না। ইসলামের ওপর তখন তেমন

www.pathagar.com

কিছু লিখেছেন বলে আমার জানা নাই। আমার মনে পড়ে, ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা (বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) একবার কার্জন হলে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। তাতে ড. হোসায়েন Tradition (হাদীস)-এর ওপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই সেমিনারে কার্জন হল কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। কারণ, সে সময় ইসলামী বিষয়ের ওপর খুব কমই সেমিনার হত। আজকের মত এত সেমিনার তখন হত না। তদুপরি ওটা ছিল ইসলামিক একাডেমী আয়োজিত প্রথম কি দ্বিতীয় ইসলামী সেমিনার।

প্রবন্ধে ড. হোসায়েন যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন তার সঙ্গে ইসলামী চিন্তাবিদদের মূল ধারার অনেক অমিল ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হাদীসবিরোধী যুক্তিধারার সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল তাঁর প্রবন্ধে। আমি নিজেই প্রবন্ধের বক্তব্যের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। প্রবন্ধটি ব্যাপকভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ড. হোসায়েন সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসেন এবং একজন যথার্থ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

আরও অনেক পরে, ড. হোসায়েনের সঙ্গে আমার গভীর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা কয়েক বন্ধু 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট' (BIIT) নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। ড. হোসায়েনকে আমরা এ প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা হওয়ার জন্য অনুরোধ করি এবং এতে তিনি সদয় সম্মতি দেন। (BIIT) এর চিন্তা আমাদের আসে যুক্তরাষ্ট্রের International Institute of Islamic Thought প্রকাশিত Islamization of knowledge বইটি পরার পর। আমার বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন সচিব জনাব আহ্‌মদ ফরিদ এ বইটিকে ভবিষ্যতের 'ইসলামী মেনিফেস্টো' বলে উল্লেখ করেছিলেন। যাহোক, BIIT ঐ বইয়ে দেওয়া 'ইসলামিক সিভিলাইজেশন কোর্স' শীর্ষক বিষয়ের ওপর পুস্তক রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আমরা ড. হোসায়েনকে পুস্তকটি রচনা করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং কাজ শুরু করেন। এ কাজ উপলক্ষে ড. হোসায়েনের সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হয়। লেখার খসড়াটি তিনি আমায় দেখতে দিয়েছিলেন। আমি বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তনের জন্যে কিছু সুপারিশ করি। তিনি আমার অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই লেখাটি BIIT কর্তৃক A Young Muslims Guide to Religions of the World নামে প্রকাশিত হয়েছে।

ড. হোসায়েন BIIT-এর পাক্ষিক সভায় ইতিহাসের ওপর একটি সিরিজ আলোচনা শুরু করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের ক্যাসেটগুলো BIIT-তে সংরক্ষিত

www.pathagar.com

আছে। এই বক্তব্যগুলো একটি প্রবন্ধ পুস্তক আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে অবশ্য উপযুক্ত সম্পাদনার প্রয়োজন হবে। ড. হোসায়েনের আলোচনায় আমি প্রায় সবদিনই উপস্থিত ছিলাম। বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর পড়াশোনা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। আমাদের এই উপমহাদেশের ইতিহাস ছিল তাঁর নখ-দর্পণে। তিনি চাইতেন, মুসলমানরা ইতিহাস সচেতন হোক। তিনি মনে করতেন যে, এ এলাকার মুসলমানরা যদি উপমহাদেশে ইসলামের আগমন থেকে শুরু করে তাদের ইতিহাস জানতে পারে তাহলেই কেবল তারা মুসলমান হিসাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারবে এবং উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলমানদের যে সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছে তা বুঝতে পারবে। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বোঝার জন্য তাঁর আত্মজীবনীমূলক পুস্তক The Wastes of Time বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ড. হোসায়েন একজন সত্যনিষ্ঠ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন। শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেশ ও জাতির জন্য তাঁর খেদমত অপরিসীম। সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তার ভিত্তিতে তাঁকে মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। তাঁর সামগ্রিক অবদানের ভিত্তিতেই তাঁকে বিচার করতে হবে।

www.pathagar.com

আমার দেখা শহীদ আবুল কাশেম

১৯৭৮ সালে আবুল কাশেমের সাথে আমার পরিচয় হয়। সে সময় খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তাফসীর মাহফিল হতো। জনাব মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তাফসীর করতেন। মাহফিলে হাজার হাজার লোক সমাগত হতো। ১৯৭৮ সালের মাহফিলের পর হতে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠে। তারপর আমরা একত্রে সমাজকল্যাণমূলক অনেক কাজ করতে শুরু করি। আমার দীর্ঘদিনের চিন্তা ছিল সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, আশ্রয়হারা মেয়েদের সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। রেল স্টেশন, বাস স্টেশন বা লঞ্চ ঘাটে কোন মেয়ে বিপদে পড়তে পারে। তাদের বিশেষ করে আশ্রয় দরকার।

আমি আমার চিন্তার কথা আবুল কাশেমকে বলি। সে মহিলা আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে এবং পরিকল্পনা মাফিক মেয়েদের সাময়িক আশ্রয় দেওয়া, চাকরি দেওয়া বা ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতো। এই আশ্রয় কেন্দ্রে আগত প্রতিটি অসহায় মহিলার ব্যাপারে থানায় জি ডি করা হতো, যাতে পরে পুলিশের মনে ভুল বুঝাবুঝি না হয়। একজন শিক্ষিতা মহিলা সুপারের তত্ত্বাবধানে এদের রাখা হতো।

আবুল কাশেম এই আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছে। যেহেতু এর কোন নিজস্ব আয় ছিল না তাই তাকে বহু লোকের কাছে যেতে হতো। সমাজে এই ধরনের উদ্যোগে অনেকেরই সাহায্য পাওয়া যায় না বা এগিয়ে আসেন না। তবুও যাদের সাহায্য পাওয়া গেছে তাদের স্মরণ করি। জীবনের একটি বিরাট সময় আবুল কাশেম এই ব্যাপারে শ্রম দিয়েছে। শবমেহের নামের একটি নিষ্পাপ মেয়ে ১৯৮৫ সালে পতিতালয়ে নির্মম নির্যাতনে মারা যায়। এ ঘটনাটি মানবতাকে স্তম্ভিত করে দেয়। শবমেহের নারীর ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষার একটি উজ্জল প্রতীক। তাকে স্মরণ রাখা এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আবুল কাশেমকে প্রতি বছর শবমেহের দিবস পালন করার জন্য অনুরোধ করি। সে মোতাবেক প্রতি বছর শবমেহের দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং সেভাবে গত ১৪ বছর ধরে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ দিবসটি পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনে পরিণত

www.pathagar.com

হয়েছে। এ পরিক্রমায় দিনাজপুরে ইয়াসমিন মারা যাওয়ার পর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ দিবসটিকে 'ইয়াসমিন দিবস' হিসাবে পালন করার জন্য আবুল কাশেম সিদ্ধান্ত নেয়। এ দিবস পালনের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা উদ্দেশ্য ছিল। গত কয়েক বছর এ দিবসটি পালন করার জন্য আবুল কাশেম সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

মুসলিম নারীদের শালীনতা ও ইসলামের মূল বিধানকে ধরে রাখার জন্য আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। কাশেম এই প্রবন্ধটিকে বই আকারে লক্ষ কপি ছড়িয়ে দেয়। হিজাব হিসাবে প্রচলিত কুরআনে উল্লিখিত চাদর এর ব্যবহার সমাজে বৃদ্ধি করার জন্য আবুল কাশেম প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। সে এ ব্যাপারেও আমার লিখিত প্রবন্ধ, লিফলেট সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়। সে অনেক চাদরও বিলি করে, যার ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ মহিলারা এখন চাদর পরছে।

ইসলামী অর্থনীতির মূল ধারণা তুলে ধরা এবং নারী অধিকার সম্পর্কে আমি একটি ট্রেনিং একাডেমীতে একবার বক্তব্য দেই; যাতে আবুল কাশেম উপস্থিত ছিল। পরবর্তীতে জনাব সফিউদ্দিন সাহেবের সহায়তায় আবুল কাশেম, খোরশেদ আলম বাবু, বাকের মোর্শেদ, হাজী বেলায়েত হোসেন ও সাহাব উদ্দিন প্রমুখ এ বক্তব্যটি অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট আকারে বের করে বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

আবুল কাশেমের শখ ছিল বই বিলি করা। সে হাজার হাজার কপি পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও ধর্মীয় বই বিতরণ করে গেছে। আবুল কাশেম ছিল চলন্ত ইসলাম (Moving Islam)। সে যেখানেই গেছে ইসলামের কথা বলেছে। আমার দৃষ্টিতে তার মত সৎ, ভাল মানুষ অনেক কম দেখেছি। কাশেম সম্পর্কে আমার ধারণা অনেক উঁচু ছিল। সে ছিল ঢাকা শহরে ইসলামের একটি স্তম্ভ।

পরিশেষে আমি বলবো, আবুল কাশেমের সামাজিক প্রতষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা ও তার কাজগুলোকে অব্যাহত রাখার জন্য তার সকল বন্ধুকে এগিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি

প্রায় তিন যুগ হয়ে গেলো বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এসেছি। এমনকি ঐ এলাকাতেও যাইনি অনেক দিন। আর কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে ফেলে আসা ক্যাম্পাস সম্পর্কে ভাববার তেমন অবকাশ হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতি কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে আছে। এতদিন পর সেই ১৯৫৯ সালে ফিরে গেলে হয়ত কিছু ভুল-ভ্রান্তিও হতে পারে। তবে কিছু স্মৃতি তো অবশ্যই থাকে যা সহজে ভোলা যায় না। আমার মনে আছে, ১৯৫৯ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ে এমএ পড়তে এলাম। ভর্তি হলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। কারণ সে সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বেশ উঁচুদরের সাবজেক্ট ছিল। আমাদের ব্যাচের কয়েকজন ঘনিষ্ট সহপাঠীর কথা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে। তারা হচ্ছেন, জনাব এ. আর. ইউসুফ (মন্ত্রী ছিলেন), ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাত (সাবেক মন্ত্রী), জনাব এস. এম. আকরাম (এমপি), সৈয়দ হাফিজউদ্দিন (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা), কমরেড ফরহাদ (বিশিষ্ট সিপিবি নেতা) প্রমুখ। আমি সে সময় যে সব শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের পেয়েছি তার মধ্যে মি. নিউম্যান, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী (সংক্ষেপে ম্যাকস্যার), মরহুম মাহফুজুল হক (পরে এয়ার ক্রাশে মারা যান), ড. হাসান জামান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত স্কলার শিক্ষক। ড. হাসান জামান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ স্কলারদের একজন। অত্যন্ত যোগ্য ও সৎ প্রকৃতির শিক্ষক ছিলেন। তিনি পরে যুক্তরাজ্যে ইন্তেকাল করেন। মক্কায় তাকে দাফন করা হয়েছে।

শিক্ষকদের সাথে আমাদের ছিল চমৎকার সম্পর্ক। শিক্ষকরা প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যোগ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোনদিন আমরা রাজনীতি লক্ষ্য করিনি। আমরাও শিক্ষকদের প্রচণ্ড সম্মান করতাম। কোন শিক্ষক যদি ভাল না পড়াতেন তাহলে পিছনে কেউ কেউ হয়ত কমেন্ট করেছে কিন্তু কখনই সে সব শিক্ষকের সাথে কেউ বেআদবী করেনি।

আমাদের সময়ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ছিল। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শও ছিল। কিন্তু তাই বলে কখনও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে

www.pathagar.com

দেখিনি। তবে সত্যি কথা বলতে কি আমাদের সময় যারা বামপন্থী রাজনীতি করতেন তারা ছিলেন বেশ উগ্র। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল যে তাদের পথটাই সঠিক। ফলে অন্যদেরকে তারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন। আমি বরাবরই ধর্মভীরু, ইসলামে বিশ্বাসী। তাই মাঝে মাঝে আমাকেও কটুক্তি শুনতে হত। সম্ভবত ১৯৬০ কিংবা ৬১ সাল হতে পারে। সন বা তারিখ নির্দিষ্টভাবে এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আসলে অনেক দিনের স্মৃতি তো। সন তারিখে ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। কারণ তখন কখনো ভাবিনি তিন যুগ পরে বর্তমান জেনারেশনের কাছে এ স্মৃতি আবার তুলে ধরতে হবে। যাহোক, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সে সময় মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। ঢাকার পরিবেশ এতে বেশ উত্তপ্ত হয়। তৎকালীন ডাকসু নেতৃবৃন্দ কি এক কারণে এ ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের উপস্থিতিতে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। আমিও ঐ সভার একজন বক্তা ছিলাম। সভা শেষে হঠাৎ সাধারণ ছাত্ররা ডাকসু ভবন আক্রমণ করে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমিও বিমূঢ় হয়ে যাই। এমনকি মর্মাহতও হয়েছিলাম। এঘটনা পরে অবশ্য বেশি দূর গড়ায়নি।

আমি ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম। তখন ঐ হলের পরিবেশ ছিল খুবই সুন্দর। অনেক দিন তো ঐ দিকে যাইনি তাই জানি না এখন কেমন আছে। তবে বাইরে থেকে মনে হয় পরিবেশ আগের মত নেই। আমাদের সময় দেখেছি হল আঙিনায় নিয়মিত ঘাস কাটা হত, ফি বছর হোয়াইট ওয়াশ করা হত। বাগানে নানা ধরনের ফুল গাছ ছিল, কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটত, টেনিস লন ছিল। এখন আমার সেই প্রিয় হল তেমন আছে কিনা বড় জানতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঐ দিকে যেতে পারি না। এক অজানা শঙ্কায় মন কেঁপে উঠে।

আমাদের সময় হল নানা অনুষ্ঠানে জমজমাট থাকত। ডিবেট হতো, খেলাধুলা হতো, সুন্দর এক পরিবেশ ছিল। আমরা অবসরে খেলাধুলা করতাম। কেউ কেউ আবার হাঁটতে বের হতাম। তখন তো ঢাকা শহরে এত লোকের বসবাস ছিল না। রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম ছিল না, এত গাড়িও ছিল না। ঢাকা ছিল সুন্দর ছিমছাম একটি শহর। হাঁটতে হাঁটতে দুই-তিন মাইল অব্দি চলে যেতাম।

আমাদের সময় ছেলে-মেয়েদের মাঝে মেলামেশা কম ছিল। পোষাক-আশাকও মার্জিত ছিল। ফ্যাশানের নামে কোন উগ্র পোষাক কেউ পরত না। সবখানে একটি পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ ছিল।

www.pathagar.com

আজকে অনেকে ছেলে-মেয়েদের খারাপ হবার পিছনে যুক্তি দেখাচ্ছেন জেনারেশন গ্যাপ বলে। কিন্তু আমার মতে এটা ঠিক নয়। সময়ের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মানুষের প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ মমতার কোন পরিবর্তন হয়নি, মানবতার কোন পরিবর্তন হয়নি। যা হয়েছে তা বাহ্যিক, সাময়িক। আমি তাই এ প্রজন্মের ছাত্রদেরকে বলব চকচকে জিনিসটার পিছনে না গিয়ে গভীর জিনিসটার প্রতি এগিয়ে যাও। মৌলিক সততার প্রতি ঝোঁক। সততাই জীবনকে করবে ফুলের মত সৌরভময়। সেই সৌরভ সর্বত্র তোমরা ছড়িয়ে দাও।

www.pathagar.com

প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ

মাসিক 'পৃথিবীর' জুন, ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রশ্নোত্তর'-এ সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী সাহেবের প্রভিডেন্ড ফান্ডের সুদ সম্পর্কিত আলোচনা মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে নিম্নোক্ত অংশ।

"অনুরূপভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডে সরকার যে অতিরিক্ত টাকা দেয় এবং সুদের নামে অতিরিক্ত অর্থ কর্মচারীদের নিকট থেকে নিয়ে তাদেরকে দেয় তা সবই অনুদান হিসেবে পরিগণিত। আর এরূপ অনুদান শরীয়তে জায়েয।"

এ বক্তব্যের ফলে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে যে সরকার বর্তমানে যে শতকরা ১৪.৫% সুদ দিচ্ছেন এবং সুদ নামে দিচ্ছেন তা বৈধ। এ বিভ্রান্তি আরো বৃদ্ধি পাবে মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ সাহেবের এবং ইমদাদুল ফতওয়ার এ ফতোয়া উল্লেখ করায় যে, "প্রভিডেন্ট ফান্ডের সব ধরনের সুদ জায়েয।"

এ উপমহাদেশের সরকারি প্রভিডেন্ট ফান্ড সম্পর্কে এবং এদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ কতটুকু জানতেন সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যা হোক, বাংলাদেশের সরকারি প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ পুরোপুরি সুদ তাতে কোন সন্দেহ নেই। সরকার এটা সুদ নামেই দেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত সুদের হারকে (ব্যাংক রেটের) ভিত্তি ও সম্পর্কিত করে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার নির্ধারণ করেন। ব্যাংক রেট পরিবর্তন করা হলে সরকার এ সুদের হার পরিবর্তন করেন। অর্থনীতিবিদদের ভাষায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ সুদই, অনুদান নয়। কেননা, সরকারি প্রভিডেন্ট ফান্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহ করা। সরকার এভাবে যে টাকা সংগ্রহ করেন তা সরকারি কাজে ব্যবহার করেন এবং এর ওপর উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে সুদ দিয়ে থাকেন।

প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ সম্পর্কে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং'-এ এ সম্পর্কে লিখেছেন, "যারা ব্যবসায়িক অক্ষমতা বা নিজের সম্পদ সংরক্ষণ অথবা বর্তমান জাতীয় নৈরাজ্যের কারণে নিজের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তার জন্য ব্যাংকে অর্থ জমা রাখে বা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে বীমা করায় অথবা কোন নিয়মের অধীনে প্রভিডেন্ট

www.pathagar.com

ফান্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের কেবলমাত্র নিজের আসল পুঁজি বা মূলধনকেই নিজের সম্পদ মনে করতে হবে (সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, পৃ. ১২১)। পাকিস্তানের ভূতপূর্ব অডিটর জেনারেল জনাব সাইয়েদ ইয়াকুব শাহের এক পত্রের উত্তরে তিনি লিখেন, 'আমার মতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ওপর সুদের যে অংশ আপনার জমা হয়েছে তা আপনি নিজের জন্য ব্যয় করবেন না। এর হারাম হওয়া সম্পর্কে যদি নিশ্চিত নাও হন, তথাপি এতো সন্দেহযুক্ত বটেই। যার পবিত্র হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই' (সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, পৃ. ১৫৪)।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কোন অবস্থাতেই প্রভিডেন্ট ফান্ডের বর্তমান সুদ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এ কারণেই উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ গ্রহণ করেন না বা নিজের জন্য ব্যবহার করেন না। তবে এই ব্যবস্থার সংস্কার সম্ভব। সরকার যদি সত্যিকারভাবে একে একটি 'আতিয়াত' বা দান ভিত্তিক ব্যবস্থায় রূপান্তর করেন (অর্থাৎ হারের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যেমন কর্মচারী যত টাকা জমা দিবেন তত টাকা সরকার দিবেন বা এ রকম) তাহলে তা বৈধ হতে পারে। যতদিন তা না করা হচ্ছে, এ সুদে ততদিন জড়িত না হওয়াই সবার জন্য সংগত।

www.pathagar.com

নারী-পুরুষের সম্পর্কের কিছু বিচার্য বিষয়

নারী-পুরুষের পার্থক্য অনেকে খুব বেশি করে দেখান। এটা কতটুকু সঠিক তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কুরআনুল কারীমের ৬৬০০-এর অধিক আয়াতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি আয়াতে নারী-পুরুষের পার্থক্যের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে দেখা য়ায় যে, কেবল সাক্ষ্য ও উত্তরাধিকারের কিছু ক্ষেত্রে (সকল ক্ষেত্রে নয়) পুরুষের কিছু অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে। এ রকম আরো দু-এক বিষয় আছে। অন্যদিকে ভরণপোষণ, মোহরানা, মায়ের অধিকার, সন্তানের হিদানাত (সন্তানের জিম্মা বা Custody) এর ক্ষেত্রে অধিকার বেশি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, মানবাধিকারের মৌলিক দিকসমূহে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

প্রথমত ঃ মূল মানুষটি হচ্ছে রুহ। এ রুহ সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে এবং এ রুহ একই রকম। অর্থাৎ সকল মানুষই একই রকম রুহ এর অধিকারী। সূরা আরাফের ১৭২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তিনি সকল রুহ একত্রে সৃষ্টি করেছেন এবং সকল মানুষকে একই প্রশ্ন করেছেন যে, আলাসতু বি রাব্বিকুম (আমি কি তোমাদের রব নই?)। তখন সকল মানুষই একই উত্তর দিয়েছে 'বালা' (হ্যাঁ)। একই কথা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ কুতুব তাঁর Islam, the Misunderstood Religion গ্রন্থে 'ইসলাম ও নারী' প্রবন্ধে বলেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ রুহ-এর পর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে মানুষের শরীর, যার অংশ হচ্ছে আমাদের Brain, heart, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আল্লাহ তাআলা সূরা তীনে বলেছেন যে, "আমি সকল মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি।" অর্থাৎ নারী-পুরুষ সকল মানুষই প্রথম শ্রেণীর, কেউ দ্বিতীয় শ্রেণীর নয়।

তৃতীয়ত ঃ আমরা (পুরুষ নারী) সকলেই আদম ও হাওয়ার সন্তান (সূরা নিসা ঃ ১)। অর্থাৎ আমরা সকল পুরষ-নারী এক পরিবারের সদস্য। এদিক থেকে এক পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদের সম্মান মূলত এক। এছাড়া সূরা হুজরাতে আল্লাহ বলেছেন যে, নারী-পুরুষ হওয়া নয়, তাকওয়া সম্মানের পার্থক্যের ভিত্তি (ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আতকাকুম)।

www.pathagar.com

চতুর্থত ঃ সকল মানুষই আল্লাহর খলীফা। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ পাঠাবার সময় বলেছিলেন যে, "'ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদি খলীফা" (আমি পৃথিবীতে খলীফা প্রেরণ করতে যাচ্ছি)। সকল মানুষই আল্লাহর খলীফা খলীফাতুল্লাহ। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই (দ্রষ্টব্য ঃ সূরা বাকারা ঃ ৩০)।

পঞ্চমত ঃ সূরা আহযাবের ৭২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি পৃথিবী, আকাশ ও পাহাড়কে আল্লাহর আমানত নেওয়ার কথা বলেছিলেন কিন্তু কেউ সম্মত হয়নি। কিন্তু মানুষ সে দায়িত্ব গ্রহণ করল (ওয়া হামালাহাল ইনসান)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আমানতের দায়িত্ব সকল মানুষ বহন করছে, কেবল পুরুষরা নয়। এখানে আল্লাহ 'পুরুষ' শব্দ ব্যবহার করেননি। 'মানুষ' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এসব মৌলিক বিষয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা রয়েছে। অন্যান্য অসংখ্য ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সুতরাং বলা যায় যে, নারী-পুরুষের কিছু পার্থক্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত নয়। একথাও মনে রাখতে হবে, পার্থক্য মানে সম্মান-অসম্মান নয়।

আশা করা যায়, এ ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি ও ভুল বোঝাবুঝি আছে এ আলোচনার পর তা দূর হবে। নারী-পুরুষের দায়িত্বের সীমা কতটুকু সে সম্পর্কেও এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

প্রথমত ঃ স্বীকার করতে হবে যে, মাতৃত্বের দায়িত্ব (বিশেষ করে শিশু লালন-পালনের দায়িত্ব) প্রধানত নারীদের। তেমনিভাবে (যেহেতু পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ করতে হবে, সে জন্য) রুজি-রোজগারের দায়িত্ব বিশেষ করে পুরুষের। তা পুরুষদের করতেই হবে।

কিন্তু প্রধান প্রধান সকল দায়িত্ব নারী-পুরুষ দু'জনেরই। এ সম্পর্কে সূরা তওবার ৭১ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের ওয়ালী (বন্ধু, সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক)। তারা মারুফ কাজের আদেশ দেয়, আর মুনকার থেকে নিষেধ করে; তারা নামায কায়েম করে, আল্লাহর আনুগত্য করে এবং রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের ওপর আল্লাহ্‌ রহম করবেন। আল্লাহ ক্ষমতাশালী ও জ্ঞানী।"

এখানে দেখা যাচ্ছে সকল মারুফ প্রতিষ্ঠা করা ও সকল মুনকার প্রতিরোধ করা (যা ইসলামী রাজনীতি ও সমাজ গঠনের মূলকথা) নারী-পুরুষের সমান

www.pathagar.com

দায়িত্ব। তেমনিভাবে নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্য করা অর্থাৎ ইসলাম পূর্ণভাবে কার্যকরী করতে নারী-পুরুষ দু'জনেরই সমান দায়িত্ব।

সুতরাং নারী-পুরষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্মক্ষেত্র যে সম্পূর্ণ পৃথক তা কুরআনের আলোকে বা রাসূলের যুগের সমাজের আলোকে দেখা যায়না। এ প্রসঙ্গে আমি সবাইকে 'রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' (৬ খণ্ডে রচিত; বাংলায় তিন খণ্ড পাওয়া যায়) বইটি পড়তে অনুরোধ করি। বইটি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (IIIT) এবং ইন্টরন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (ইফসু) কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বইটির লেখক হচ্ছেন আল-আজহারের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা আব্দুল হামিদ আবু শুক্কাহ।

www.pathagar.com

মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের ইতিহাস

আমার চাকরি জীবন শুরু হয় ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে একজন ফাইন্যান্স সার্ভিস অফিসার হিসেবে এবং শেষ হয় ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে। এ সময়ের মধ্যে আমি দুর্নীতি দমন সংস্থার মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সচিব হিসেবে কাজ করি। এসব পদে থাকায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমি অংশ নেই তার মধ্যে রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনে মূল দায়িত্ব পালন, বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকা অবস্থায় আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচিকে সাধ্যমত কার্যকর করা।

মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে প্রবর্তন করাটাকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যায়। এ সময়ের অনেক স্মৃতি আমার মনের কোণে বিরাজ করছে, যার কিছু কিছু অংশ আমি এ নিবন্ধে পাঠকদের অবগতির জন্য তুলে ধরতে চাই। মুল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের অনেক কাহিনীই আমার জানা আছে, যা হয়তো অনেকেই জানে না। এসব ঘটনার বর্ণনায় কিছু সাল তারিখ ভুল হতে পারে, কিন্তু মূল কথা সঠিক।

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের রাজস্ব বোর্ডের অবস্থা ভাল করার জন্য বিশ্বব্যাংক একটি রিপোর্ট দেয়, যা আর্থিক খাত সংস্কার রিপোর্ট নামে পরিচিত। ১৯৮৯ সালের পূর্বে এ রিপোর্টের ওপর তেমন কোন কাজ হয়নি। ঐ সালের মধ্যভাগে আমাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য শুল্ক থেকে সরিয়ে সদস্য আবগারি করা হয়। আমার বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকারে উচ্চমহলে কিছু মিথ্যা অপপ্রচারের কারণেই আমার এ বদলি হয়েছিল। অথচ ঐসব অভিযোগ ছিল মিথ্যাচার। সরকারের উচ্চমহলের আত্মীয়ের কিছু অন্যায় আবদার রাখতে পারিনি বলেই আমার ঐ পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু এ পরিবর্তন আমার জন্য বড়ই উপকারী প্রমাণিত হয়। এর ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য আবগারি হিসেবে আমি মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রবর্তনের দায়িত্ব পাই। কেননা এটি ছিল মূলত দেশের আবগারি ব্যবস্থা পরিবর্তন করার একটি উদ্যোগ, যদিও এর ফলে দেশের বিক্রয় করও রহিত হয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের অংশ হিসেবে আমরা ১৯৮৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে ভারত, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া সফর করি। থাইল্যান্ড তখনও মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করেনি। তারা এ জন্য তৈরি হচ্ছিল।

ফিলিপাইন একটি পূর্ণ ভ্যাট ব্যবস্থা এক দু'বছর পূর্বেই কার্যকর করেছিল। সেখানে তাদের ব্যবস্থা দেখি এবং আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হই, যদিও আমরা খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট (Retail Level VAT) শুরুতে কার্যকর করিনি।

ভারতে কোন ভ্যাট ছিল না। তারা তাদের এক্সাইজের মধ্যে ভ্যাট-এর একটি বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ Crediting mechanism বা পূর্ববর্তী পর্যায়ে দেওয়া বিক্রয় কর বা আবগারি শুল্ক উৎপাদনের পরবর্তী পর্যায়ে ফেরত দেওয়ার একটি পদ্ধতি) গ্রহণ করেছিল। ইন্দোনেশিয়াতে পাইকারি বা Wholesale পর্যায় পর্যন্ত ভ্যাট ছিল। পাইকারী পর্যায় তাদের জন্য বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। তাদের তখনকার দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জনাব মারী মুহাম্মদ, যিনি পরবর্তীকালে অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন, আমাদের বলেছিলেন, আমরা যেন কখনো Wholesale পর্যায় পর্যন্ত ভ্যাট না করি। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, হয় উৎপাদন অথবা খুচরা পর্যায় পর্যন্ত ভ্যাট করা উচিত। কেননা, হোলসেল এবং রিটেইলের মধ্যে পার্থক্য করা খুবই ঝামেলাপূর্ণ। আমরা অবশ্য শুরুতে উৎপাদন পর্যায় পর্যন্তই করেছিলাম।

দেশে এসে আমরা ভ্যাট প্রবর্তনের কাজ জোরেসোরে শুরু করি। তৎকালীন সরকারকে বুঝাতে আমাদের বেশ কষ্ট হয়। ভ্যাট তখন সর্বমহলে অপরিচিত ছিল। সবাই সন্দেহের চোখে দেখত। তবু আমরা সরকারের উচ্চ পর্যায়কে বুঝাতে সমর্থ হই এবং সর্বশেষে ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী পরবর্তী বাজেটে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করা হবে বলে ঘোষণা দেন।

আমরা মূল্য সংযোজন কর আইন তৈরি করা শুরু করি। আমরা প্রথমত ইংরেজিতে একটি খসড়া তৈরি করি। কিন্তু পরে পরীক্ষা করে দেখি যে, এখন আর ইংরেজিতে আইন সংসদে উপস্থাপন করা যাবে না। সে প্রেক্ষিতে আমরা বাংলায় একটি খসড়া তৈরি করি। আমার সরাসরি তদারকিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তৎকালীন প্রথম সচিব ড. জাহিদ হোসেন সে খসড়াটি তৈরি করেন। এরপর এর আইনগত ও ভাষাগত সংশোধনের জন্য জনাব গাজী শামসুর রহমানের সহযোগিতা গ্রহণ করি। তিনি খসড়াটি দেখে দেন এবং যেসব ভাষাগত ও টেকনিক্যাল ধরনের পরিবর্তনের কথা বলেন তা আমরা গ্রহণ করি।

এরপর আমরা খসড়াটি আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং-এর জন্য প্রেরণ করি। সেখানে এটির ভেটিং সম্পন্ন করতে আমাদের প্রায় ১২-১৮ মাস লেগেছিল।

www.pathagar.com

বহু অনুরোধ-উপরোধ করে আমরা এ কাজটি আইন মন্ত্রণালয় থেকে করাতে সক্ষম হই। আইন মন্ত্রণালয়ে এ জন্য ড. জাহিদ হোসনেকে বহুদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় যেসব জটিল জটিল প্রশ্ন তুলত তার তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়ার প্রয়োজন হতো। সে কাজ আমি ড. জাহিদ হোসেন ও তৎকালীন আমাদের আইএমএফ কনসালট্যান্ট জনাব আহসান মনসুরের সহায়তায় করেছিলাম। যাহোক এ কাজ আমরা মার্চ ১৯৯১-এর মধ্যে সম্পন্ন করি এবং জাতীয় সংসদে উত্থাপনের পূর্বে তা মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপন করি। মূল্য সংযোজন কর আইনটি যেদিন মন্ত্রিপরিষদে আলোচনা হচ্ছিল সেদিন তৎকালীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব জনাব নূরুল হোসাইন খানকে সহায়তা করার জন্য আমি মন্ত্রিপরিষদ সভায় যাই। মন্ত্রিপরিষদে মূল্য সংযোজন কর আইন প্রবর্তন করায় ব্যাপক বিরোধিতা করা হয়। কেননা, মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কে মন্ত্রীদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে যা বাস্তবে নেই তার সম্পর্কে ধারণা নেওয়া খুবই কঠিন। মন্ত্রিপরিষদে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, যদি মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ না করি তাহলে আমাদের আবগারি কর আরো ব্যাকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে, তাহলে কর ব্যবস্থার সংস্কারও হবে না।

অন্যদিকে করভার বেড়ে যাবে। তখনও জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনিও বলেন যে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা কর ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলেছি। যদি মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা গ্রহণ না করি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মূল্য সংযোজন কর আইন অনুমোদন করে।

আমরা সবকিছু চিন্তা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করি যে, ১ জুলাই ১৯৯১ থেকে মূল্য সংযোজন কর আইন কার্যকর হবে এবং সেদিন থেকেই মূল্য সংযোজন কর আমদানি পর্যায়ে এবং উৎপাদন পর্যায়ে আদায় করা হবে। ১৯৯১ জুলাই থেকেই বিক্রয় কর আইন বাতিল হয়ে যাবে এবং বিক্রয় কর আদায় হবে না। একই সাথে কয়েকটি পণ্য ছাড়া সকল পণ্য আবগারি তালিকা থেকে প্রত্যাহার হয়ে যাবে এবং মূল্য সংযোজন করের আওতায় চলে আসবে। নানা কারণে আমাদের কয়েকটি পণ্যকে আবগারির আওতায় রাখতে হয়েছিল। কেননা, ১৫% হারে তখনই এসব পণ্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা সম্ভব বা সংগত ছিল না। এ জন্যই আবগারি আইনকে বহাল রাখতে হয়েছিল, কিন্তু তার আওতাধীন পণ্য তালিকায় মাত্র কয়েকটি পণ্য রয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

বাজেটের পূর্বে সংসদে অধিবেশন বসা সম্ভব ছিল না বলে মূল্য সংযোজন কর-আইনটি আমাদেরকে অধ্যাদেশ হিসেবে জারি করতে হয়। তদুপরি যদিও মূল্য সংযোজন কর আইনটি কর আদায়ের জন্য ১ জুলাই ১৯৯১ থেকে কার্যকর করা জরুরি ছিল, কিন্তু যেসব পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হবে তাদেরকে পূর্বেই রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধিত করার প্রয়োজন ছিল। সে জন্য আইনের কয়েকটি ধারা ১ জুন থেকেই কার্যকর করা প্রয়োজন ছিল। সে সময় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বাংলাদেশ এইড কনসোর্টিয়ামের সভায় যোগদান করার জন্য প্যারিস চলে গিয়েছিলেন। অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমানও সেখানে ছিলেন। সে কারণে আমি অধ্যাদেশে অনুমোদন গ্রহণ করার জন্য খুব সম্ভবত ২৯ মে '৯১ সালে রাষ্ট্রপতির অফিসে যাই। রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সচিব আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি আগেই সময় ঠিক করে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন, কিছু বিষয় অবহিত হন এবং পরের দিন ৩০ মে '৯১ তার সরকারি বাসা থেকে নথি নিতে বলেন। পরদিন আমি যথাসময়ে রাষ্ট্রপতির বাসায় যাই। তিনি তার সদয় সম্মতি ও স্বাক্ষরসহ নথি ফেরত দেন এবং আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে বলেন। আইন মন্ত্রণালয় থেকে যথাসময়ে অধ্যাদেশটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারি করা হয়। দিনটি ছিল ৩১ মে ১৯৯১। বাংলাদেশের কর প্রশাসন ব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক দিন। আইনের কয়েকটি ধারা ১ জুন '৯১ থেকে ঐ আইনের বিধান মোতাবেক একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কার্যকর হয়, যাতে আমরা যেদিন থেকে কর আদায় করা হবে (অর্থাৎ ১ জুলাই ১৯৯১) তার পূর্বেই নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারি।

এরপর শুরু হয় আইন কার্যকর করার গভীর সমস্যা। যতটুকু মনে পড়ে, ১৯৯১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা বিজ্ঞাপন দেই যে, কি কি নতুন আইটেমের ওপর মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য (অর্থাৎ ঐসব স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের নাম উল্লেখ করা হয় যা পূর্বে আবগারি আওতায় ছিল না)। ঐ তালিকায় প্রায় একশ' পণ্যের উল্লেখ ছিল যা দেশে উৎপাদিত হয় অথচ পূর্বে আবগারি কর ব্যবস্থার আওতায় ছিল না। ঐ তালিকা প্রকাশ করায় কি গভীর প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা আমাদের ধারণাই ছিল না। যদিও মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের পূর্বে সকল চেম্বার নেতার সাথে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছিল এবং তারা জানতেন যে, সকল স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের ওপর এ কর প্রযোজ্য হবে। তথাপি বিজ্ঞাপনের পর অনেক মহল থেকেই এর বিরুদ্ধে নতুন সরকারের (বিএনপি) নেতৃবৃন্দের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। নতুন সরকার বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান দারুণ চাপের

www.pathagar.com

সম্মুখীন হন নিজের দলের ভেতর থেকেই। সকল বিরোধীদল এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। পরিস্থিতির অবনতি হলে আমি ও আমার তৎকালীন সচিব অর্থমন্ত্রীকে বলি যে, সরকার যদি মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের প্রস্তাবের কারণে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকে এবং আমাদের পদত্যাগের ফলে যদি পরিস্থিতির উন্নতি হয় তাহলে আমরা পদত্যাগ করতে রাজি আছি। জনাব সাইফুর রহমান অবশ্য পদত্যাগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, এর ফলে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হবে না। পদত্যাগ করতে হলে তাকেই পদত্যাগ করতে হবে। তিনি বরং আমাদের মূল্য সংযোজন করের সুবিধাদি ব্যাখ্যা করে প্রচারাভিযানে নামতে বলেন। এরপরে পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আমরা প্রচার অভিযানে নামি। আমরা বিভিন্ন রকম পোস্টার ছাপিয়ে সারাদেশে লাগাবার ব্যবস্থা করি। বিভিন্ন চেম্বারে গিয়ে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করি। বিভিন্ন চেম্বারে আমি তিক্ত আক্রমণের সম্মুখীন হই। কিন্তু তখন ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। সকল শিল্প এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসি, যাতে পরিস্থিতি সহজ হয়ে আসে।

১৯৯১ সালের ১০ জুলাইয়ের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর অধ্যাদেশটিকে সংসদে আলোচনার মাধ্যমে আইনে পরিণত করা আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার তা করবে কিনা সে সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিল।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমাদের এক আলোচনা হয়। জনাব সাইফুর রহমান সভায় জনাব নূরুল হোসেন খান ও আমাকে নিয়ে যান। মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের মূল দায়িত্ব তখন আমার ওপর ছিল। তাই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও আমার ওপর ছিল। সে সভায় আরো কয়েকজন মন্ত্রী ও সচিব উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই সম্মত হতে পারছিলেন না। সে পরিস্থিতিতে আমি কথা বলা শুরু করি। আমি প্রধানমন্ত্রীকে খুব সুস্পষ্ট কথা বলি। আমি বলেছিলাম যে, আমি ছাত্র রাজনীতির সাথে ছাত্রাবস্থায় জড়িত ছিলাম। আমি তার সমস্যা বুঝি। আমি মনে করি, তার পিছাবার উপায় নেই। তাহলে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক ওয়াদা ভঙ্গের অভিযোগ তুলবে। তবে সমস্যা সহজ হয়ে আসবে যদি কিছু ক্ষুদ্র আইটেমের ওপর থেকে মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়। এরকম একটি তালিকা আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে তৈরি করে দিতে পারি। কি হলো জানি না—তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং এরকম একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিতে বলেন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাকে বিএনপি সংসদীয় দলের সভায়ও নিয়ে যান। সেখানে আমি মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করি। এটা ছিল

www.pathagar.com

আমার এক অনন্য অভিজ্ঞতা। সভায় তুমুল হৈচৈ হচ্ছিল। তার মধ্যেই আমি বক্তব্য রাখি। হৈচৈয়ের কারণে আমি থেমে যাইনি। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, কথা বলে যাওয়াই উত্তম পন্থা। কারণ বুঝানো প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত জুলাইয়ের ১০ কি ১১ তারিখ অর্থাৎ মূল্য সংযোজন কর অধ্যাদেশ বাতিল হওয়ার শেষ দিন সংসদে বিলটি পাস করার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। আমি সচিবের সংসদস্থ কামরায় শুয়ে শুয়ে ক্লান্ত শরীরে সংসদের আলোচনা শুনছিলাম।

অতি দ্রুত বিলের আলোচনা সমাপ্ত করা হয়। বিরোধী দলের আনীত সকল সংশোধনী এবং বিবেচনা, বিলম্ব করার সকল প্রস্তাব সংসদে প্রত্যাখান করা হয় এবং বিলটি সংসদে পাস হয়ে যায়। বিরোধী দলের সকল সদস্য সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে।

ইতোমধ্যে মূল্য সংযোজন কর আদায় ১৯৯১ সালের ১ জুলাই থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। পূর্বেই সকল শিল্প ইউনিট যাদের নিবন্ধন করা প্রয়োজন ছিল তা পূর্বের আবগারিযোগ্য পণ্য তালিকা এবং আমাদের সূত্র থেকে পাওয়া অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছিল। সর্বপ্রথম প্রত্যেকের নিবন্ধন নম্বর তাদের কারখানায় পৌছে দেওয়া হয়েছিল। মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের সময় সব দেশেই তা করা হয়ে থাকে। এদিক থেকে অবশ্য এটা অভিনব কিছু ছিল না। মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের আর একটি নিয়ম হচ্ছে 'শিক্ষা সফর' অর্থাৎ প্রত্যেক মূল্য সংযোজন করদাতাকে তার স্থানে গিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে আসা। এটাও করা হয়েছিল। তবে আশানুরূপভাবে নয়।

মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের পর আমরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হই। তার একটি হচ্ছে কুটির শিল্প থেকে আন্দোলন। সাধারণত মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় ছোট শিল্পকে কমহারে মূল্য সংযোজন কর না দিয়ে টার্নওভার কর দিতে হয়। তবে তারা তাদের ব্যবহৃত উপকরণের ওপর রেয়াত (Credit of previously paid value added tax) পান না। মূল্য সংযোজন করের বৈশিষ্ট্য হলো সকল উৎপাদকের (প্রকৃতপক্ষে ভোক্তার) কাছ থেকে কিছু কিছু করে কর আদায় করা। কিন্তু কুটির শিল্পসমূহ সম্পূর্ণ করমুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর মাধ্যমেই বাংলাদেশের প্রবর্তিত মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় প্রথম বিচ্যুতি (distortion) প্রবেশ করে। এভাবেই মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় টার্নওভার করের সাথে সাথে এক দল উৎপাদকের

www.pathagar.com

ওপর মূল্য সংযোজন কর 'শূন্য' হয়ে যাওয়ায় এ ব্যবস্থায় গুণগত দুর্বলতা ঢুকে পড়ে, যা ভবিষ্যতে দূর করা অপরিহার্য।

যে মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে প্রবর্তন করা হয়েছিল তা ছিল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বাধুনিক মূসক ব্যবস্থা। তবে তার প্রয়োগ করা হয়েছিল কেবল আমদানি ও উৎপাদন (Import and Manufacturers) পর্যায়ে। কিছু সেবা (services)-এর ওপর মূসক আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে আরোপ করা হয়নি। সাধারণত অধিকাংশ দেশে খুচরা (retail) পর্যায় পর্যন্ত মূসক আরোপ করা হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাংক ও আমাদের বিবেচনায় খুচরা পর্যন্ত মূসক আরোপ করা আমাদের দেশে এখনো সম্ভবপর নয়। তার জন্য আরো অনেক প্রস্তুতি দরকার। মূসক আরোপের পর প্রায় ৯ বছর হয়ে গেছে। কিন্তু সে প্রস্তুতি আমরা নেইনি। বরং মূসককে বিকৃত করে খুচরা পর্যায়ে কিছু পণ্যের ওপর মূসককে নিয়ে গেছে। এর ফলে মূসক ব্যবস্থার সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যতে সরকারের দায়িত্ব হবে খুচরা পর্যায়ের মূসককে পুরোপরি পুনর্মূল্যায়ন করে ২/৩ বছরের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক খুচরা ব্যবসায়ী ও জনগণের নিকট খুচরা পর্যায়ের মূসক ব্যবস্থাকে ভাল করে ব্যাখ্যা করে এ ব্যবস্থাকে খুচরা পর্যায়ে কার্যকরী করা।

১৯৯১ সনে প্রবর্তিত মূসক ব্যবস্থার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছিল অপ্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যকে (Unprocessed agricultural produce) এর বাইরে রাখা। রফতানিতে শূন্য হার প্রয়োগ করা (অর্থাৎ রফতানিতে মূসক ব্যবস্থাপনায় এবং রফতানি পণ্যে ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর ধার্যকৃত মূসক ফেরত দেওয়া)। উৎপাদনের মূল পর্যায়ে আদায়কৃত মূসক (একাউন্ট কারেন্টের মাধ্যমে) পরবর্তী পর্যায়ে আদায়যোগ্য মূসক থেকে বিয়োগ করা (instant credit of VAT) সুবিচারের স্বার্থে বিলাসপণ্যের ওপর একটি অতিরিক্ত কর (যাকে আমরা সম্পূরক শুল্ক বলেছিলাম) ধার্য করা এবং ছোট ইউনিটের ওপর মূসক ধার্য না করে টার্নওভার ট্যাক্স ধার্য করা। এসবই ছিল একটি উন্নত মূসক ব্যবস্থার অংশ।

মূসক কার্যকরী করতে গিয়ে আমাদের অসংখ্য সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছিল। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি। ১ জুলাই ১৯৯১-তে মূসক প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী হয়েছিল। আমাদের কোন উদ্দেশ্য ছিল না ধান, চাল, গম, সুজি ইত্যাদির ওপর মূসক ধার্য করা। কিন্তু নোটিফিকেশনের শব্দের ব্যবহার যথার্থ না হওয়ায় এসবের ওপর মূসক ধার্য হয়ে যায়। সকল স্থান

www.pathagar.com

থেকে টেলিফোন ও টেলেক্স আসতে থাকে যে, এসবের ওপর মূসক আদায় করব কিনা। আমাকে সাথে সাথে উত্তর দেওয়া আবশ্যক ছিল। এসবের ওপর মূসক আদায় করলে সাংঘাতিক জনরোষ সৃষ্টি হতো এবং সরকারকে আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হতো। নথির মাধ্যমে আদেশ নেওয়ার সুযোগ ছিল না। তাই আমাকে দায়িত্ব নিয়ে টেলিফোনেই সিদ্ধান্ত দিতে হয় (যা সেদিনই পরে telex-এর মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিই)। এ সিদ্ধান্ত দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলে ভীষণ সমস্যা সৃষ্টি হতো।

আজ পিছনে ফিরে তাকালে মনে হয় যে, এ ব্যাপারে আমি নিয়মনীতি পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারিনি। কেউ চাইলে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতো। কিন্তু কেবল দেশের স্বার্থে আল্লাহ্‌র নামে আমি এ ধরনের কিছু তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। কেননা মূসক কার্যকরী করার (implementation) সামগ্রিক দায়িত্ব ছিল আমার ওপর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর ভ্যাট সেলের প্রধান হিসেবে। আমরা মূসক আইনে উৎপাদক কর্তৃক ঘোষিত খুচরা মূল্যের ওপর মূসক ধার্যের একটি বিধান রেখেছিলাম। এটা ছিল পূর্বতন এক্সাইজ এক্টের একটি ধারণা, যেটা আমরা মূসক আইনে ধার (Borrow) করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল খুচরা পর্যায়ে মূসক আদায় ব্যবস্থা প্রয়োগ না করেই উৎপাদকের নিকট থেকে খুচরা মূল্যের ওপর মূসক আদায় করা। আমাদের আইএমএফ কনসালট্যান্ট জনাব আহসান মনসুর এর উৎসাহী উদ্যোক্তা ছিলেন। আমরা ১ জুলাই থেকে কার্যকর করে একটি নোটিফিকেশন জারি করে বেশ কিছু পণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর মূসক ধার্য করি। কিন্তু আমাদের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। আমরা চেম্বারসমূহ থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হই। তাদের যুক্তি ছিল যে সরকার বলেছেন যে, কেবল উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত মূসক ধার্য করবেন। অথচ এভাবে কিছু পণ্যের ওপর খুচরা পর্যায়ে মূসক ধার্য করা হচ্ছে। আমরা যা করেছিলাম তা আইনসম্মত ছিল। কিন্তু তাদেরও একটি যুক্তি ছিল। ফলে মূসকের প্রতি প্রতিরোধ কমিয়ে আনার স্বার্থে আমরা খুচরা মূল্যের ওপর মূসক তুলে নেই এবং উৎপাদন পর্যায়ের মূল্যের ওপরই মূসক আদায় করার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা শুল্ক আইন ও এক্সাইজ আইন থেকে ট্যারিফ মূল্য ধার্যের একটি ধারণাও ধার নেই। এটা ছিল আমার মত যে, এটা করা উচিৎ হবে। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত মূসক আইনে তা নেই। এটা আমাদের বেশ কাজে লেগেছিল। যেমন চিনির ওপর শতকরা ১৫% হারে মূসক ধার্য করলে সুগার মিল কর্পোরেশন তাদের চিনি বাজারজাত করতে সক্ষম ছিল। অথচ মূসক প্রত্যাহার করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে চিনির জন্য মূসকের অন্য হার করাও সম্ভব ছিল না। কেননা আইনে একটি হার ছিল এবং

www.pathagar.com

মূসকের একটি হার করাই সর্বাধুনিক মূসক ব্যবস্থার অংশ। এ সমস্যার সমাধান করি ট্যারিফ মূল্য প্রয়োগ করে অর্থাৎ আমরা চিনির জন্য প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তে অনেক কম মূল্যকে চিনির ট্যারিফ মূল্য ঘোষণা করি। এভাবে প্রকৃত মূল্য হ্রাস করার ফলে শতকরা ১৫ ভাগ মূসক থাকা সত্ত্বেও টাকার অংকে মূসক কমে যায়। এভাবে কাগজ এবং এ ধরনের পণ্যের সমস্যার সমাধান করা হয়।

নির্মাণ সংস্থার ওপর, বাড়ি-ঘর নির্মাণের সার্ভিসের ওপর মূসক ধার্য করা হয়। কিন্তু বাড়ির পূর্ণ মূল্যের ওপর মূসক ধার্য করা হলে মূসকের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যেতো। অন্যদিকে বাড়ি নির্মাণের উপকরণ (input)-এর ওপর মূসক হিসাব করে পূর্বে প্রদত্ত মূসক ফেরৎ দেওয়া সম্ভব ছিল না। তদুপরি বালি, চুন, সুরকি ইত্যাদির ওপর মূসকও ছিল না। ফলে আমরা প্রকৃত মূল্য সংযোজন (actual value addition)-এর ধারণা নিয়ে সেবাসমূহের (services) ক্ষেত্রে এবং কেবল নির্মাণ পর্যায়ে কন্ট্রাক্টর যে মূল্য সংযোজন করে কেবল সে মূল্যের ওপর মূসক আদায়ের বিধান করি। এটা ছিল মূসক ব্যবস্থায় বাংলাদেশী সংযোজন।

মূসক আইনে বাংলাদেশী সংযোজনের আর একটি দিক হচ্ছে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক দিয়ে মাল খালাস করার বিধান করা। কেননা আমাদের রয়েছে ব্যাপক কর অনাদায়ের কালচার। এখানে যদি মূসক পরে দেওয়ার বিধান করা হতো তাহলে তা রাজস্বের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতো।

আমাদের নিকট দাবি ছিল যে উৎপাদন পর্যায়ে মাল খালাসের পূর্বে মূসক ডকুমেন্ট (চালানপত্র ইত্যাদি) যেন আমাদের অফিসাররা দেখে দেন। আমরা এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করি এবং উৎপাদন কর নিজেরাই তাদের ডকুমেন্টে কর হিসাব করে মাল বের করবেন—তা ঠিক করি। অন্যান্য উন্নত দেশের মত আমরা হয়রানি কমাতে চাচ্ছিলাম। এভাবেই অসংখ্য সমস্যার সমাধান আদায়ের প্রথম এক বছর মোকাবেলা করতে হয়েছিল। আর এভাবেই আমাদের সকলের চেষ্টায় মূল্য সংযোজন কর এ দেশে প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছিল।

www.pathagar.com

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এ টি এম শামসুল হক বলেছেন যে, স্বাধীনতার পর ১৮ বার প্রশাসনিক সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। তিনি বলেন, এখন আসল কাজ হচ্ছে তা বাস্তবায়ন করা। তিনি বলেন যে, প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন ইতোমধ্যে বেশকিছু সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছে, যা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে আমাদের দেশে অনেকবার প্রশাসনিক সংস্কারের জন্যে কমিটি বা কমিশন গঠন করা হয়েছে। তারা বিভিন্ন সময়ে ১৮টি রিপোর্ট দিয়েছে; কিন্তু এগুলো বাস্তবায়ন হয়নি। অবাক লাগার কথা, কেন এরকম হয়? কেন এতগুলো রিপোর্ট বাস্তবায়ন হয়নি? প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্যে এ রকম হয়েছে। আমাদের দেশের সিভিল সার্ভিস নানা ধরনের দ্বন্দ্বে ভুগছে। তাদের মধ্যে ঐক্য নেই। তাদের চিন্তাও বিভিন্ন রকমের। তাদের রয়েছে নানা ধরনের স্বার্থ। এসব স্বার্থকে সমন্বয় করে বা এসবের ঊর্ধ্বে উঠে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল; কিন্তু তারা তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা তাদের অক্ষমতারই প্রমাণ করে; যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে জাতিকে।

সিভিল সার্ভিসের একটি বিরাট অংশ তাদের স্বার্থপরতার জন্য সংস্কারের বিরোধিতা করবে, এটাতো আমাদের পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকই ধরা যায়। তারা রিপোর্টগুলো যথাসময়ে পরীক্ষাপূর্বক প্রক্রিয়াজাতকরণে বিলম্ব করতে পারে, এমনকি নানা অজুহাতে বাধাও দিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রধান দায়িত্ব হবে এসব বাধা-বিপত্তি সরিয়ে দিয়ে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা।

প্রশাসনিক সংস্কার বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের প্রশাসন ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। ২০/২৫ বছর পূর্বের তুলনায় অধিকাংশ অফিস ও বিভাগের অক্ষমতা এখন অনেক বেশি। অফিসারদের মানও আগের তুলনায় নিম্নগামী। দুর্নীতিও আগের তুলনায় অনেক বেশি। এসব আমাদের রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং পদ্ধতির ব্যর্থতার দিক তুলে ধরে।

www.pathagar.com

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উচিত রিক্রুটমেন্ট ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করা, নিয়োগ দলীয়করণের যে অভিযোগ রয়েছে তা দৃঢ় হাতে বন্ধ করা। ট্রেনিং পদ্ধতির ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। ট্রেনিং-এ নৈতিকতাকে আরো অধিক স্থান দিতে হবে। নৈতিকতার প্রশিক্ষণ আরো ব্যাপক করতে হবে; তা হলেই দীর্ঘমেয়াদে দুর্নীতি ও অক্ষমতা কমতে পারে।

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের মতে প্রশাসনিক দক্ষতার নিম্নমান বা Governance-এর সমস্যা বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কয়েকটি সমস্যার একটি। এর উন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়ন কঠিন হবে। তাই বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্য প্রশাসনিক সংস্কারের জন্যে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন যে সকল প্রতিবেদন দিয়েছে তার ওপর দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন একবারে একটি বড় রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে সময়ে সময়ে তারা প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন। এটি একটি যথার্থ পদক্ষেপ। এসব প্রতিবেদনের ওপর সরকারের বসে থাকা উচিত নয়। তাদের কর্তব্য এসব কার্যকর করার জন্যে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমাদের সিভিল সার্ভিস দিয়ে এসব রিপোর্ট পরীক্ষা করে তেমন ফল হবে না। কেননা, তারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত। এগুলো আন্তর্জাতিক এক্সপার্ট দ্বারা প্রায়োজন হলে পরীক্ষা করানো যায়; কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক সরকারকে নিতে হবে সুবিচারের নীতিমালার ভিত্তিতে। আমরা আশা করি, সরকার আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৫ই মার্চ ২০০০

www.pathagar.com

নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করা প্রসঙ্গে

গত ১১ই মার্চ সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ (সিএসপিএস)-এর উদ্যোগে ঢাকায় 'নির্বাচনে নিরাপত্তা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা উন্নয়ন' বিষয়ের ওপর একটি গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ের উপর গোলটেবিল আলোচনায় প্রাক্তন মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য, সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান, সরকারের সাবেক সচিবসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন এবং খোলামেলা মন্তব্য করেন।

আমাদের দেশের অনেক নির্বাচনে যে ব্যাপক ভোট জালিয়াতি, ভোট সীলমারা, মাস্তান ও কালো টাকার ব্যবহার হয় তা কোন সৎ ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমেই কমে যাবে এবং সৎ রাজনীতি নির্বাসিত হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আলোচনা সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করা হয়। বৈঠকে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা এবং এর সর্বোচ্চ পর্যায়ের শতাধিক কর্মকর্তাকে জুডিসিয়াল সার্ভিস থেকে নেওয়ার প্রস্তাব আসে। কেননা, প্রশাসনিক সার্ভিস তার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে। তদুপরি প্রশাসনিক সার্ভিসকে রাজনীতিকরা সহজে প্রভাবিত করতে পারে।

নির্বাচনী বিভিন্ন আইনের ত্রুটির আলোচনা হয় এবং এগুলোর সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। বিশেষকরে নির্বাচনে কারচুপি সংক্রান্ত আপিলগুলো সর্বাধিক ৬ মাসের মধ্যে মীমাংসার প্রস্তাব আসে। বৈঠকে বলা হয় যে, প্রায় সকল নির্বাচনী মামলা সংসদের স্থায়িত্বকালে শেষ হয় না। এ পরিস্থিতির সংশোধন অতীব জরুরি। এ জন্যে অবিলম্বে আইন সংশোধনের প্রস্তাব আসে।

আইডি কার্ডের চেয়েও পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন বেশি প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়। আইডি কার্ডও সকলে যাতে পায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন করা গেলে চিরস্থায়ী ভোটার লিস্ট তৈরি সম্ভব হবে। বার বার ভোটার লিস্ট তৈরি করার জন্যে খরচ এবং লিস্ট তৈরিতে অনিয়মের সুযোগ বন্ধ করতে হবে। কেবল সময়ে সময়ে মৃত ব্যক্তিদের নাম বাদ দিতে হবে এবং নতুন করে যারা ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে তাদের তালিকাভুক্ত করার প্রয়োজন থাকবে।

www.pathagar.com

যেহেতু বেসামরিক প্রশাসন বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে এবং অনিয়ম রোধে ব্যর্থ হয়েছে সে জন্যে অন্তত আগামী তিনটি সাধারণ নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকার এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের সামগ্রিক সুপারভিশনের আওতায় সামরিক বাহিনী কর্তৃক সার্বিকভাবে পরিচালনা করার প্রস্তাব আসে। এ জন্যে অবশ্য নির্বাচনকে কয়েক দিনে সম্পন্ন করতে হবে এবং ভোট গণনা নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর একদিনে শুরু করতে হবে। গণনা শেষে নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণা করবে।

গোলটেবিলের মূল্যবান প্রস্তাবসমূহ সকল মহলের সুবিবেচনার দাবি রাখে। আমরা আশা করি, সরকার ও বিরোধী দল এ সকল প্রস্তাব আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করে দেখবেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৫ই মার্চ ২০০০

www.pathagar.com

ঢাকার যানজট নিরসন করতে হবে

ঢাকার যানজট বোধহয় বর্তমানে বিশ্বের যে কোন শহরের তুলনায় অধিক। বিশ্বের অনেক শহরেই যানজট আছে। কিন্তু এরকম অসহনীয় পরিস্থিতি আমাদের জানামতে আর কোথাও নেই। ঢাকায় একসাথে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে যানজট লেগে যায়। এর ফলে দেশের উন্নয়ন কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই যানজটের কারণে আজকাল কেউ কোন কাজ ঠিক সময়ে করতে পারে না। কেননা রাস্তায় যে কোন স্থানে যানজটের সম্মুখীন যে কেউ হতে পারে।

ঢাকার কয়েকটি প্রধান রাস্তা ছাড়া সব রাস্তার অবস্থাই খারাপ। প্রধান রাস্তা ছেড়ে পাশের রাস্তায় গেলেই বোঝা যায়, অবস্থা কেমন।

যানজটের কয়েকটি প্রধান কারণ হচ্ছে, রাস্তার দুরবস্থা, ট্রাফিক লাইটের অব্যবস্থা এবং রিকশা। ঢাকার এত রাস্তা খারাপ থাকার কারণ বোধগম্য নয়। এরকম চলতে পারে না। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে এ ব্যাপারে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। ঢাকার মেয়র সাহেব যদি সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তা নিয়ে আগামী একমাস একেক দিন কিছু সময় রাস্তাঘাট পরিদর্শন করেন এবং যেসব রাস্তার সংস্কার অবিলম্বে দরকার তার ব্যাপারে নির্দেশ দেন, তাহলে সত্বর এ সমস্যার নিরসন হতে পারে। মেয়র সাহেবকে ভেতরের রাস্তাগুলো বেশি দেখতে হবে।

ঢাকার ট্রাফিক সিস্টেম খুবই খারাপ। ট্রাফিক লাইটগুলো ঠিক জায়গায় নেই। আরো বোধ হয় পিছনে লাগাতে হবে। লাইটগুলো মোড়ের কাছে থাকলে যানজট বেশি হয়। যে কোন আধুনিক শহরের মত এর ব্যবস্থা করতে হবে। এক একটি ট্রাফিক পয়েন্টে কয়েকজন পুলিশ থাকবে কেন? সিস্টেম-এ উন্নয়ন অপরিহার্য। এছাড়া যানজট নিরসন সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওভারব্রিজগুলোর ব্যবহার হচ্ছে না। এর কারণ জনগণের অনভ্যাস বা পুরানো স্বভাব। যদি ট্রাফিক পুলিশ কিছুদিন প্রতিটি ওভারব্রিজ পয়েন্টে জনগণকে নিচ দিয়ে ক্রস করতে না দেন, যেভাবেই হোক ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে যেতে বাধ্য করেন, তাহলে কিছুদিনের মধ্যে উপর দিয়ে যাওয়া রেওয়াজ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

তারপর আর কেউ নিচ দিয়ে যাবে না। এটা অনেক দুর্ঘটনা কমাবে এবং যানবাহনের গতি ঠিক রাখবে। একই সাথে আরো অনেক ওভারব্রিজ বিভিন্ন স্থানে করতে হবে। যানজটের সবচেয়ে বড় কারণ রিকশা। এ ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি? সরকার এ ব্যাপারে তার পরিকল্পনা জনগণকে জানাতে পারেন। আমরা মনে করি, একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে রিকশা ঢাকা শহর থেকে পর্যায়ক্রমে তুলে দিতে হবে। এখনই একটি পরিকল্পনা করা যেতে পারে, যার ওপর ঢাকার মেয়র জনমত সংগঠিত করার জন্য পরবর্তীতে একটি গোলটেবিল আলোচনা করতে পারেন। অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে পুরাপুরিভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে।

ঢাকায় যানজট নিরসনে আশা করি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে দেখবেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৬ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

ট্রাক ছিনতাই রোধ করুন

দৈনিক অর্থনীতিতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ট্রাক ছিনতাইয়ের ফলে ব্যবসায়ীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে বাজারে সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কয়েকদিন আগে খুলনা-যশোর সড়কে একটি ডালবাহী ট্রাক ছিনতাই হয়। পরবর্তীতে ট্রাকটি পাওয়া যায়, কিন্তু ডাল আর পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে চালবাহী ট্রাক ছিনতাইয়ের অনেক ঘটনা ঘটছে।

দেশের জন্য এ পরিস্থিতি কত মারাত্মক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর ফলে ঢাকা ও অন্যান্য শহরে চাল সরবরাহ বিঘ্নিত হবে। ফলে এসব এলাকায় চালের দাম বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সকলেই (বিশেষ করে সাধারণ জনগণ) ভীষণ ভোগান্তির সম্মুখীন হবে। অন্যদিকে যেসব এলাকায় চালের উৎপাদন হয়, সেখানে চালের দাম কমে যেতে পারে। পরবর্তীতে ঐসব এলাকায় ধান চাষও লাভজনক থাকবে না এবং জাতীয় উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিছু কিছু ট্রাক চালক এ পরিস্থিতিতে ধর্মঘট করতে চায়; কিন্তু ধর্মঘট এ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করবে। জনগণের ভোগান্তি কয়েকগুণ বাড়বে। এরকম ধর্মঘট কারো কাম্য হতে পারে না।

এ পরিস্থিতিতে শক্ত হাতে মোকাবিলা করার জন্য অবিলম্বে সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। জানা গেছে যে, চাল আড়তদার সমিতির পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা জানি না যে, এ অভিযোগ কতটা সত্য। এ ব্যাপারে সরকারই বলতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে সরকারের উচিত সামগ্রিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে জনগণকে এ সম্পর্কে অবহিত করা। সমস্যাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে, এ ব্যাপারে কোন বিলম্ব, কোন শৈথিল্য জাতির নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। সরকার যদি মাল পরিবহনের নিশ্চয়তা বিধান করতে না পারে তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এমনকি গোটা অর্থনীতির মুখ থুবড়ে পড়বে। একদিকে চাঁদাবাজি অর্থনীতিকে রক্তশূন্য করছে, যা পূর্বে আমরা এক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেছি; অন্যদিকে

www.pathagar.com

যদি মাল পরিবহনের নিরাপত্তা এভাবে বিঘ্নিত হয় তাহলে অর্থনীতির আর কিছু থাকবে কি?

সুতরাং, আমাদের প্রস্তাব হল, সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে এবং মাল পরিবহনে নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন বিলম্ব না করে সরকারের উচিত রাস্তাঘাটে পুলিশ টহল বৃদ্ধি করা; বিশেষ করে যেসব জায়গায় এসব ঘটনা ঘটছে। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত রাতের বেলায় মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে কিছু নতুন নিয়ম করার চিন্তা করা যায়। যেমন, ট্রাকগুলোর একত্রে কনভয় করে চলা এবং কনভয়ের সঙ্গে পুলিশ বা বাংলাদেশ রাইফেলসের বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা করা। প্রধান প্রধান আন্তঃজেলা সড়কে পুলিশ ফাঁড়ির সংখ্যাও প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা যেতে পারে, অন্তত সাময়িকভাবে।

আশা করি, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিষয়টি দেখা হবে, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করা হবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৫ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

পৌরসভাগুলোর দক্ষতা বাড়াতে হবে

সংবাদপত্রে প্রাকাশিত খবরে দেখা যায় যে, পৌরসভাগুলোতে কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে পৌরসভাগুলোকে দেওয়া বরাদ্দ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে ১৯৯০-৯১ সালে এ খাতে বরাদ্ধ ছিল ১৮ কোটি টাকা সেখানে ১৯৯৮-৯৯ সালে বরাদ্ধ দেওয়া হয় ১২০ কোটি টাকা। বর্তমানে ছোট পৌরসভাগুলো গড়ে প্রতি বছর ৪০/৫০ লাখ টাকা, মাঝারি পৌরসভা ৭০/৮০ লাখ টাকা এবং বড় পৌরসভাগুলো ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত বরাদ্ধ পাচ্ছে। অন্যদিকে সরকারি বরাদ্ধ পাওয়ার কারণে অনেক পৌরসভাই নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধির কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না।

বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। অধিকাংশ পৌরসভার রাস্তাঘাট, পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করুণ বলা চলে। অনেক ক্ষেত্রেই অবস্থা বিগত ২০/২৫ বছরে আরো খারাপ হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে পৌর এলাকাগুলো অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। এর ফলে রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা করা আরো কঠিন হয়ে যায়। পরিকল্পিত পৌর উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

উন্নত দেশে ভ্রমণ করলে দেখা যায় যে, ছোট শহরগুলো ছবির মত। সেসব ছোট শহরে রাস্তাঘাট খুবই পরিকল্পিত এবং পরিচ্ছন্ন। রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি। এটা সম্ভব হয়েছে পৌর প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকারের দক্ষতার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা এসবে খুবই সামান্য।

বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর উন্নয়ন একান্ত জরুরি। পৌরসভার বর্তমানে বেশ কয়েকটি বড় সমস্যা রয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা অদক্ষতা ও দুর্নীতি। তারপর নানা ধরনের স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের অভিযোগ রয়েছে; বিশেষ করে উন্নয়ন কাজ বণ্টনের ক্ষেত্রে। স্থানীয়ভাবে পৌরসভাগুলো রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারছে না, এটিও একটি সমস্যা। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

এসব সমস্যা সমাধানে সরকার এবং দেশের প্রত্যেক এলাকার স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বকে এগিয়ে আসতে হবে। পৌরসভার

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কর্মচারীদের উন্নতমানের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা দরকার। বর্তমানের মত সাধারণ ট্রেনিং দ্বারা আগানো যাবে না। স্থানীয় সরকার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। এর ট্রেনিংদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেবল পৌরসভা নয়, উপজেলা, ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যানদেরও সফল ট্রেনিং দিতে পারে। ট্রেনিং-এ উন্নয়ন অর্থনীতিকে বেশ ভালভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পৌরসভাগুলোর সার্বিক অবস্থাকে মজবুত করার জন্য তাদেরকে রাজস্ব আদায়ে আরো অধিক ক্ষমতা দিতে হবে। তাদের যে ক্ষমতা এখন আছে তাও তারা ভালভাবে ব্যবহার করছে না। এসব ব্যাপারেও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে।

পৌরসভা এবং উপজেলা শহরসমূহের অপরিকল্পিত উন্নয়ন আমাদের জন্য ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করবে। এ ব্যাপারে এখনই সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যাতে সব শহরের উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে হয়। এ ব্যাপারেও আমরা সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দৈনিক অর্থনীতি, ৫ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

উন্নয়নে জনগণের উদ্যোগ

দৈনিক অর্থনীতির এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, পাবনাসহ উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করলে শত শত মেট্রিকটন পাটালি গুড় ও ঝোলা গুড় উৎপাদন সম্ভব। প্রতিবেদকের মতে, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলে দেশে এক বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের এরকম একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে অবশ্যই ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা কার হবে। আমরা মনে করি, এ ধরনের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্য হতে যারা উদ্যোক্তা হওয়ার যোগ্যতা রাখেন তাদেরই প্রধান ভূমিকা রাখতে হবে।

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নানা ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে; তেমনি রয়েছে নানা ধরনের হাতের কাজের বিপুল সম্ভাবনা। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে উদ্যোগ কাকে নিতে হবে? অবশ্যই বেসরকারি খাতকে এবং জনগণের উদ্যোগী অংশকে। সে ক্ষেত্রে আমরা অনেকাংশে সাফল্য লাভ করতে পারিনি। বাংলাদেশের জনগণ নানা কারণে মনে করে যে, সরকারকে সবকিছু করতে হবে। দুঃখের বিষয়, পূর্বে প্রায় সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ফলে সরকারের বাজেটের ওপর চাপ কম ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে কি হলো জানি না। জনগণের পক্ষ থেকে স্কুলসমূহের সরকারিকরণের দাবি উঠলো। তাই হলো। অনেক কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুল জাতীয়করণ করা হলো। আবার বেসরকারি স্কুলের বেতনও সরকার দেওয়া শুরু করলো। নানা রাজনৈতিক চাপের মুখে সরকার এই কাজে বাধ্য হলো। এর সাথে বাজেটের ওপরও চাপ সৃষ্টি হলো। সে অনুপাতে উন্নয়ন কাজে টাকার প্রাপ্তি কমলো।

দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থে এগুলো ঠিক হয়নি। কেবল রাজনৈতিক কারণে আমাদের এসব কাজ করতে হয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও একই কথা। আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখেছি যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকেই এবং জনগণের মধ্যে যারা

www.pathagar.com

উদ্যোগী তাদেরকেই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে যে সম্পদ পড়ে আছে তাকে কাজে লাগানোতে বেসরকারি খাতকেই ভূমিকা নিতে হবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন শিল্প চেম্বার নেতৃত্ব দিতে পারেন। আমাদের একটি বড় দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত, অংশীদার ও উদ্যোগী করা। পাটালি গুড়ের সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও একই কথা। আমাদের উত্তরাঞ্চলে যারা বেশি জমির মালিক তাদেরকেই উদ্যোগটি নিতে হবে। তবে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা উদ্যোক্তাদের দিতে হবে। এর উদ্যোক্তা তৈরিতেও ভূমিকা রাখতে পারেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৩ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

কিডনি রোগের চিকিৎসার সুযোগ

পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রতি বছর ৪০ হাজার মানুষ কিডনি অকেজো হয়ে প্রাণ হারায় এবং প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ লোক কিডনির রোগে আক্রান্ত হয়।

খবরে জানা যায় যে, কন্টিনিউইং মেডিকেল এডুকেশনের আওতায় ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব নেফ্রোলজির সহায়তায় বাংলাদেশের কিছু সংগঠনের উদ্যোগে ২০০ ডাক্তারকে কিডনি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি কর্মশিবির শীঘ্রই শুরু হবে। এটি নিঃসন্দেহে একটি সুসংবাদ। আমাদের দেশে কিডনি রোগের চিকিৎসার যে সুযোগ রয়েছে তা একেবারেই অপর্যাপ্ত। কিডনি রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ।

কিডনি রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসার মাধ্যমে সারানো সম্ভব না হলে ডায়ালাইসিস করতে হয়। সপ্তাহে অন্তত ৩ দিন ডায়ালাইসিস না করলে রোগী ভাল থাকে না। ডায়ালাইসিস মেশিনের মাধ্যমেই কিডনির কাজটি করতে হয়। অর্থাৎ রক্তকে দূষিত পদার্থ থেকে মুক্ত করতে হয়।

প্রতি ডায়ালাইসিসে বেসরকারি হাসপাতালে অন্তত এক হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ সপ্তাহে তিন হাজার এবং মাসে পনের হাজার এবং বছরে প্রায় দু'লাখ টাকা। এ চিকিৎসা জীবনভর চালাতে হয়। কিডনি বদলানোও কঠিন। কিডনি বদলাতেও প্রায় ৩/৪ লাখ টাকা খরচ হয়। সবসময় আত্মীয়স্বজন থেকে কিডনি পাওয়াও যায় না। এ ধরনের বিপুল খরচ বহন করা আমাদের দেশের কিডনি রোগীদের ৯৯ ভাগের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কারণেই যথাযোগ্য চিকিৎসার অভাবে প্রায় ৪০ হাজার কিডনি রোগী প্রতি বছর মারা যায়।

সরকারি হাসপাতালসমূহেও ডায়ালাইসিস-এর সুবিধা সীমিত। পিজি হাসপাতালে এবং কয়েকটি মেডিকেল কলেজে কেবল এ সুবিধা আছে। মাত্র ৭/৮টি বেসরকারি ক্লিনিকে ডায়ালাইসিসের সুবিধা আছে। একত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলে মাত্র ১০০ রোগীর ডায়ালাইসিস করার সুযোগ বাংলাদেশে আছে। আমাদের এ সুবিধা অন্তত ২০ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে সরকারি খাতে সকল জেলা শহরের হাসপাতালে এ সুযোগ সৃষ্টি

www.pathagar.com

করা প্রয়োজন এবং তা করা প্রয়োজন অবিলম্বে। ডায়ালাইসিস ফি একেবারে সামান্য করা প্রয়োজন এবং তাও যারা দিতে পারবে না তাদের ক্ষেত্রে মওকুফের ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারকে মনে রাখতে হবে যে, অধিকাংশ চিকিৎসা স্বল্পব্যয়ে করা সম্ভব; কিন্তু কিডনি রোগ, হৃদরোগের অপারেশন ইত্যাদি চিকিৎসা বেসরকারি খাতে (দেশে বা বিদেশে) অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এসব খাতে সরকারি নজর বেশি দিতে হবে দরিদ্র জনগণকে রক্ষা করার জন্য।

আমরা আশা করি, সরকার আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। আমরা কিডনি চিকিৎসার সুবিধার্থে ডাক্তারদের আরো প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

দৈনিক অর্থনীতি, ৩০ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে

একটি দৈনিকের খবরে দেখা যায় যে, ভুল চিকিৎসা ও ত্রুটিপূর্ণ রিপোর্টের জন্য দেশের গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন। ভুল চিকিৎসার জন্য হাজার হাজার রোগী অকালে মৃত্যুবরণ করছে। ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের ত্রুটিপূর্ণ রোগ নির্ণয় ও আনাড়ি চিকিৎসকদের কারণে এসব ঘটছে। ডাক্তাররা কমিশন ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত।

অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন যে, দেশের সরকারি এবং বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা দু'টিই অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য বিভাগ এসব সমস্যার ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি করতে পারেনি। দেশের স্বাস্থ্য খাতে প্রতি বছর কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় উন্নয়ন খাতসহ। এভাবেই এ খাতে ব্যয় করা হচ্ছে গত এক যুগ ধরে। তা সত্ত্বেও এ খাতে উন্নতি না হওয়ার কারণ আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে। এজন্য কাদের ব্যর্থতা দায়ী?

উপজেলা হাসপাতালে অর্ধেক ডাক্তার থাকেন না। তারা সুচতুরভাবে পরিকল্পনা করে পালা করে ডিউটি করেন। ওষুধ খাতে এত অর্থ ব্যয় করার পরও ওষুধ পাওয়া যায় না! অনেক সময় রোগীকে গজ থেকে আরম্ভ করে সবকিছু কিনে দিতে হয়।

ঢাকার সরকারি হাসপাতালসমূহে ভর্তি হওয়াও কঠিন। কেবল সিটের অভাবে নয় ভর্তির ব্যবস্থাও অত্যন্ত জটিল। বিদেশের হাসপাতালে এমনকি দেশের ক্লিনিকসমূহের রিসেপশনে গেলে সিট খালি থাকলে অবিলম্বে ভর্তি হওয়া যায়। কিন্তু মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং সরকারি হাসপাতালসমূহে আউটডোরের মাধ্যমে এবং ডাক্তারদের সুপারিশ ছাড়া কেন ভর্তি হওয়া যায় না? হাসপাতালে সিট থাকলে রিসেপশনে রোগী ভর্তির ব্যবস্থা করা উচিত। সিট না থাকলে অবশ্য আউটডোরের মাধ্যমে বা ইমারজেন্সির মাধ্যমে আসতে হবে, এটা বোধগম্য। ভর্তির নিয়ম এবং হাসপাতালের সুবিধাদি বর্ণনা করে কি একটি গাইড বই তৈরি করা যায় না? এটি অবশ্যই হওয়া উচিত। অন্যান্য সরকারি ইউটিলিটি সার্ভিস অফিসেরও 'গাইডবুক' হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

সরকারি সেক্টরে চিকিৎসা ব্যবস্থার মূল সমস্যা হচ্ছে দুর্নীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, পলিসি ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যর্থতা। এসব দূর করার জন্য সরকারি ঊর্ধ্বতন স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং বিএমএ-কে ব্যাপক ভূমিকা নিতে হবে।

বেসরকারি খাতের সমস্যা আরো ব্যাপক। বেসরকারি খাত অবশ্যই চিকিৎসা খাতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। অনেক ভাল কাজ করেছে। তাদের ছাড়া এখন আর দেশ চলতে পারবে না। বেসরকারি খাতের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কিন্তু বেসরকারি খাতে যারা অনিয়ম করছে, যারা ত্রুটিপূর্ণ প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করছে, যারা ত্রুটিপূর্ণ টেস্ট দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের মনে হয় স্বাস্থ্য বিভাগ এ ক্ষেত্রে যথাযথ নজরদারি করছে না। এটা করতে হবে এবং যারা সত্যিই দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ডাক্তারদের কমিশন নেওয়ার যে অভিযোগ আসছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এটা চলতে দেওয়া যায় না। সরকার এবং বিএমএ মিলে এটি বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। না হলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় দুর্নীতি আরো ব্যাপক হয়ে যাবে। আশা করি সরকার, বিএমএ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে জড়িত অন্যরা আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

জবাবদিহিতা নিয়ে কথা

বেশ কিছুদিন ধরে জবাবদিহিতা কার হবে, কার হবে না এ নিয়ে দেশে তোলপাড় হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করার পর এ আলোচনা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। অনেকেই এ আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

আমরা মনে করি, সকলের জবাবদিহিতার প্রয়োজন আছে। কেউ কেউ বলছেন যে, সংবিধানে কারো কারো জবাবদিহিতার কথা নেই। অন্যরা বলছেন যে, সাংবাদিকদের জবাবদিহিতার জন্য প্রেস কাউন্সিল আছে, অন্যান্য আইন আছে। কেউ কেউ আবার বলছেন, এটাও যথেষ্ট নয়। এসব যুক্তি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা আমাদের ভাল করে বিবেচনা করতে হবে। কোন পেশার ওপর নজরদারির জন্য কিছু আইন থাকলেই কি জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়? তা হলে তো সরকারি কর্মচারীরাও বলতে পারে যে, আমাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি কর্মচারী (ডিসিপ্লিন) রুল আছে, দুর্নীতি দমন আইন আছে। এসব কথা সত্ত্বেও আমরা কি বলতে পারি যে, সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে? তা বলা যাবে না। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে সরকারি কর্মচারী ও অন্যদের জবাবদিহিতার অভাব। প্রকৃতপক্ষেই জবাবদিহিতা আমাদের দেশে কাজ করছে না আইন-কানুন থাকা সত্ত্বেও। আইন-কানুনকে কার্যকর করা এবং অন্যবিধ উপায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জাতির একটি অবশ্যকরণীয় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্যই ন্যায়পালের কথা উঠছে। আমাদের সংবিধানে ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৭ (২)-এ বলা হয়েছে, "সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।" কিন্তু আমাদের দেশে এতদিন ন্যায়পাল না হওয়ায় আমাদের সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা মনে করি, কেবল সরকারি কর্মচারী নয়, সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ন্যায়পালের দায়িত্ব হওয়া উচিত। এজন্য সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং রাজনৈতিক বিতর্কের ঊর্ধ্বের কোন ব্যক্তিকেই ন্যায়পাল নিযুক্ত করা উচিত।

www.pathagar.com

সংবিধানে সবকিছু লেখা থাকে না। সংবিধানে লেখা না থাকলেও সকল মহলকে জনগণের নিকট জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

এ বিতর্কে কেউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিছু বলছেন কিনা সে বিষয়ে আমরা যাব না। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক সুবিধা এ থেকে কারো নেওয়া সঙ্গত নয়।

আদালত অবমাননা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা হলে তা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা হলে তা খোলামেলা আলোচনার জন্যও সহায়ক হবে এবং সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা আশা করি, সকল মহল আমাদের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে দেখবেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

আবারো হরতাল!

আগামী ৩ অক্টোবর বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আবারো হরতাল ডাকা হয়েছে। অথচ মাত্র কয়েকদিন আগেই বিরোধী দল আহুত ৩ দিনব্যাপী হরতাল হয়ে গেল।

এ কথা সত্য যে, হরতাল নিয়ে কি করা যায় এ বিষয়টি সবাই ভাবছেন। সরকারও ভাবছে, বিরোধী দলও ভাবছে এবং দেশের জ্ঞানী লোকেরাও ভাবছে। কিন্তু সমাধান বেরিয়ে আসছে না।

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, হরতালের ফলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, খেটে খাওয়া মানুষ, রোগী, দেশ-বিদেশ গমনরত যাত্রীরা বিশেষ দুর্ভোগের সম্মুখীন হন। যতদিন পর্যন্ত হরতাল মাত্র অর্ধদিন-একদিনের ব্যাপার ছিল এবং বছরে দু'একবার হতো, ততদিন পর্যন্ত হরতাল নিয়ে এত চিন্তাভাবনা হয়নি। কিন্তু জেনারেল এরশাদের সময় বিরোধী দল লাগাতার এবং বারবার হরতালের সূচনা করে। তারপর বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলের শেষ দু'বছর একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বর্তমান সরকারের আমলেও হরতাল পরিস্থিতি এখন সেদিকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। এ পরিস্থিতির জন্য প্রায় সবাই কম-বেশি দায়ী।

এর বিহিত কি? এটা স্বীকার করতেই হয় যে, উপমহাদেশে 'হরতাল' রাজনৈতিক প্রতিবাদের একটি পন্থা হিসেবে বহুদিন থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যদি জোর-জবরদস্তি না করা হয়, তাহলে হরতালকে একটি গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে মেনে নিতে বোধকরি কারোরই তেমন আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে বাস্তবে জোর-জবরদস্তি হয়, অনেকসময় গাড়ি ভাঙা হয়, রিকশা ভাঙা হয় এবং ব্যক্তিও নানাভাবে লাঞ্ছিত হন।

যদি হরতালকে একটি গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে বহাল রাখতে হয় এবং প্রতিবাদের পন্থা হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে সকল দলের উচিত হবে এটা চিন্তা-ভাবনা করা, কখন হরতাল করা সঠিক হতে পারে। আমরা মনে করি, সকল দল ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেন যে, বিরোধী দলের কাছে যখন সরকারের কোন কাজ সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য মনে হবে তখনই কেবল তার

www.pathagar.com

প্রতিবাদ হিসেবে হরতাল করা যাবে। কিন্তু তা কখনো একদিনের বেশি হবে না এবং তা হবে জোর-জবরদস্তিমুক্ত। তাতে গাড়ি ভাঙা যাবে না, রিকশা ভাঙা যাবে না। লোকদের লাঞ্ছিত করা যাবে না।

আমরা মনে করি যে, দেশের সকল দলকে বিশেষ করে প্রধান কয়েকটি দলকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত যে কোন সরকারকে ৫ বছর কাজ করতে দিতে হবে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু তা হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং প্রধানত পার্লামেন্টে। এটা কোন নির্দিষ্ট সরকারের জন্য আমাদের প্রস্তাব নয়। সকল ভবিষ্যৎ সরকারের ক্ষেত্রেও একই কথা। পার্লামেন্টের মাধ্যম ছাড়া গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তনের চিন্তা সবাইকে বাদ দিতে হবে।

কয়েকদিন পূর্বে বিরোধী দলের নেত্রী হরতাল না করার জন্য কিছু 'শর্ত' দিয়েছেন। এসব 'শর্ত' বিবেচনা করার জন্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। আমরা আশা করি, সরকার এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

অশ্লীল সামগ্রীর প্রসার

দৈনিক অর্থনীতিতে প্রকাশিত একটি পত্রে অশ্লীল পত্রিকা বিক্রি বন্ধ করার আবেদন জানানো হয়েছে। পত্রে বলা হয়েছে, পূর্বে ট্রেনে, স্টিমারে রুচিশীল লেখকদের বই বিক্রি হতো। কিন্তু আজকাল তার পরিবর্তে পাওয়া যায় প্রধানত অশ্লীল সামগ্রী। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র গুলিস্তানের আন্ডারপাসেও অশ্লীল পত্রিকা বিক্রির হাঁকডাক। এরকম পত্র প্রায় সকল দৈনিক পত্রিকায় প্রায়শই প্রকাশিত হয়। কিন্তু অবাক লাগে যে, নীরব জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এসব পত্র কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সাড়া জাগায় না।

ঘটনাটি এমন নয় যে, অশ্লীল সামগ্রী অবৈধ নয়। বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে অশ্লীল সামগ্রী নিষিদ্ধ। তার একটি সংজ্ঞাও দণ্ডবিধিতে দেওয়া আছে। সংজ্ঞাটি যথেষ্ট সুস্পষ্ট। প্রয়োজনে তাকে আইন মন্ত্রণালয় আরো সুস্পষ্ট করতে পারে। আরো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বিষয়টি এমন নয় যে, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানেন না। গুলিস্তানে যে সিনেমা হলটি রয়েছে এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় এলাকার অন্যান্য সিনেমা হলের সামনে প্রচারের জন্য তারা যেসব বোর্ড লাগায় অন্তত আমাদের দেশের কোন সভ্য নারী বা পুরুষ তা দেখতে পারে না। সকলের, বিশেষ করে নারীদের এতে যে কি পরিমাণ যন্ত্রণা হয় তা হয়তো কর্তৃপক্ষ বুঝতে অক্ষম।

এসব অশ্লীল সামগ্রীর প্রদর্শনীতে লাভ কাদের হয়? লোকসান কাদের হয়? অবশ্যই ব্যবসায়ীরা, উৎপাদকরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের নারী সমাজ এর শিকার হয়ে থাকে। নারীরা এর ফলে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। যেসব কারণে আমাদের দেশে নারী নির্যাতন বেড়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে এ সকল অশ্লীল সামগ্রী। এর ফলে জাতীয় চরিত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যার সামাজিক মূল্য পরিমাপ করা কঠিন। জাতীয় চরিত্র গঠনের সাথে অন্যান্য অপরাধও সম্পর্কিত।

অশ্লীলতার বিষয়টি বোধ হয় গা সহা হয়ে গেছে। কিন্তু তা হওয়া ঠিক হয়নি। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, অনেক বড় বড় বিষয়ে প্রথম দিকে কঠোর এবং যথার্থ ব্যবস্থা না নেওয়ায় এগুলো মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের বিষয়গুলোর

www.pathagar.com

মধ্যে রয়েছে অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, মাস্তানি ইত্যাদি। মাত্র দু'যুগ আগেও এসব ছিল না। কিন্তু প্রথম দিকে যখন এগুলো আরম্ভ হয় তখন যদি পুলিশ কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নিতেন তাহলে জাতিকে এ ধরনের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না।

আমরা মনে করি যে, অশ্লীলতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেওয়া উচিত। কিছু লোক ছাড়া বাংলাদেশের কেউ অশ্লীলতা চায় না। আমাদের সমাজের চিন্তাধারা পাশ্চাত্যের মত নয়। এ সত্যটুকু শিকার করে নিয়ে আমাদের সরকারকে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষকে এক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা আশা করি, আইনে নিষিদ্ধ অশ্লীলতা বন্ধে সরকার ক্রমাগতভাবে এবং থেমে না গিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

দুর্নীতি দমনে নতুন চিন্তাভাবনা

ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকা দুর্নীতি দমন আইন সংশোধন ও দুর্নীতি দমন সংস্থা পুনর্গঠন সম্বন্ধে একটি খবর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম শিরোনাম করেছে। খবরে দেখা যায় যে, সরকার ১৯৫৭ সনের দুর্নীতি দমন আইন সংশোধনের প্রস্তাব বিবেচনা করছে। তেমনিভাবে অতীতে ঐ আইনের অধীনে যেসব 'সম্পদ ঘোষণা' কেস রীট পিটিশনের আওতায় কোর্টে পড়ে আছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশে কি পরিমাণ দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দৈনিক অর্থনীতির ২০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার প্রথম পাতায় দুর্নীতির খবরই প্রধান। 'বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও অনিয়ম', 'চট্টগ্রামে মেরিন একাডেমীর গাড়ি ক্রয়ে দুর্নীতি', 'মিরপুর থানার ওসিসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা' ইত্যাদি। প্রথম পাতার অন্যান্য খবর সন্ত্রাসের ও চোরাচালানের। এসব খবরে দেশের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

ইতোমধ্যে ড. মাহবুবুল হক সেন্টার থেকে যে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন বের হয়েছে তা থেকে দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ায় সুশাসনের অভাবে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, দুর্নীতি সমস্যার সমাধান না হলে দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র ও উন্নয়ন প্রয়াস দুই-ই স্থবির হয়ে যাবে। বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন আইন ও দুর্নীতি দমন সংস্থা দুর্নীতি দমনে ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ কি? প্রথমত, দুর্নীতি দমন সংস্থার জনবল প্রধানত পুলিশ বিভাগ থেকে নেওয়া হয় এবং জানা যায় যে, পুলিশ থেকেও কেবল তাদেরই দুর্নীতি দমন সংস্থায় প্রেরণ করা হয় যাদের পুলিশ বিভাগ সাধারণত সরিয়ে দিতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের লোক দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়। এটা জানা যায় যে, পুলিশের দুর্নীতি ও অদক্ষতাও সকল সীমা অতিক্রম করেছে।

দুর্নীতি দমন সংস্থায় কিছু লোক সরাসরিও নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ লোক পুলিশ থেকে আসায় এবং তাদের হাতে নতুনদের ট্রেনিং হওয়ায় এরাও তাদের মত হয়ে গেছে। এ কারণে যদি ভবিষ্যতে দুর্নীতি দমন সংস্থাকে রাখতে হয় তাহলে এ সংস্থার জনবল নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। এ

www.pathagar.com

সংস্থার জনবল জুডিশিয়াল সার্ভিস ও প্রশাসনিক সার্ভিস থেকে নেওয়া ভাল হবে। সার্ভিসের নিয়োগপ্রাপ্ত লোক তুলনামূলকভাবে ভাল। অধস্তন পুলিশ কর্মকর্তাদের তাদের বিভাগে ফেরত পাঠালেই ভাল হবে।

দুর্নীতি দমন আইন একেবারেই কার্যকর করা হয়নি। এ আইনে সম্পদ ঘোষণার বিধান আছে। এ আইনের আওতায় সম্পদ ঘোষণা করলে এবং তা মিথ্যা প্রমাণিত হলে আইনে সম্পদ বাজেয়াপ্তের এবং জেল-জরিমানার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুর্নীতি দমন সংস্থা এ আইনের আওতায় 'সম্পদ ঘোষণা' চাইতে পারে না, যদি না সরকার অনুমতি দেয়।

এ অনুমতি খুব কমই পাওয়া যায়। বিগত ২০ বছরে হতে পারে খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে। এ আইনের সত্যিকার প্রয়োগ যদি করা হতো তাহলে আজ অবৈধভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ার প্রবণতা হতে পারতো না। এ বিষয়টি ভবিষ্যতে সকল সরকারকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন অবশ্যই করা উচিত। বিশেষভাবে যা করা উচিত তা হলো যে, আইনটি কেবল পাবলিক সার্ভেন্ট নয়, সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা উচিত। তারপর এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা উচিত। ভবিষ্যতে যদি অন্তত প্রতি বছর ১০০ জনের 'সম্পদ ঘোষণা'র উদ্যোগ নেওয়া হয়, যাদের সম্পদ নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহলে দুর্নীতিবাজদের মধ্যে ভয়াবহ ত্রাস সৃষ্টি হবে। এসব তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন। তদুপরি তদন্ত জুডিশিয়াল সার্ভিসের লোকদের দ্বারা হওয়া উচিত। এসব ঘোষণার ক্ষেত্রে দলের কথা বিবেচনা করা যাবে না। ঘোষণাদাতাদের সিলেকশন বিভিন্ন মতের লোকদের মধ্য থেকে হলে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কম হবে।

অবশ্য সবকিছু নির্ভর করবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর। তাদের সততা অতি জরুরি। তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে পারে সরকার ও বিরোধী দল। যদি রাজনৈতিক নেতৃত্ব সততার সাথে আগায় এবং আমাদের উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হতে পারে। ন্যায়পাল নিয়োগও ত্বরান্বিত হওয়া উচিত এবং তার কাছেই দুর্নীতি দমন বিভাগের দায়িত্ব দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যায়।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

মাদক চোরাচালান ও বাংলাদেশ

কয়েকদিন পূর্বে তিনজন পাকিস্তানি নাগরিক ৩৮ কোটি টাকার হেরোইনসহ ঢাকায় ধরা পড়েছে। বিষয়টি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ব্যাপক তদন্ত করছে।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে দেখা যায় যে, এসব হেরোইন পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ হয়ে ইউরোপে যাচ্ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশকে মাদক চোরাচালানের রুট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ খবর আমাদের জন্য উদ্বেগজনক। আমরা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক চোরাচালানের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হতে দিতে পারি না।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এই বিপুল পরিমাণ চোরাচালানকৃত হেরোইন ধরায় আমরা তাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি অধিদপ্তর তাদের কর্মতৎপরতাকে আরো ব্যাপক করবে এবং বাংলাদেশকে মাদকের অভিশাপ (তা রুট হিসেবে হোক বা অভ্যন্তরীণ ব্যবহার হোক) থেকে মুক্ত করতে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা এদেশের জনগণের বিশেষ করে যুবশক্তির স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা ধ্বংস করছে। ভারত থেকে চোরাচালানকৃত ফেনসিডিল ব্যবহার সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। জানা যায় যে, বাংলাদেশে প্রতিমাসে কয়েক কোটি বোতল ফেনসিডিল আসে। সবই আসে অবৈধভাবে। কেননা বাংলাদেশে ফেনসিডিল উৎপাদন করা হয় না, আমদানিও নিষিদ্ধ। এ অবৈধ আমদানি, ব্যবসা এবং ব্যবহার বন্ধ করতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহ ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। কিছুদিন পূর্বেই ট্রেন থেকে প্রকাশ্যে ফেনসিডিল নামানোর দৃশ্য পত্রিকায় ছাপা হয় এবং বস্তি থেকে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। দেশের জনশক্তিকে মাদক থেকে রক্ষা করতে হলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে আরো তৎপর হতে হবে।

তবে এ ব্যাপারে সামাজিক আন্দোলন ছাড়া কোন পথ নেই। অর্থাৎ সারা দেশে সকল ধরনের মাদকের বিরুদ্ধে সকল গুরুত্বপূর্ণ এনজিও ও অন্যান্য সংগঠনকে

www.pathagar.com

একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মাদকের সমস্যা ছোট নয়। এটি একটি জাতিকে ধ্বংস করতে পারে। এখন থেকে প্রতিরোধ করতে না পারলে তা ভয়াবহ সমস্যায় পরিণত হবে, যা যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কিছু দেশে হয়েছে।

হেরোইনের ঘটনায় অনেক রাঘব বোয়াল জড়িত বলে জানা গেছে। আমরা আশা করি, ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে জাতির এসব শত্রুকে ধরা হবে এবং বিচারের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

হেরোইন পাচারের সঙ্গে যেহেতু আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত, সে জন্য ইন্টারপোলের এবং অন্যান্য দেশ যেগুলোকে এক্ষেত্রে রুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এ ঘটনার তদন্তের ক্ষেত্রে তাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেওয়ার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারে।

অনেকসময় অভিযোগ করা হয় যে, হেরোইন হিসেবে আটককৃত দ্রব্য পরে আটায় পরিণত হয়। আশা করি এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সতর্ক থাকবে, যাতে এরকম কিছু না হতে পারে।

বাংলাদেশের মাদক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে উপযুক্তভাবে শক্তিশালী করার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারে।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

রাজধানীর ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সমস্যা

একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রাজধানী ঢাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবন বাড়ছে। রাজধানীতে সোয়া'শ ভবন অতি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এগুলোকে ভাঙারও সিদ্ধান্ত আছে; কিন্তু রাজউক প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপ ও আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে এসব ভবন ভাঙতে পারছে না।

জানা গেছে, অতি ঝুঁকিপূর্ণ ইমারতসমূহের মধ্যে কোন কোনটি এত নাজুক অবস্থায় আছে যে, এসব যে কোন সময় ধসে পড়তে পারে। এরকম হলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটতে পারে।

বিষয়টি জাতির জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে, বিভিন্ন দেশে ত্রুটিপূর্ণ বাড়ি নির্মাণের জন্যে বাড়ি ধসে পড়ে অনেক লোক মারা যায়। মিসরে এ ঘটনা অনেক ঘটে থাকে। এর কারণ হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ প্লান, ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ, নির্মাণ স্থানে মাটি ভালভাবে পরীক্ষা না করা, বাজে ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা ইত্যাদি।

তুরস্কে কিছুদিন পূর্বে যে ভূমিকম্প হয় তাতেও এ অভিযোগ ওঠে যে, ত্রুটিপূর্ণ ভবন নির্মানের জন্যে এত অধিক সংখ্যক বাড়ি ঐ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছিল।

আমাদের বাড়িঘরের প্লান পাস করার সময় থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রাজউকের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। কোন প্লান সহজে পাস হয় না। এটা রাজউকের অদক্ষতা। সবকিছু ঠিক থাকলে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্লান পাস করে দেওয়া উচিত। অন্যদিকে অভিযোগ আছে যে, টাকা দিলে যে কোন প্লান পাস করানো যেতে পারে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ প্রয়োজন। সমস্যাটি জটিল। যে দেশে এত অধিকসংখ্যক লোক দুর্নীতিতে জড়িত সে দেশে এ সমস্যার সমাধান অত্যন্ত কঠিন হবে। তথাপি পূর্ত মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে সঠিক উদ্যোগ নিতে হবে।

যেসব বাড়ির অবস্থা বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলোকে ভেঙে ফেলার জন্যে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে বর্তমানে কোর্টে যেসব মামলা রয়েছে

www.pathagar.com

সেগুলো একটি বড় সমস্যা। এ ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করে একটি নতুন আইন তৈরি করার চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। ঐ প্রস্তাবিত আইনের মাধ্যমে কেবল বিশেষ আদালতেই কোন ব্যক্তি এ ধরনের মামলা দায়ের করতে পারবে এবং বর্তমানে যেসব মামলা অন্য আদালতে আছে সেসব মামলা ঐ বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত হতে পারে। এ ধরনের বিশেষ আদালত প্রতিটি মামলা স্বল্প সময়ে যাতে নিষ্পন্ন করে তার ব্যবস্থা আইনেই থাকতে হবে।

ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণের জন্যে যেসব কন্ট্রাক্টর দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্যে আইনে যদি কোন ব্যবস্থা না থেকে থাকে তাহলে সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আশা করি সরকার আমাদের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৫ই জানুয়ারি ২০০০

www.pathagar.com

পুলিশের কর্মকাণ্ড ও প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন

কয়েকদিন পূর্বে মুগদাপাড়ার কাছে স্থানীয় ছাত্র শামসুদ্দিন জুয়েল যেভাবে পুলিশের নির্মম আচরণ ও দায়িত্বহীনতার কারণে নিহত হয়েছে তা সারাদেশের মানুষকে বিশেষভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদন পড়ে স্পষ্ট হয় যে শামসুদ্দিন রিকশা করে তার বন্ধু রিপনের সাথে যাওয়ার সময় পুলিশ তাদের রিকশা আটক করে। রিপনকে টাকা নিয়ে ছেড়ে দেয়; কিন্তু শামসুদ্দিন টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পুলিশ তাকে মারপিট করে। এ অবস্থায় শামসুদ্দিন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। দৌড়াতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে স্যুয়ারেজের গভীর পানিতে পড়ে যায়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য জনগণ চেষ্টা করে; কিন্তু কয়েকজন পুলিশ তাকে উদ্ধার করার চেষ্টায় বাধা দেওয়ায় সে তলিয়ে যায়। পরবর্তীতে তার লাশ ফায়ার সার্ভিস এর লোকজন উদ্ধার করে। শামসুদ্দিন জুয়েলের ঘটনা সাধারণ ঘটনা নয়। একটি তরুণ ছাত্রের এরকম অস্বাভাবিক জীবনাবসান মেনে নেওয়া যায় না।

শামসুদ্দিনের মৃত্যু পুলিশের দায়িত্ব ও আচরণ সম্পর্কে নতুন করে প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। যে ৪ জন পুলিশ এর সাথে জড়িত ইতোমধ্যে তাদের সাময়িক বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করা হয়েছে। এর সাথেই বিষয়টি শেষ হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে পুলিশ নয়, বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত। পুলিশের অপরাধের ব্যাপারে সাধারণত তদন্ত পুলিশ দ্বারা না করে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা দ্বারা করানো উচিত। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও এ কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে সাধারণত পুলিশের তদন্ত দ্বারা পুলিশের অপরাধের যথার্থ তদন্ত হওয়া কঠিন। এ ব্যাপারে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত থাকা বাঞ্ছনীয় যে, পুলিশের বড় ধরনের অপরাধের তদন্ত পুলিশ দ্বারা নয়, ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা দ্বারা করানো সঙ্গত।

এ প্রসঙ্গে পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যাপারটি বড় করে দেখা দেয়। যেই পুলিশের সংস্পর্শে এসেছেন, স্বীকার করেন যে, আমাদের দেশে পুলিশের আচরণ সাধারণত ভাল নয়। অপরাধী প্রমাণ হওয়ার পূর্বেই তারা অত্যন্ত কঠোর আচরণ করে থাকেন। এটা অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সবার ক্ষেত্রে নয়। অন্য স্বল্পোন্নত দেশেও হয়তো এ অবস্থা; কিন্তু এটা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হচ্ছে, শামসুদ্দিন জুয়েলের ক্ষেত্রে পুলিশ এরূপ অমানুষিক আচরণ কেন করলো? তারা নিজেরাও ডুবন্ত ছেলেটিকে উদ্ধার করলো না কেন? অন্যদেরও উদ্ধার করতে দিল না, এটা আরও দুঃখজনক। এটা যে কেবল তাদের কয়েকজনের ব্যাপার তা নয়, এ রকম মনে করলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করবো। প্রকৃতপক্ষে পুলিশের অধস্তন ব্যক্তিদের অধিকাংশ লোকের মানসিকতা এ রকমই। তাই এর সমাধান আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পেতে হবে। পুলিশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় জনগণের প্রতি ব্যবহার, মানবাধিকার, জনগণের আইনগত অধিকারের প্রতি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য এসব দিকে ট্রেনিং কোর্সে অনেক নতুন বিষয় ঢুকাতে হবে। নৈতিক শিক্ষার প্রতি আরও গুরুত্ব দিতে হবে।

তদুপরি পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের আবেদন, তারা যেন পুলিশের নিম্ন পর্যায়ের কনস্টেবল ও অফিসারদের সাথে আরো বেশি যোগাযোগ বৃদ্ধি করেন, তাদের মানবাধিকার সম্পর্কে আরো বেশি অবগত ও সচেতন করেন। আমরা অপরাধের বিরুদ্ধে, কিন্তু তা মানবাধিকার রক্ষা করে করা সম্ভব বলে মনে করি। আশা করি, সরকার ও উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করে দেখবেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৫ নভেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

সাংবাদিক ও পুলিশের ভুল বোঝাবুঝি

দৈনিক অর্থনীতিতে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ সাংবাদিকদের সাথে ভুল বোঝাবুঝির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। জাতীয় প্রেসক্লাবে ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এ দুঃখ প্রকাশ করেন।

তিনি আরো বলেন যে, পুলিশের ওপর অন্যায়ভাবে বোমা নিক্ষেপে মারা গেলে তাতেও মানবাধিকার লংঘিত হয়। তিনি আরো বলেন যে, পুলিশ কখনো কোথাও আক্রান্ত হলেই এ্যাকশনে যেতে বাধ্য হয়।

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের বক্তব্যে সাংবাদিক ও পুলিশের ভুল বোঝাবুঝির যে কথা বলা হয়েছে, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ দেশের একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ করে। তারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। অন্যদিকে সাংবাদিকরা জাতির বিবেক এবং জাতির অধিকার রক্ষার অন্যতম সৈনিক। তাদের কাজ সকল সংবাদ ও ঘটনা যথাযথভাবে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরা। এ প্রেক্ষিতে পুলিশ ও সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি সঙ্গত নয়। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগীও হতে পারে। পুলিশের সমস্যাসমূহ সাংবাদিকরা তুলে ধরতে পারে। তাদের পেশা জীবনের বিভিন্ন সমস্যাও সাংবাদিকরা তুলে ধরতে পারে। অন্যদিকে শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের তথ্য ছেপে সাংবাদিকরা পুলিশকে তাদের কাজে সাহায্য করতে পারে।

তবে সাংবাদিকদের পক্ষে সম্ভব নয় কোন অন্যায় কাজে সমর্থন দেওয়া। পুলিশের বাড়াবাড়ি, দুর্নীতি, অদক্ষতা ও শৈথিল্য তাদের তুলে ধরতেই হয়। তা করতে হয় জাতীয় স্বার্থে। এ বিষয়টি পুলিশকে বুঝতে হবে।

আইজি সাহেবের বক্তব্য, পুলিশ কেবল এ্যাকশনে যায় আক্রান্ত হলে। একথা বোধ হয় অধিকাংশ জনগণ মানতে পারে না। অধিকাংশ জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে মনে করে যে, অনেক সময় পুলিশ নিজেই উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় তাদের এ্যাকশন অনেক বেশি। এসব পরিহার করতে হবে।

www.pathagar.com

এ প্রেক্ষিতে একটি পুরানো প্রসঙ্গ আবার তুলতে চাই। আইজি সাহেব স্বীকার করেন যে, বিভিন্ন মানবাধিকার রিপোর্টে দেখা যায় বিগত বিশ বছরে অন্তত কয়েকশ লোক পুলিশ হেফাজতে মারা গেছে। এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। একটি লোকও তো পুলিশ হেফাজতে মারা যাওয়া উচিত ছিল না। প্রতি থানাতে অভিযুক্তদের মারপিট করা, মারপিটের ভয় দেখিয়ে টাকা নেওয়া রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। আমরা আইজি সাহেবকে এসব চিরতরে বন্ধ করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ করি।

পুলিশ বাহিনীর নৈতিকতা উন্নত না করে এসব সমাধান করা কঠিন হবে। এজন্য তাদের শারীরিক ট্রেনিং-এর সাথে নৈতিকতা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত ট্রেনিংও বৃদ্ধি করতে হবে। পুলিশের নিম্ন পর্যায়ে নৈতিক প্রশিক্ষণ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তারাই সরাসরি জনগণের সাথে কাজ করে থাকে। উচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের নিম্নের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন (অবশ্য শৃঙ্খলার প্রয়োজন রক্ষা করে), যাতে তারা তাদের নৈতিক ও পেশাগত দায়িত্ব আরো ভাল করে পালন করতে পারে। আশা করি, পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করে দেখবেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ০৪ অক্টোবর ১৯৯৯

www.pathagar.com

তদন্ত রিপোর্টের ওপর ব্যবস্থা নিন

দৈনিক অর্থনীতিতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনা, প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে অসংখ্য তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও এসব রিপোর্টের উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রায় ক্ষেত্রে এসব প্রতিবেদন ধামাচাপা পড়ে যায় এবং কোন ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়নি। একমাত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭২ হতে এ পর্যন্ত ২০ জন ছাত্রসহ ২৬ জন নিহত হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে দোষীদের শাস্তি হলেও প্রশাসনিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা পার পেয়ে যায়।

এ পরিস্থিতি যে কেবল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তা নয়, একই পরিস্থিতি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ২৫ বছরে দুইশ'র মত ছাত্র নিহত হয়েছে, যা আমাদের জাতির জন্য মর্মান্তিক। এটা আর কোন দেশে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের ছাত্রসমাজ পরস্পরের প্রতি কত অসহিষ্ণু হয়ে গেছে এবং তাদের রাজনীতির কি পতন হয়েছে এটা তার স্বাক্ষর। কমিশন বা তদন্ত কমিটি গঠন করার পর তার প্রতিবেদনের ওপর ব্যবস্থা না নেওয়ার অনিয়ম কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, সরকারের সকল বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে বিরাজমান। এ রীতি বহু পুরাতন। এর ফলে প্রবাদ হয়ে গেছে যে, যখন কেউ কোন ব্যবস্থা নিতে চান না তখন কমিশন বা কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়। যখন ব্যবস্থা নেওয়া হয় তখনো খুব বিলম্বে এবং আংশিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আমাদের এ রেওয়াজ পুরোপুরি পরিহার করতে হবে। আমাদের খুব পেছনে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার অবশ্যই প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে নির্দেশ দিতে পারে যে, বিগত পাঁচ বছরে দাখিলকৃত যেসব তদন্ত প্রতিবেদন বা বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট তাদের নিকট পড়ে আছে তার উপর আগামী তিন মাসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ সমাপ্ত করতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি সময় লাগতে পারে, সেটি অবশ্য সরকার বিবেচনা করবেন এবং অতিরিক্ত সময় দিতে পারেন।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যেসব তদন্ত প্রতিবেদন পড়ে আছে তার উপর সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিতে পারেন বা অন্যবিধ ব্যবস্থা নিতে পারেন। ছাত্র হত্যার বিষয়সমূহ হালকাভাবে নেওয়া যেতে পারে না। এসবের বিচার হওয়া একান্ত জরুরি। পুলিশ কর্তৃপক্ষকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আসতে হবে। সরকার যেন বলতে পারেন তারা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সকল ছাত্র হত্যার কেসে তাদের ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে পেরেছেন। সন্ত্রাস ও হত্যার যদি বিচার না হয় তাহলে শিক্ষাঙ্গণের অবস্থার উন্নয়ন হবে না। সরকার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে পারেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল তদন্ত প্রতিবেদন ব্যবস্থা না নেওয়া অবস্থায় পড়ে আছে তার উপর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৭ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

ঋণখেলাপি সমস্যা ও জবাবদিহিতা

দৈনিক অর্থনীতিতে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করতে গিয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর মহাপরিচালক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইনস্টিটিউট পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে ২১৭টি ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২৫টি প্রতিষ্ঠান তাদের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নেতাদের ব্যবহার করেছেন। ঋণখেলাপিদের চরিত্র হতে দেখা যায় যে তারা ৪ হতে ৫ বার রাজনৈতিক দল বদল করেছেন। অর্থাৎ তারা সব দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে তাদের কাজে ব্যবহার করেছেন অথবা বলা যায়, প্রায় সকল দলেই তাদের বন্ধু-বান্ধব রয়েছে।

আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি অংশ কিভাবে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছেন এ তথ্য থেকে তার একটি চিত্র পাওয়া যায়। এর ফলাফল কি হয়েছে? একদিকে এর ফলে ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়েছেন, তারা ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়েছেন। এসব ঋণের অধিকাংশই উপযুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পে যায়নি। তদবিরের মাধ্যমে অনুপযুক্ত স্থানে গেছে। যার ফলে এর অনেকগুলো কু-ঋণে পরিণত হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে জাতির। অন্যদিকে যেসব রাজনীতিবিদ তদবির করে দেন, তারা তার বিনিময়ে লাভবান হয়েছেন।

বাংলাদেশে এখন দুর্নীতি, অর্থনৈতিক লুটপাট ব্যাপক। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আমলাতন্ত্রের একটি অংশের মধ্যে দুর্নীতির প্রতিযোগিতা চলছে। কে বেশি করছে, কে কম করছে, আমরা জানি না। তবে পরিস্থিতি ভয়াবহ। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ না করা গেলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এ জাতিকে এর উত্তরণের পন্থা অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। দেশের চিন্তাশীল মহলকে এ সম্পর্কে ভাবতে হবে, মুখ খুলতে হবে।

রাজনীতিবিদ, শিল্প মালিক, ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার (accountability) একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে গড়ে তোলা দরকার। রাজনৈতিক সরকারের এ বিষয়টি সাময়িক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বিবেচনা করা

www.pathagar.com

উচিত। সুপ্রিম কোর্টের সালিস বিভাগের একজন সাবেক বিচারপতির নেতৃত্বে এবং আরো কয়েকজন বিচারপতি, অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে একটি কমিশন করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। এ কমিশনকে সরকারের প্রশাসনিক বিভাগের আওতায় না রেখে প্রধান বিচারপতির অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে উপমহাদেশে ও অন্যান্য দেশে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। এ কমিশনকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজন হবে; যাতে যে কোন রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতির সম্পদের খতিয়ান নিতে পারে।

আমরা যদি রাজনীতিবিদ এবং উচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক লুটপাট রোধ না করতে পারি তাহলে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। যদি ইউরোপ-আমেরিকা উচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতি প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে পারে তবে আমরা কেন পারবো না! এ ব্যাপারটি গভীরভাবে বিবেচনা করার জন্য সরকার ও জাতির কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৩ নভেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

ব্যাংকিং আইন সংশোধন

দৈনিক অর্থনীতির একটি সংবাদে দেখা যায় যে, ব্যাংকিং আইন আবার শিগগিরই সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব আসছে। বেসরকারি ব্যাংক মালিকরা যাতে একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিক থাকতে পারেন সে লক্ষ্যে এ সংশোধনী আসছে। হয়তো বা আরো সংশোধনী আছে। এ ব্যাপারে আমাদের এখন কথা হচ্ছে, প্রয়োজনে অবশ্যই ব্যাংকিং আইনকে সংশোধন করতে হবে। ব্যাংকিং আইন প্রণয়নের পর এ আইনটি বিগত ৭/৮ বছরের মধ্যে কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে। ব্যাংকিং খাত একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ খাত। ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতার স্বার্থে এ আইনকে হুট করে সংশোধন করা উচিত নয়। অনেক ভেবে-চিন্তে তা করা উচিত। তা না হলে এ খাতে এটিও একটি অস্থিরতার কারণ হবে। আমরা সরকারকে পরামর্শ দেব ব্যাংকিং আইনের সংশোধন খুব সাবধানে করতে। প্রয়োজন ছাড়া এ আইনে হাত দেওয়া উচিত নয়, কেননা এ আইনটির বয়স ১০ বছরেরও কম এবং তা ইতোমধ্যে কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত একটি সার্কুলারের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ৫ আগস্ট ১৯৯৯ তারিখে জারিকৃত এ সার্কুলারে বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালকদের ঋণদান সম্পর্কে কিছু নতুন বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। এ বিধিনিষেধ দু'টি বিষয় বিশেষ করে দেশের বিনিয়োগকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং ব্যাংকিং খাতেরও ক্ষতি করতে পারে।

সার্কুলারে বলা হয়েছে যে, ব্যাংকের পরিচালক ও তার আত্মীয়-স্বজনকে পরিচালকের ধারণকৃত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের ৫০%-এর অধিক ঋণ সুবিধা দেওয়া যাবে না। শতকরা ৮০ ভাগ পরিচালকের ধারণকৃত শেয়ার মূল্য ৫ থেকে ২০ লাখের মধ্যে। কিছু পরিচালকের শেয়ারের পরিমাণ তার অধিক মূল্যের হবে। অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যাংক পরিচালক এবং তার আত্মীয়-স্বজন মিলে তার ব্যাংক থেকে ১০ লাখের বেশি ঋণ পাবেন না। বর্তমানে এ টাকায় কোন শিল্প বা ব্যবসা করা যায় না। মাঝারি আকারের শিল্পের জন্যও কয়েক কোটি টাকা প্রয়োজন। ঋণ গ্রহণের এত স্বল্প সুযোগ পরিচালকের জন্য রাখা আর না রাখা একই কথা। এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রয়োজন। অন্যদিকে দেশের চার

www.pathagar.com

পাঁচটি ইসলামী ব্যাংকের পরিচালকের ওপর মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্বব্যাপী একটি স্বীকৃত পদ্ধতি, তেমনিভাবে মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিও ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। অন্যান্য ব্যাংকের পদ্ধতির প্রশ্নে যেমন কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি, তেমনি ইসলামী ব্যাংকিং-এর কোন পদ্ধতির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি অসমীচীন। যদি কেউ কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

আশা করি, বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল নতুন বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করবে। সরকারও এ বিষয় বিবেচনা করবে বলে আমরা আশা রাখি।

দৈনিক অর্থনীতি, ২০ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

ভুল অপারেশনের খেসারত

বিগত কয়েক দিনের পত্রপত্রিকায় দেখা যায়, ভুল অপারেশনের কারণে কিভাবে রোগীরা বিপদাপন্ন হচ্ছে। একটি খবরে দেখা যায় যে, জনৈক আসমা বেগমের একটিই কিডনি ছিল। সেটি ভুল করে একজন গাইনি বিভাগের অধ্যাপিকা অপসারণ করেন। তার ফলে তার পক্ষে দু'টি কিডনি ছাড়া বাঁচা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে সরকারের সাহায্যে আসমা বেগম বঙ্গবন্ধু চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি হয়। তার মা তাকে একটি কিডনি দান করেন। সেটি আসমা বেগমের শরীরে সংযোজন করা হয়। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পরও সে হাসপাতাল ত্যাগ করতে পারছে না। কেননা তার প্রতি মাসে অন্তত দুই হাজার টাকার ওষুধ লাগবে এবং দরিদ্র গার্মেন্টস কর্মী আসমা বেগমের সে সংস্থান নেই। উপরন্তু সে কঠোর পরিশ্রমের কাজও করতে পারবে না। সরকার তাকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু তা এখানো দেওয়া হয়নি।

অন্য এক খবরে দেখা যায় যে, সাভারের এক হাইস্কুল ছাত্র রুবেলের একটি কিডনিও ভুলক্রমে ঢাকার এক হাসপাতালে অপসারণ করা হয়েছে। অপারেশন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ ধরনের ভুলের খবর হরহামেশাই পত্রিকাতে দেখা যায়। চিকিৎসায় এত বিভ্রান্তি অন্য কোন দেশে হয় বলে আমাদের জানা নেই। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশে আইন রয়েছে, যার কারণে চিকিৎসকগণ সতর্ক থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত বিধি বিধান না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত রোগীরা ক্ষতিপূরণ পান না। আমরা আশা করি, এ ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। দেশের জনগণের স্বার্থরক্ষা করাও তাদের দায়িত্ব। তাদের যে সকল সদস্য চিকিৎসায় দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন, তাদের প্রত্যেকটি কেস তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আসমা বেগমের কেসে যে চিকিৎসক ভুল করেছেন, তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আমরা জানি না। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে এবং তাকে শিগগিরই চাকরি দেওয়া হবে, এটি ভাল খবর। কিন্তু যে চিকিৎসকের ভুলের কারণে আসমা বেগমের আজ এ অবস্থা, তার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে কোন তদন্ত হবে না বা শাস্তি দেওয়া হবে না—এটা সঙ্গত নয়। এ ব্যাপারে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, কিডনি রোগের কিচিৎসার ব্যাপারে দেশে যে ব্যবস্থা আছে, তা একেবারেই অপর্যাপ্ত। দেশে কয়েক লাখ কিডনি রোগী আছে এবং কিডনি রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সাধারণত কিডনি রোগীকে সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালাইসিস করতে হয়। প্রতিটি ডায়ালাইসিসের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে এক হাজার টাকার মত লাগে। অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে অন্তত তিন হাজার টাকা। এ চিকিৎসা জীবনভর চালাতে হয়, যদি না কিডনি বদলানো হয়। কিডনি বদলানোও কঠিন। কাউকে কিডনি দিতে হবে। অন্যদিকে কিডনি বদলাতে লাখ টাকার উপর খরচ হয়। এ ধরনের খরচ করা আমাদের দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বেসরকারি চিকিৎসা নেওয়া অধিকাংশ লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। বেসরকারি চিকিৎসার সুযোগও সবার জন্য নেই। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালসমূহেও এ চিকিৎসার সুবিধা খুবই সীমিত। পিজি হাসপাতাল এবং কয়েকটি মেডিকেল কলেজে মাত্র এ সুবিধা রয়েছে। দরিদ্র জনগণের জন্য এসব হাসপাতালের সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তদুপরি প্রত্যেক জেলা শহরের সরকারি হাসপাতালসমূহে ডায়ালাইসিস সুবিধা শুরু করা প্রয়োজন। যেহেতু এ চিকিৎসা সুবিধার অভাবে হাজার হাজার মানুষ অকালে মারা যাচ্ছে, সে জন্য এ ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা সরকারের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

দৈনিক অর্থনীতি, ২০ জুলাই ১৯৯৯

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঃ আমাদের করণীয়

১২ অক্টোবর জাতিসংঘ জনসংখ্যা এজেন্সি (ইউএনএফপিএ) ডে অব সিক্স বিলিয়ন হিসেবে উদযাপন করেছে। ১৯৬০ সনে যেখানে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৩০০ কোটি আজ সেখানে জনসংখ্যা হয়েছে ৬০০ কোটি। অর্থাৎ চল্লিশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে।

এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আমাদের দেশে আরো বেশি। ১৯৫১ সনের দিকে আমাদের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটির মত, আজ তা হচ্ছে ১৩ কোটি। অর্থাৎ ৫০ বছরে আমাদের জনসংখ্যা তিনগুণের চেয়েও বেশি বেড়েছে। আয়তনে ক্ষুদ্র আমাদের দেশ। এত জনসংখ্যার ভার আমাদের মত দেশের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। আমাদের ব্যাপক দারিদ্র্যের নিশ্চয়ই একটি কারণ নয়, অনেক কারণ রয়েছে। তবে জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি তার একটি বড় কারণ। জনসংখ্যাকে আমরা সীমিত পর্যায়ে রাখতে না পারলে দারিদ্র্য দূর করা দুরাশায় পরিণত হবে। তা হলে জনগণের জীবনমান, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মান কখনো উপযুক্ত পর্যায়ে নেওয়া যাবে না।

পূর্বের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এখনো তা অনেক বেশি। তদুপরি গ্রামের জনগণের একটি বিরাট অংশ এখনো পরিবার পরিকল্পনা পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। আমাদের অনেক কাজ এখনো বাকি। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের একটি পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ আছে। তার কাজ আকারের তুলনায় খুব বেশি নয়। গ্রামে তারা অবশ্যই কাজ করছে। তবে তাদের উপস্থিতি খুব কম। তাদের ওপর যথার্থ তদারকিও নেই। অনেক হিসাবপত্র হয়তো কাগুজে। পরিবার পরিকল্পনা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা। সেখানে কোন শৈথিল্য জাতির জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

এ বিভাগকে একটি মিশনের মতো কাজ করতে হবে। কোন অভ্যন্তরীণ সমস্যা বা চাকরি সংক্রান্ত সংঘাত এখানে বড় করে দেখা কারো জন্য সঙ্গত নয়। স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে এক সময় কিছুটা দ্বন্দ্ব ছিল। আশা করি তা এখন নেই।

www.pathagar.com

পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সমবায় একটি নতুন পদক্ষেপ নিতে পারে। আমাদের অধিকাংশ গ্রামের কোন না কোন ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী বা কর্পোরেশনে কাজ করেন। সরকার প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব দিতে পারে তার গ্রামে পরিবার পরিকল্পনার কাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। যারা এ কাজ ভাল করে করবেন তাদেরকে সরকার প্রশংসাপত্র দিতে পারে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে পারে। গোটা জাতিকে এ কাজে সম্পৃক্ত করার অংশ হিসেবে সরকার এ প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতে পারে।

দৈনিক অর্থনীতি, ২২ অক্টোবর ১৯৯৯

www.pathagar.com

ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ব্যর্থতা

ঢাকার একটি বাংলা দৈনিকে 'সাম্প্রতিক ঢাকাই সিনেমা' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে বর্তমানে ঢাকার সিনেমায় 'নৃশংসতা ও অশ্লীলতার রগরগে উৎসব' হচ্ছে। পত্রিকাটি তার প্রতিবেদনে 'অশ্লীলতার চিত্ররূপ' নামে একটি ছবি দিয়েছে যা ঢাকার ছবিতে কল্পনা করা কঠিন। এ ধরনের ছবি কি করে 'সেন্সর বোর্ডের' সনদ পায় তা ভাবতে কষ্ট হয়। বিশেষ করে আমাদের মত সংস্কৃতির দেশে।

প্রতিবেদনে কতগুলো চিত্ররূপ তুলে ধরা হয়েছে, যা অত্যন্ত অশ্লীল ও নৃশংস। একটি চিত্ররূপে দেখা যায় যে, একজন গর্ভবতী মহিলাকে মাস্তানরা রাস্তায় ছিনতাই করে ধর্ষণ করেছে। অন্য কয়েকটি দৃশ্যের উল্লেখ করা যায়, যার একটিতে দেখানো হয়েছে একজন জীবন্ত ব্যক্তিকে হ্যাঁচকা টানে দু'ভাগ করে দেখানো হয়েছে, অন্যটিতে একজন লোকের বুক ফেড়ে হৃৎপিণ্ড বের করে মাস্তানরা উল্লাস করতে করতে চলে যাচ্ছে। এসব দৃশ্য নেওয়া হয়েছে 'কদম আলী মাস্তান'সহ বিভিন্ন ছবি থেকে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, নৃশংস ও অশ্লীল দৃশ্য ছাড়াও ঢাকাই সিনেমাতে নোংরা সংলাপ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। নোংরা সংলাপের কিছু উদাহরণও দেওয়া হয়েছে।

ঢাকার ছবিতে এসব অশ্লীলতা, নৃশংসতা ও নোংরামির জন্যে কারা দায়ী? প্রথমত চিত্র নির্মাতারা। তারা ব্যবসার স্বার্থে এসব করে যাচ্ছেন। এতে ব্যবসা হয়তো তাদের কিছু হচ্ছে; কিন্তু জাতীয় মন-মানসিকতা ও নৈতিকতার ধ্বংস হচ্ছে। চিত্র নির্মাতারা যদি এর সামাজিক ক্ষতি বিবেচনা করেন তাহলে এসব বন্ধ হতে পারে। একজন চিত্র নির্মাতা হয়তো তা পারবেন না নোংরামির প্রতিযোগিতার কারণে; কিন্তু এক্ষেত্রে যদি নির্মাতাদের এসোসিয়েশন মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, তারা যদি নীতিমালার অনুসরণ করেন, তারা যদি আমাদের ইসলামী ও জাতীয় ঐতিহ্য সামনে রেখে সীমা অতিক্রম না করেন তাহলে পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন হতে পারে। ফিল্ম সেন্সর বোর্ড তো সকল চিত্র নির্মাতাকে নিয়ে বসতে পারেন এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, যাতে

www.pathagar.com

তারা নীতিমালা অনুসরণ করেন। তথ্য মন্ত্রণালয়ও এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে পারে। তারাও সব চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে বসতে পারে এবং নীতিমালা ভেঙে চিত্র তৈরি করতে বারণ করতে পারে।

ঢাকার সিনেমায় যা কিছু ঘটছে তার জন্যে ফিল্ম সেন্সর বোর্ডকে দায়ী করতেই হয়। তারা যে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না তা তো সুস্পষ্ট। কিভাবে এ ধরনের নৃশংস, অশ্লীল ও নোংরা ছবি বাজারে আসতে পারলো তার জবাবদিহি তাদের করা উচিত। তথ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে তাদের সাথে কথা বলতে পারে, তাদের ব্যাখ্যা চাইতে পারে, প্রয়োজনে সেন্সর বোর্ড বাতিল করে নতুন সদস্যের সমন্বয়ে নতুন বোর্ড গঠন করতে পারে। এভাবে সিনেমা শিল্প চলতে পারে না। এ শিল্পকে বিনোদনের নামে জাতীয় চরিত্র ও মন-মানসিকতা ধ্বংসের লাইসেন্স দেওয়া যায় না। এব্যাপারে সরকার চুপ থাকতে পারে না। সরকারের উচিত বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আইন ভঙ্গকারী দায়ী চিত্র নির্মাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। আমরা সরকার, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ, সৎ চিত্র নির্মাতা ও ফিল্মের সাথে জড়িত অন্য ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৪শে জানুয়ারি ২০০০

www.pathagar.com

পণ্য রফতানি হ্রাস রোধ করুন

দৈনিক অর্থনীতির একটি রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববর্তী বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় কিছু পণ্যের রফতানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। চামড়াজাত দ্রব্যাদি একটি গুরুত্বপূর্ণ রফতানিজাত পণ্য। এর রফতানি ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে যেখানে ছিল ৫ হাজার ৪১৬ মেট্রিক টন, সেখানে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে এর রফতানি হয়েছে ২ হজার ৩৪০ মেট্রিক টন। অপ্রচলিত পণ্য যেটি রফতানির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার রফতানি যেখানে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে ছিল ২২ হাজার ৭৬৭ মেট্রিক টন, সেখানে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে রফতানি হয়েছে মাত্র ১৩ হাজার ৭৫৭ মেট্রিক টন। একই সাথে যেখানে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে কাঁচা পাট রফতানি হয় ৭ হাজার ৫৬৫ মেট্রিক টন, সেখানে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে রফতানি হয় ৩ হাজার ২৮২ মেট্রিক টন। একইভাবে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রফতানি পণ্য হিমায়িত খাদ্যের রফতানিও হ্রাস পেয়েছে।

তবে ১৯৯৯ সালের এ মাসে পূর্ব বছরের এ মাসের তুলনায় চা, তৈরি পোশাক, সারের রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব পণ্যের রফতানি বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের উৎপাদক ও রফতানিকারকদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা আশা করি, তারা তাদের রফতানির পরিমাণ ধরে রাখতে এবং আরো বৃদ্ধি করতে পারবেন।

কিন্তু কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের রফতানি হ্রাস অর্থনীতির জন্য এবং জাতির জন্য উদ্বেগজনক। এসব পণ্যের রফতানির এতো ব্যাপক হ্রাসের কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। সরকারের উচিত, এসব পণ্যের রফতানি হ্রাসের কারণ খতিয়ে দেখা এবং এ ব্যাপারে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বেসরকারি খাতকেও এ ব্যাপারে কারণ খুঁজে বের করতে হবে। তাদের উৎপাদন ব্যয় বেশি হচ্ছে কিনা, তাদের মান খারাপ হচ্ছে কিনা, তাদের শ্রমিকের দক্ষতার অভাব আছে কিনা—এসব খতিয়ে দেখতে হবে। এসব ব্যাপারে বিভিন্ন চেম্বারের দায়িত্ব আছে। তাদের সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া উচিত। বেসরকারি খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব বাংলাদেশ ফেডারেশন

www.pathagar.com

অব চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর। তাদেরকে রিসার্চ করার যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা দেশের একটি গুরত্বপূর্ণ থিংক ট্যাঙ্ক (চিন্তার কেন্দ্র) হিসাবে কাজ করতে পারে।

এটি দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের উৎপাদন খরচ অকারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা। তাহলে প্রতিযোগিতায় আমরা টিকবো না। আমাদের পণ্যের মান খারাপ হলে কেউ আমাদের পণ্য কিনবে না। আমাদের হিমায়িত খাদ্যের মান খারাপ বলে অভিযোগ আছে। এটি অবশ্যই দূর করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থমন্ত্রণালয়কে আমাদের টাকার মূল্যমান (অন্য দেশের কারেন্সির তুলনায়) ঠিক আছে কিনা তাও ভাল করে দেখতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস পছন্দ করে না। এখানে বাস্তবতার চেয়ে অনেক সময় উচ্ছ্বাস বেশি কাজ করে। যেটা সঠিক নয়। যদি বাস্তবতা এবং রফতানির স্বার্থে মুদ্রার মূল্যমান পুনঃ নির্ধারণের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে তা করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৪ অক্টোবর ১৯৯৯

www.pathagar.com

বৈদেশিক সাহায্য নীতি প্রসঙ্গে

একটি জাতীয় দৈনিকের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদকের খবরে জানা যায় যে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, অতীতে দেশের বৈদেশিক সাহায্যনীতি কখনো সুচিন্তিতভাবে প্রণয়ন করা হয়নি। সব সময়ই দাতাগোষ্ঠীর চাপিয়ে দেওয়া নিয়মনীতি মেনে নিতে হয়েছে। 'এইড ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডিপ্লোমেসি নিউ ফর এইড পলিসি' বইয়ের প্রকাশনা উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় এসব কথা তিনি বলেন।

অর্থমন্ত্রী আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যর্থতার দিক তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য অনেক অনুন্নত দেশ বৈদেশিক সাহায্যের নামে এক নতুন ধরনের আগ্রাসনের শিকার। তবে এ ব্যাপারে আমরা নিজেরাই সবচেয়ে বেশি দায়ী। বৈদেশিক সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে আমরা সুস্পষ্ট কোন নীতি অনুসরণ করিনি। অনেক অপ্রয়োজনীয় ঋণ আমরা সব সময়ই গ্রহণ করেছি। এর ফলে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং অন্যান্য সাহায্যকারী সংস্থা আমাদের ওপরে চেপে বসেছে। আমরা ভুলে যাই যে তাদের অনেক প্রস্তাব ভাল হলেও সব প্রস্তাব ভাল নয়। ঐসব সাহায্যকারীর নিজস্ব একটি পরিকল্পনা আছে। তারা তাদের এজেন্ডা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়।

আমাদের সরকারি কর্মচারী, শিল্পপতি, ঠিকাদার এবং কনসালট্যান্টদের একটি অংশ বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। তারা জানে যে ঐসব সাহায্য আসলে তাদের বিদেশ ভ্রমণ, স্কলারশিপ, কন্ট্রাক্ট পেতে এবং কনসালট্যান্ট হতে সুবিধা হয়। এজন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ইআরডি'র বাইরের স্বাধীন অর্থনীতিবিদদের তীক্ষ্ণ পরীক্ষার পরই কেবল বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। এমনকি অফেরতযোগ্য সাহায্যের প্রস্তাবও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কেননা এ সবের পেছনে তাদের স্বার্থ থাকতে পারে, যা আমাদের জন্য ভাল নয়।

এ প্রসঙ্গে ২৫ অক্টোবর দৈনিক মুক্তকণ্ঠে প্রকাশিত একটি সংবাদ প্রণিধানযোগ্য। তাতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ ছাড়াই

www.pathagar.com

বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার করার চিন্তা করছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, "বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে নয়, বিদ্যুৎ খাতের সফল সংস্কার বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটেই হতে হবে।"

এ দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ। বিশ্বব্যাংক বিগত সরকারের আমলে বিদ্যুৎ খাতে সকল সাহায্য বন্ধ করে দেয়, যার ফলে বর্তমান সরকার এ খাতে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তাদের ওপর নির্ভর করা যায় না। আমাদের নীতি আমাদেরই নির্ধারণ করতে হবে।

আমাদের দেশে একদল অর্থনীতিবিদ আছেন যারা মনে করেন, বৈদেশিক সাহায্যের উপর আমরা আমাদের নির্ভরতা অনেক কমিয়ে আনতে পারি। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ড. খলীকুজ্জমান আহমদ। সরকারের উচিত এসব অর্থনীতিবিদদের সাথে বসা এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৯ অক্টোবর ১৯৯৯

www.pathagar.com

প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন চালু

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আগামী জানুয়ারি ২০০০ সাল থেকে বাধ্যতামূলক প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন চালু করতে যাচ্ছে। ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী শুল্ক ফাঁকি রোধ ও শুল্ক আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছিলেন। বাজেট ঘোষণার ৩ মাসের মধ্যেই তা চালু করার কথা ছিল, কিন্তু যথাসময়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সক্ষম না হওয়ায় তা কয়েক মাস বিলম্বে চালু হতে যাচ্ছে।

প্রি-শিপমেন্ট চালু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। একেক অঞ্চলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন একটি প্রি-শিপমেন্ট এজেন্সিকে নিয়োগ করা হবে। প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করে অডিট এজেন্সিকেও দায়িত্ব দেওয়া হবে। টেন্ডার ডাকা, খোলা ও যাচাইয়ের একটি ভাল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এর ফলে আশা করা যায় উপযুক্ত কোম্পানিই দায়িত্ব পাবে।

প্রি-শিপমেন্ট কোম্পানির দায়িত্ব হচ্ছে আমদানির পূর্বেই বিদেশী বন্দরে অথবা অন্য সুবিধাজনক স্থানে বা রফতানিকারকের ফ্যাক্টরিতে মালামাল যাচাই করে তার সংখ্যা বা পরিমাণ, তার গুণাগুণ এবং তার মূল্য নির্ধারণ করা। প্রি-শিপমেন্ট কোম্পানিসমূহ তাদের ইন্সপেকশন সম্পন্ন করে মালামাল সিল করে দেয় এবং উপরোল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে সার্টিফিকেট দেয়। এ সার্টিফিকেট তারা সরাসরি শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে। শুল্ক কর্তৃপক্ষ এ সার্টিফিকেট-এর ভিত্তিতেই আমদানি যোগ্যতা, মূল্য নির্ধারণ এবং শুল্ক নির্ধারণ করে থাকে। শুল্ক কর্তৃপক্ষ সাধারণত পুনরায় পরিদর্শন, মূল্য নির্ধারণ এবং শুল্কায়ন থেকে বিরত থাকে। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষ ইন্সপেকশন এজেন্সির সুপারিশ অগ্রাহ্য করতে পারে এবং পরিদর্শন করে শুল্ক নির্ধারণ করতে পারে।

বাংলাদেশে ইতঃপূর্বেও প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। অবশ্য তা বাধ্যতামূলক ছিল না। আমদানিকারক ইচ্ছেমতো ইন্সপেকশন করাতে পারতেন, তবে তাকে ইন্সপেকশন সরকার অনুমোদিত একটি এজেন্সি

www.pathagar.com

থেকেই করাতে হতো। এ ব্যবস্থার ফলাফল আগেরবার ভাল ছিল না। এজেন্সিগুলোর দুর্নীতি ও অদক্ষতার অভিযোগ উঠেছিল। খুব কম মূল্যে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছিল এবং এর ফলে প্রকৃতপক্ষে শুল্ক কমে যাচ্ছিল। স্থানীয় শিল্প ধ্বংসের প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। কেননা, কম মূল্যে কম শুল্ক দিয়ে নিয়ে আসা পণ্যের সাথে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য কুলাতে পারছিল না। ফলে, শেষ পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৯৯৮ সালে পদ্ধতিটি তুলে দেয়।

পরবর্তীতে বাধ্যতামূলক প্রি-শিপমেন্ট চালু করার জন্য চাপ বৃদ্ধি পায়। এসব চাপের পেছনে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা ছিল। তারা এ ব্যবস্থা চালু করাকে সঠিক শুল্কায়নের জন্য যথার্থ মনে করেন। পূর্বের ইন্সপেকশন ব্যবস্থার কিছু ত্রুটিকে তারা পূর্বের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেন।

এতে সন্দেহ নেই যে, নতুন ব্যবস্থা পূর্বের চেয়ে উন্নত। এতে অডিটের ব্যবস্থা রয়েছে যা পূর্বে ছিল না। টেন্ডারের মাধ্যমে এজেন্সি যাচাই-এর ব্যবস্থাও পূর্বের চেয়ে ভাল। এর ফলাফল কি হবে তা অবশ্য ভবিষ্যতেই বলা যাবে। তবে সরকার যে কয়েকশত কোটি টাকা শুল্ক বৃদ্ধি কেবল এ মাধ্যমেই করতে চাচ্ছেন, তা হবে বলে মনে হয় না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, এটি একটি মধ্যকালীন ব্যবস্থা হতে পারে, এটি কখনো স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না। কোন উন্নত দেশেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। তারা তাদের শুল্ক প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখেন। অবশ্য আমাদের শুল্ক ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখা বর্তমানে অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে কিছুদিনের জন্য এ ব্যবস্থা পরীক্ষা করা যায়; কিন্তু আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, একটি উন্নত দক্ষ ও সৎ শুল্ক প্রশাসন ও শুল্কায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা—যাতে আমাদের বিদেশী কোম্পানির ওপর নির্ভর করতে না হয়।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

মুদ্রাস্ফীতিভিত্তিক বেতন ভাতা

একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে দেখা যায় যে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য আর পে কমিশন থাকছে না। প্রতি বছর মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হবে। এ ব্যাপারে সরকারের উচ্চমহলে চিন্তা-ভাবনা চলছে। দু'এক মাসের মধ্যে এ ব্যাপারে ঘোষণা আসছে।

বিষয়টি জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে এতদিন পর্যন্ত কয়েক বছর পরপর বেতন কমিশন গঠন করা হতো। তারা দু'এক বছর ভাবনা-চিন্তা ও পর্যালোচনার পর নতুন বেতন স্কেল ও সুবিধাদি ঘোষণা করতেন। কোন ঘোষণাতেই সরকারি কর্মচারীরা সন্তুষ্ট হতো না। সরকারও বেতন কমিশনের সকল প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে না। কেননা সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা ব্যাপক। অসন্তোষ লেগেই থাকে। সরকারি কর্মচারীরা আন্দোলন করতে থাকে। বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা।

এ পরিস্থিতির কোন সমাধান করা যায়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহল এসব কারণে সরকারের সামনে দু'টি প্রস্তাব রেখেছিল; বিশেষ করে সরকারি আর্থিক সীমাবদ্ধতা সামনে রেখে। একটি হচ্ছে বেতন-ভাতাকে মুদ্রাস্ফীতির সাথে সংযুক্ত করা। তা হলে একবার বেতন ঠিক করার পর প্রত্যেক বছর মুদ্রাস্ফীতির সাথে সঙ্গতি রেখে বেতন শতকরা হারে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

অন্য প্রস্তাবটি হচ্ছে সরকারের আকার ছোট করা। বাংলাদেশ সরকারের আকার অনেক বড়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারেরও এত কর্মচারী নেই। এত বিভাগও নেই। আমাদের দেশে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সংখ্যা অনেক বেশি। যে কোন অফিসে গেলে দেখা যাবে, কর্মচারীদের অধিকাংশই গল্প করছে বা পত্রিকা পড়ছে বা চা খাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ কর্মচারীর সংখ্যা অধিক হওয়া। অবশ্য অন্যান্য কারণও আছে। সরকারই সবচেয়ে বড় কর্ম নিয়োগকারী এ যুক্তিতে এসব চলছে। অথচ আমাদের দেশের ১৩ কোটি জনগণের শতকরা ১ ভাগেরও কম সরকারি চাকরি করে। সুতরাং সরকারি চাকরি আমাদের কর্মে নিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র নয়। তা হওয়ারও প্রয়োজন

www.pathagar.com

নেই। আমাদের রাজস্বের বেশিরভাগ নানাভাবে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও গাড়ি বাড়িতে ব্যায় হবে, তা হওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমাদের সরকারের সাইজ অবশ্যই ছোট করতে হবে এবং বেসরকারি খাতে নানাভাবে কর্মে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

অন্যদিকে বেতন কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা বাতিল করে প্রত্যেক বছর মুদ্রাস্ফীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব। এটা আমাদের অনেক ঝামেলা থেকে মুক্ত করবে। নানা আন্দোলন, নানা বিলম্ব হতে আমরা রক্ষা পাবো।

আমরা মনে করি যে, সরকার উপরিউক্ত প্রস্তাব কার্যকরী করার পূর্বে এ ব্যাপারে অর্থনীতিবিদদের একটি প্যানেলের সাথে আলোচনা করবে। এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদেও আলাপ করা প্রয়োজন। তা হলে উল্লিখিত প্রস্তাব কার্যকরী করা তুলনামূলকভাবে সহজ হবে। এ প্রস্তাবের প্রতি বিরোধিতাও থাকবে না। সরকারি কর্মচারীদের এসোসিয়েশনের সাথেও আলাপ করা যেতে পারে। আশা করি, সরকার আমাদের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে দেখবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ

দৈনিক অর্থনীতিতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বিগত ২৩ বছরে বাংলাদেশের প্রবাসীরা ৫২ হাজার কোটি টাকা দেশে পাঠিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সন্তোষজনক একটি খবর।

প্রবাসীদের পাঠানো এ টাকা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লেগেছে। তাদের পাঠানো এ বৈদেশিক মুদ্রা না পেলে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন খাতে আমাদের পরিস্থিতি অনেক খারাপ হতো। আমরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, শিল্পের কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য যথাযথ পরিমাণে আমদানি করতে পারতাম না, এর ফলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ হতো। প্রবাসীদের এ অবদানের জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

তবে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং যারা ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত তাদের অনেকেই জানেন, যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এভাবে দেশে এসেছে প্রায় তার কাছাকাছি পরিমাণ টাকা বৈধ পথে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে আসেনি। প্রবাসীদের অর্জনের একটি বিপুল অংশ অতীতে অবৈধ পথে চলে গেছে। হুন্ডি ব্যবসায়ী এবং অন্যরা নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে নিয়েছে। আমাদের প্রবাসীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটি অংশ এভাবে চোরাচালান অথবা অন্য দেশে সম্পদ পাচারে ব্যয় হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার বিভিন্ন সময়ে এ পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৮৬-৮৭ সালে দুর্নীতি দমন সংস্থা হুন্ডি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে; যার ফলে পরবর্তী বছরে বৈদেশিক মুদ্রা আসার পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়।

প্রবাসীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা যাতে পুরোপুরি দেশে আসতে পারে সে জন্য সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের বিভিন্ন ব্যাংক যদি আরব বিশ্বে তাদের শাখা খুলতে পারে তাহলে তাতে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য হবে। এসব শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। শাখা খোলা কিছুটা জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যেসব ব্যাংকের অবস্থা ভাল সেগুলো আরব বিশ্ব, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং মালয়েশিয়ায় লিয়াজোঁ অফিস

www.pathagar.com

খুলতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকে এ ধরনের যেসব দরখাস্ত আছে ব্যাংক সেগুলো দ্রুত অনুমোদন করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ জন্য বিভিন্ন ব্যাংককে উৎসাহিত করতে পারে। আমাদের মুদ্রামান বর্তমানে সঠিক আছে বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি (inflation)-এর দিকে লক্ষ রেখে সব সময় মুদ্রামানকে সঠিক রাখতে হবে, যাতে আমাদের প্রবাসীরা বৈধ পথে তাদের অর্জিত অর্থ দেশে পাঠাতে উৎসাহবোধ করে।

আশা করি, সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ০৮ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

চাঁদাবাজরা অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে

একটি দৈনিক সংবাদপত্রের শীর্ষ শিরোনাম 'চাঁদাবাজদের ভয়ে বাদামতলীর ব্যবসায়ীরা শঙ্কিত'। প্রকৃতপক্ষে সারাদেশের অবস্থা একই। চাঁদাবাজদের কাছে দেশের অধিকাংশ শহর-বন্দরের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্দি হয়ে আছে। আমরা জানি যে, চাঁদাবাজদের কারণে অনেক ব্যবসায়ী নিহত পর্যন্ত হয়েছেন। অনেকে আহত হয়েছেন। অনেকে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। অনেকে স্থান বদল করেছেন।

এ পরিস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব চাঁদাবাজের কারণে নতুন ব্যবসায়ী এবং শিল্পোদ্যোক্তারা ব্যবসা ও শিল্পের উদ্যোগ নিতে শঙ্কা বোধ করছেন। বিশেষ করে মফস্বলে এবং শহরসমূহের প্রান্তে কেউ ব্যবসা বা শিল্পের উদ্যোগ নিতে সাহস করছেন না। পুরানো ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের বেশিরভাগ চাঁদা দিয়েই টিকে আছেন। এতে তাদের ব্যবসা অনেক ক্ষেত্রে লাভজনক থাকছে না। অথবা তারা দ্রব্যমূল্য বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন এবং এ অতিরিক্ত মূল্য দিচ্ছে শেষ পর্যন্ত জনগণ।

এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেশের শিল্প উন্নয়ন, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সবকিছুই এর ফলে প্রভাবিত হবে। তাই চাঁদাবাজদের সমস্যা এবং সামগ্রিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির একটি সুরাহা আমাদের করতে হবে। সরকারকে এ ব্যাপারে পূর্ণ মূল্যায়ন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এতে সন্দেহ নেই যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহ এ ব্যাপারে বিগত কয়েক বছরে বিশেষ কোন অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। এর কারণ কি তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে। সরকারকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে কোন দ্বিধা থাকলে চলবে না।

রাজনীতি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অর্থনীতি পুনরুদ্ধার দেশের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি অর্থহীন হয়ে যাবে যদি আমরা অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে না পারি। এ জন্য রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা না করে চাঁদাবাজ এবং অন্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

www.pathagar.com

আমরা তাই পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবো যেন তারা চাঁদাবাজ উৎখাত করার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আমরা সরকারকেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করবো।

চাঁদাবাজদের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায়ও সমস্যা হচ্ছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দণ্ডবিধিতে এ ব্যাপারে সুষ্ঠু ধারা যোগ করা উচিত যে, কারা চাঁদা আদায় করতে পারবে এবং কারা পারবে না। কেবল কতগুলো শর্ত পূরণ হলেই একটি সংস্থাকে চাঁদা আদায় করতে দেওয়া উচিত, অন্যথায় নয়। এ ব্যাপারে সামগ্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমরা বিশেষ করে আইন ও বিচার এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাই।

দৈনিক অর্থনীতি, ২ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সভা

বিগত ১৩-১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ফোরামের সদস্য হচ্ছে বাংলাদেশকে সহায়তা দানকারী বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা। এটা ছিল চলতি বছরের মধ্যবর্তী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা বৈঠকে। বৈঠকে সার্বিক অর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়। যেসব বিষয় আলোচনায় গুরুত্ব পায় তা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চালু বিভিন্ন সংস্থার কর্মসূচি, বস্তি অপসারণ এবং পতিতালয় উচ্ছেদ। দাতা দেশ ও সংস্থার অনেকেই সংস্কারের ধীরগতি এবং বস্তি ও পতিতালয় উচ্ছেদের নিন্দা করেন। বৈঠক শেষে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি গত বছর প্রলয়ংকরী বন্যা সত্ত্বেও সামাজিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বজায় রাখার জন্য সরকারের প্রশংসা করেন। বৈঠকে বিভিন্ন খাতে সংস্কার প্রক্রিয়া গতিশীল করার ব্যাপারে সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের শুরুতে বেশিরভাগ প্রতিনিধি দেশের সংস্কার কর্মসূচির ধীরগতির সমালোচনা করেছিলেন। আমরা মনে করি বাংলাদেশের ব্যাংকিং, প্রশাসন, রাজস্ব ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। এখানে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ আশির দশকের শুরু থেকেই সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বিভিন্ন সরকারের আমলে এ সংস্কারের কাজ এগিয়ে গিয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলেও সংস্কার অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের নীতি বিগত দুই যুগ থেকে একই রয়েছে।

অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশ সংস্কার কর্মসূচিতে অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বাণিজ্য নীতিতে ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। প্রায় সকল দ্রব্য এখন আমদানিযোগ্য। নিষিদ্ধ তালিকায় মাত্র কয়েকটি পণ্য আছে। রাজস্ব খাতে ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করা হয়েছে, আয়কর হার হ্রাস করা হয়েছে, শুল্ক করের হার এবং স্তর কমানো হয়েছে। ব্যাকিং খাতে ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে ব্যাংকিং আইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে; আন্তর্জাতিক মানের ঋণ শ্রেণীকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে; ক্রেডিট ইনফমেশন ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য অনেক সংস্কার করা হয়েছে। যার তালিকা বেশ দীর্ঘ।

www.pathagar.com

এসব সংস্কারের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। অবশ্য এসবের ফল একদিনে পাওয়া যায় না। অনেক সময় লাগে। তদুপরি প্রশাসনিক দক্ষতার প্রশ্ন আছে, যে ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য অনেক সংস্কার করতে হবে।

অনেকেই মনে করেন যে, বাংলাদেশে প্রয়োজনের চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি দ্রুত সংস্কার করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের শিল্প তাল সামলাতে পারছে না। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেকে বলেন, বাংলাদেশের অতি সংস্কারের রোগে ধরেছে। এটা গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার। বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ ও দাতা দেশের তুলনায় আমাদের স্বার্থ অনেক বেশি জড়িত। বিদেশীদের অনেক ওষুধ আমাদের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। তাদের তাড়াহুড়া করে প্রস্তাব দেওয়ার কিছুটা রোগ আছে। তাই বাংলাদেশ সরকারকে ভেবে চিন্তেই সংস্কার কর্মসূচি চালু রাখতে হবে। যেমন ধীরগতি সঠিক নয়, অতিরিক্ত তাড়াহুড়াও সঠিক নয়।

বৈঠকের প্রথম দিনে পতিতালয় উচ্ছেদ ও বস্তি উচ্ছেদের ওপর দাতাগোষ্ঠী প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি কথা বলেছেন। বাংলাদেশ সরকার টানবাজারের পতিতাদের অন্য স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেই ঐ পল্লী বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। হতে পারে বস্তি উচ্ছেদের ব্যাপারে সরকার তাড়াহুড়া করেছে। কিন্তু সরকারি জমিতে অবৈধ বস্তি গড়ে তোলা নিশ্চয়ই মানবাধিকার নয়। তারপর এসব অবৈধ বস্তির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে তাও মারাত্মক। সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য ইতোমধ্যে ব্যবস্থাও নিয়েছে। এনজিওদের সাহায্য করতেও অনুরোধ করেছে। এ প্রেক্ষিতে দাতাদের এ ব্যাপারে বক্তব্য অতি প্রতিক্রিয়া বলেই আমাদের মনে হয়।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে অবশ্য করণীয়

বাংলাদেশে অর্থনীতি গড়ে তোলা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। আমাদের অধিকাংশ সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সমস্যার পিছনে রয়েছে একটি অনুন্নত অর্থনীতি। আমাদের অর্থনীতি এত অনুন্নত হওয়ার কথা নয়। আমাদের রয়েছে পর্যাপ্ত মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদ। আমরা আমাদের মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারিনি।

আমাদের মানবসম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাবার জন্য সরকার ও জনগণকে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে। দু'টি প্রধান সমস্যা বর্তমানে আমাদের পিছিয়ে রাখছে। একটি হচ্ছে আমাদের দুর্বল প্রশাসন (Poor Governance) এবং অন্যটি হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি।

আমাদের প্রশাসন বর্তমানে অত্যন্ত দুর্বল। দুই তিন যুগ পূর্বে আমাদের প্রশাসন এরকম ছিল না। বেদনার কথা হলেও এ কথা সত্য যে ২৫-৩০ বছর পূর্বের তুলনায় এখন আমাদের যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার, শিল্প ব্যবস্থার গুণগত মান নিম্নে। কিছু ব্যতিক্রমও থাকতে পারে।

আমাদের বন্দরসমূহ এখন অরাজকতার শিকার। রাস্তাঘাট প্রায়ই কোন না কোন দল বা গোষ্ঠী বন্ধ করে দেয়। দুর্নীতি প্রায় সব জায়গাতেই ব্যাপক। দক্ষতার ব্যাপক পতন হয়েছে। নৈতিক অবক্ষয়ও ব্যাপক। অথচ সঠিক প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি না করে উন্নয়ন সম্ভব নয়। অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ভয়াবহ বলা চলে। খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশ বাহিনী প্রায়ই ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারছে না এবং তাদের মধ্যে দুর্নীতি ব্যাপক।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। অধিকাংশ উদ্যোগী লোকের পক্ষে এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বা শিল্প স্থাপন করা কঠিন। কেননা তারা ডাকাতি ও চাঁদাবাজির শিকার হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে এ দু'টি প্রধান সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা এ দু'টি সমস্যার দিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিন।

দৈনিক অর্থনীতি, ১০ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

জনকল্যাণ ও জবাবদিহিতামূলক স্বাস্থ্যনীতি

একটি দৈনিকের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঃ নারী প্রেক্ষিত' শীর্ষক এক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন যে, ধনিক শ্রেণী জবাবদিহিতামূলক স্বাস্থ্যনীতিকে সমর্থন দেবে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, সমাজে শ্রেণী বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং ধনিক শ্রেণী চিকিৎসার জন্য বেসরকারি ক্লিনিক ও বিদেশের আশ্রয় নেয়। এ শ্রেণীর লোকজনই নীতি-নির্ধারণের ভূমিকায় রয়েছেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান জাতির জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আজকে অত্যন্ত গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার যে, ভবিষ্যতে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যনীতি কি হতে যাচ্ছে? এরশাদ সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে ক'টি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন তার একটি ছিল স্বাস্থ্যনীতি। ঐ সময়ের প্রেক্ষিতে তা অত্যন্ত জনকল্যাণমূলক ছিল। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপক পরীক্ষা না করেই ঐ স্বাস্থ্যনীতি বাতিল করে দেয়; কিন্তু তার পরিবর্তে কোন স্বাস্থ্যনীতি বিএনপি সরকার প্রণয়ন করে যায়নি। বর্তমান সরকারও এ পর্যন্ত কোন স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করতে পারেনি। ক্ষমতায় আসার তিন বছর পার হওয়ার পর কোন স্বাস্থ্যনীতি বর্তমান সরকার করতে পারবে কিনা তা বলা কঠিন। যাহোক, একটি স্বাস্থ্যনীতি তৈরি করা প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানা যায়। ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যনীতি কি রকম হবে? এর সাথে মনে রাখতে হবে যে, উপমহাদেশে আমরা মূলত ব্রিটিশ ধরনের স্বাস্থ্যনীতি অনুসরণ করছি, যাতে সকল জনগণের ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা মূল বিষয়। এটি আমেরিকান ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমেরিকান ব্যবস্থায় জনগণের প্রকৃতপক্ষে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। সেখানে যাদের ইন্স্যুরেন্স আছে কেবল তারাই চিকিৎসা পায়। জনগণের এক বিপুল অংশ ইন্স্যুরেন্স করতে পারেন না। তারা মূলত চিকিৎসা ব্যবস্থার বাইরে। তাদের সংখ্যা শতকরা ৩০-৪০ ভাগ। এ ব্যবস্থাকে সংস্কার করার জন্য ক্লিনটন প্রশাসন চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজি হয়নি। হিলারি ক্লিনটন বহু চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেননি। আমেরিকান ধনিক শ্রেণী, চিকিৎসক ও প্রাইভেট হাসপাতাল

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষের লবির কারণেই তারা তা করতে পারেননি। পরিশেষে তারা তাদের চেষ্টা পরিত্যাগ করেন।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যনীতির ক্ষেত্রে আমরা আমেরিকান পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি না। এটা জনকল্যাণমূলক নয়। এতে অনেক বঞ্চনা ও অবিচার রয়েছে। আমাদের মূলত ব্রিটিশ ধরনের জনকল্যাণমূলক স্বাস্থ্যনীতি ও চিকিৎসা ব্যবস্থাই অনুসরণ করতে হবে; যেখানে এদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বাস্থ্যখাতকে প্রধান্য দেওয়ার কথা। এ প্রেক্ষিতে প্রফেসর রেহমান সোবহানের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিসরত চিকিৎসক লবি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে গেছে। এ কারণে স্বাস্থ্যনীতির ক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে আমাদের স্বাস্থ্যনীতি ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার যন্ত্রে পরিণত না হয়। আমাদের স্বাস্থ্যনীতিকে সকল জনগণ বিশেষ করে সাধারণ জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে প্রণয়ন করতে হবে। আমেরিকান ধরনের স্বাস্থ্যনীতি আমাদের জন্য মোটেই উপযোগী হবে না। আশা করি সরকার, রাজনীতিবিদ ও জননেতৃত্ব এ বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৭ নভেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

নকল ও ভেজাল পণ্যের সমস্যা

ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত শিরোনাম হচ্ছে, 'রাজধানীতে নকল ও ভেজাল পণ্যের রমরমা ব্যবসা।' প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রাজধানীতে নকল পণ্যের জমজমাট ব্যবসা চলছে। এর ফলে শিল্পপতি ও প্রকৃত ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং নগরবাসী ভোক্তারাও প্রতারিত হচ্ছেন। নকল পণ্যের মধ্যে ওষুধ, খাদ্যসামগ্রী, সাবান ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী রয়েছে। দৈনিক অর্থনীতিতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনেও দেখা যায় যে, ওষুধ প্রশাসনের দুর্নীতি ও অদক্ষতার সুযোগে কিছু লোক বিপুল পরিমাণ ভেজাল ওষুধ বাজারজাত করছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করছে।

পরিস্থিতি যে সংকটজনক তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে অদক্ষতা, অনৈতিকতা ও দুর্নীতি ব্যাপক হওয়ার কারণে সমস্যার পাহাড় গড়ে উঠেছে। সমস্যা একটি নয় অসংখ্য। কোন্ সমস্যাটি আগে সমাধান করতে হবে, কোন্‌টি পরে তাও নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এখন প্রয়োজন একটি দক্ষ, সৎ ও পরিশ্রমী প্রশাসন ব্যবস্থার এবং এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। আমরা কেবল দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহকে এসব লক্ষ্যকে সামনে রাখার জন্য অনুরোধ করতে পারি। তাদের পার্টি সেক্রেটারিয়েটসমূহের উচিত এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরি করা, যাতে অন্তত দীর্ঘমেয়াদে আমাদের সমস্যা-ভারাক্রান্ত জাতি মুক্তি পেতে পারে।

পাশ্চাত্যের দেশসমূহে ভেজাল নেই বললেই চলে। বহু পূর্বেই তারা এ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে। তারা যদি পারে, আমরা কেন পারবো না? ভেজাল খাদ্য ও ওষুধ আমাদের জনস্বাস্থ্য ও জাতির ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্যান্য পণ্যের ভেজাল আমাদের শিল্প ও ব্যবসার জন্য ধ্বংসকারী এবং জনগণের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

তাই ভেজাল প্রতিরোধ ও নির্মূলে সরকারকে ব্যাপক ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে ওষুধ প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, শিল্পমন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে ব্যাপক সমন্বয়ের প্রয়োজন। এ সমন্বয় বলতে গেলে

www.pathagar.com

এখন নেই। প্রচলিত ধরনের চেকিং দ্বারা এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বর্তমানে সবার সাথে আলোচনা করেই বিশেষ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে। উন্নত দেশ এ ক্ষেত্রে কি সব ব্যবস্থা নিয়েছে তা আমাদের দ্রুত জানতে হবে এবং তাদের পদ্ধতির মধ্যে যা আমাদের দেশে ব্যবহার করা সম্ভব তা ব্যবহার করতে হবে। বেসরকারি খাতের সংস্থাসমূহ যেমন বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এবং অন্য চেম্বারসমূহকেও এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারকে পরামর্শ দিতে হবে এবং সরকারের সাথে সহযোগিতা করতে হবে।

আমরা আশা করি, সরকার এবং অন্য সংস্থাসমূহ আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৮ নভেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

পুলিশ কেন ইউসিবিএল-এ ব্যর্থ হলো?

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের ঘটনায় পুলিশের ব্যর্থতায় পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা নতুন করে প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। ঐ ব্যাংকে কয়েকদিন পূর্বে যে ঘটনা ঘটে তার ওপর আমরা পূর্বেই সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছি। এ সম্পর্কে আমরা আজ শুধু এ মন্তব্য করেই ক্ষান্ত হতে চাই যে, বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ ব্যাংকের তথাকথিত দুই পরিচালনা পর্ষদকে নোটিশ দিয়ে খুবই কাঁচা কাজ করেছে। ব্যাংকিং খাতের অভিভাবকদের কাছ থেকে এ রকম কাঁচা কাজ আশা করা যায় না। গভর্নর নিজেই বলেছেন যে, যে ব্যক্তিটি ঐ ব্যাংকের বোর্ড দখল করে চেয়ারম্যান হবার চেষ্টা করেছিলেন, তার কোন আইনগত অধিকার ঐ ক্ষেত্রে ছিল না।

আজকে আমরা ঐ ব্যাংকে মোতায়েন করা পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাই। কোন স্থানে পুলিশ মোতায়েনের অর্থ সে স্থানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ঐদিন পরিচালনা পরিষদের অনুরোধে অনেক পুলিশ ব্যাংকের নিচে এবং আশপাশে প্রহরায় ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আখতারুজ্জামান বাবু এবং তার ছেলে কেমন করে ২০/৩০ জন অস্ত্রধারী দুষ্কৃতিকারীসহ ব্যাংকের ভেতর এমনকি পরিচালনা পর্ষদের সভায় দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল, এ প্রশ্ন জনগণের প্রতি স্তরে বিরাজ করছে। পুলিশ কেন দায়িত্ব পালন করল না? কিংবা কেন দায়িত্ব পালন করতে পারল না? এ বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার।

পুলিশ বাহিনী আজকাল প্রায় জায়গাতেই সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। প্রায় জায়গাতেই ব্যর্থ হচ্ছে। এটা কেন হচ্ছে? এ প্রশ্ন জাতির। সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের এর কারণ জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করা উচিত। স্থানীয় রাজনৈতিক চাপের কথা বলে পুলিশ পার পেতে পারে না। অধঃস্তন পুলিশ কর্তৃপক্ষ কেন রাজনীতিকদের কথা শুনছেন? তারা তাদের 'চেইন অব কমান্ডে'র বাইরে কারো কথা কেন শোনেন? এ দোষ পুলিশের। তারা সুস্পষ্ট করে বলতে পারেন যে, তাদের চেইন অব কমান্ডের বাইরের কারো কথা তারা শুনবেন না। বদলিতে ভয় পেলে তো তারা দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। বদলি কয়জনকে করবে, কতবার করবে? জুজুর ভয়ে চললে দেশ রসাতলে যাবে।

www.pathagar.com

কিছুদিন পূর্বে 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পীস স্টাডিজে'র উদ্যোগে একটি গোলটেবিল বৈঠকে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমাজে পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাপক ও গঠনমূলক আলোচনা করেছেন। ঐ আলোচনায় দেখা যায় যে, জনগণ পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। সে আস্থা পুনরুদ্ধারে অনেক প্রস্তাব সেখানে দেওয়া হয়। সরকার ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের উচিত ঐ সকল প্রস্তাবের ওপর পরীক্ষাপূর্বক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ইউসিবিএল-এর ঘটনায় পুলিশের চূড়ান্ত ব্যর্থতার তদন্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। ঐদিনের ব্যর্থতার জন্য কারা প্রকাশ্যে বা নেপথ্যে দায়ী তা বের করে ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত কর্তব্য। আশা করি সরকার তা অবিলম্বে করবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ০২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

বাংলাদেশের নিরাপত্তার আঙ্গিকসমূহ

বিভিন্ন প্রধান সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, গত ২৭ ও ২৮ নভেম্বর সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক ও পিস স্টাডিজ-এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী গোল টেবিলে বাংলাদেশের নিরাপত্তার আঙ্গিকসমূহের মধ্যে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামরিক বাহনীর ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ এতে অংশগ্রহণ করেন ও মূল্যবান প্রস্তাব রাখেন।

সম্মেলনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আসে তার মধ্যে একটি হচ্ছে অবিলম্বে বাংলাদেশের জন্য একটি প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা, যেটা এতদিন করা হয়নি। সভায় বক্তাগণ মত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের একটি উপযুক্ত সাইজের প্রফেশনাল আর্মি থাকতে হবে; তবে তার সাইজ কি হবে তা প্রতিরক্ষা নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং তা নির্ধারণ করবে প্রতিরক্ষা যারা বোঝেন তারা অর্থাৎ সামরিক বিশেষজ্ঞরা।

রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় বক্তব্য আসে যে, সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়া সুষ্ঠু রাজনীতি হবে না এবং তা হলে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন হবে না। এ প্রসঙ্গে নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সকল প্রকার প্রভাবমুক্ত করার জন্য প্রস্তাব আসে যে, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের আওতায় আগামী তিনটি সাধারণ নির্বাচন সামরিক বাহিনী সার্বিকভাবে পরিচালনা ও তদারক করবে। নির্বাচন কমিশনের সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিচার বিভাগ থেকে হবে। নির্বাচন কয়েক দিনে হবে; যাতে সামরিক বাহিনী নির্বাচন পরিচালনা সহজে করতে পারে। ব্যালট বাক্স সামরিক বাহিনী কেন্দ্রীয় স্থানে নিয়ে আসবে এবং একই দিনে ভোট গণনা শুরু হবে। সভায় রাজনীতির বর্তমান অবস্থায় সকলেই হতাশা ব্যক্ত করেন।

অর্থনীতি ও নিরাপত্তা পর্যায়ে আলোচনায় চোরাচালানের ভূমিকা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। চোরাচালান দেশের শিল্পকে ধ্বংস করছে। এজন্য বাংলাদেশ কর্তৃক কতকগুলো স্পর্শকাতর সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার প্রস্তাব আসে। বৈদেশিক সাহায্য মূলত বিদেশের স্বার্থ রক্ষা করছে। অতি

www.pathagar.com

লিবারেলাইজেশন বা উদারীকরণের ফলে স্থানীয় শিল্প ধ্বংস হয়েছে। উল্লেখ করা হয় যে, আন্তর্জাতিক চাপ অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশের সরকার ও জনপ্রশাসনের একটি বড় কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলা করে অর্থনীতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। বাংলাদেশের সম্পদ রক্ষা করাও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দিক বলে গোলটেবিল বৈঠকে উল্লেখ করা হয়।

দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত এ গোলটেবিল বৈঠকে নিরাপত্তার ওপর সামগ্রিক পর্যালোচনা করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এ বৈঠকসমূহের আলোচনা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। আমরা মনে করি যে, বাংলাদেশের ডিফেন্স পলিসি অবলম্বে তৈরি হওয়া উচিত। দেশের রাজনীতিকে সুষ্ঠু করার জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়া উপায় নেই। দেশের নির্বাচন এখন যে মাস্তান চক্রের রণভূমিতে পরিণত হয়েছে এটা অস্বীকার করা কঠিন। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এ সম্মেলনে যে প্রস্তাব এসেছে তা সকল রাজনৈতিক দল ও জাতির বিবেচনার দাবি রাখে। দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার ওপর সরকারের উচিত পরীক্ষাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমরা আশা করি, সরকার তা করবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

মীরবাগের টুকু হত্যা

কয়েকদিন পূর্বে মীরবাগের শাহ মোহাম্মদ টুকু নিহত হয়। নিহতের পিতা জনাব আবু তাহের এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন যে, রমনা থানার সাব ইন্সপেক্টর আবু বকর পিটিয়ে এবং পানিতে ফেলে দিয়ে টুকুকে হত্যা করেছে। জনাব আবু বকর বলেন যে, এলাকার এক ফেনসিডিল ব্যবসায়ী পুলিশের দু'জন সোর্সের সহায়তায় এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব আবু তাহের বলেন, রামপুরা-মীরবাগ এলাকায় মাদক বিক্রেতারা পুলিশের সহায়তায় ফেনসিডিলসহ বিভিন্ন মাদক ব্যবসা করে আসছিল। ছাত্র-তরুণরা এতে বাধা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ প্রতিবাদীদের বিভিন্ন মামলায় জড়িত করার হুমকি দেয়। পরবর্তীতে আবু বকরের নেতৃত্বে পুলিশ উক্ত এলাকায় অভিযান চালায় এবং আবু বকর মাদক ব্যবসায়ী মনিরের কথামত টুকুকে নির্দয়ভাবে পিটিয়ে, লাথি মেরে ঝিলে ফেলে দেয়। নিহতের পিতা সাংবাদিক সম্মেলনে তদন্ত এবং বিচার দাবি করেছেন।

ঘটনাটি যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং গুরুতর তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদিকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বলা চলে। কয়েকদিন আগে কেবল ঢাকা শহরে একদিনে চারজন খুন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ৭০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমনে বিপুল অভিযোগ রয়েছে যে, তারা ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারার অপপ্রয়োগ করে লোকদের গ্রেফতার করে থানায় এবং অন্যান্য আটক রাখার কেন্দ্রে আটকে অমানুষিক নির্যাতন করে। মেধাবী ছাত্র রুবেল নিহত হওয়ার পর জনগণের সমালোচনা তুঙ্গে ওঠে। বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টে লক্ষ্য করা গেছে যে, অসংখ্য লোক পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয় এবং অনেকেই নিহত হয়।

বিগত এক মাসের পত্রিকার রিপোর্টেও দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্থানে পুলিশের হাতে কয়েকজন নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে শাহ মুহাম্মদ টুকুর ব্যাপারটি দেখতে হবে। বিষয়টি সম্বন্ধে সুষ্ঠু বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, যাতে প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করা যায়

www.pathagar.com

এবং তাদের বিচারের মাধ্যমে শাস্তি হয়। তাতে নিহতের পরিবারবর্গ কিছুটা হলেও শান্তি পাবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, পুলিশের নির্যাতনের বিষয়ে রুবেল হত্যার পর বিচারপতি হাবিবুর রহমান দ্রুততার সাথে কাজ সমাপ্ত করে তার প্রতিবেদন দাখিল করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। জনাব হাবিবুর রহমান ৫৪ ধারায় গ্রেফতারির আমূল সংশোধন এবং পুলিশ রিমান্ডের পদ্ধতির পুনঃপরিবর্তনের প্রস্তাব করেছেন। প্রায় সমগ্র জাতির দাবি হচ্ছে, ৫৪ ধারার প্রত্যাহার এবং রিমান্ড গ্রহণ বন্ধকরণ। যাই হোক, অন্তত হাবিবুর রহমান কমিশন যে প্রস্তাব করেছে, তা যদি সরকার গ্রহণ করে এবং কার্যকর করে, তাহলে পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার অনেকাংশে রোধ হতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের বিলম্ব বোধগম্য নয়। এ বিলম্বের অর্থ হচ্ছে আরো নির্যাতন এবং আরো জীবন নাশ। আশা করি সরকার এ ব্যাপারে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করবো যে, এ জাতীয় সমস্যার বিষয়ে তারা দেশের শ্রেষ্ঠ নিরপেক্ষ চিন্তাবিদদের সাথে একটি গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাদেরকে আস্থায় নিয়ে তাদের মতামত শুনতে পারেন এবং দ্রুত আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৬ জুলাই ১৯৯৯

www.pathagar.com

ওসমানী উদ্যানের দুরবস্থা

ওসমানী উদ্যান সম্পর্কে দৈনিক অর্থনীতিতে একটি প্রতিবেদন বের হয়েছে। তার শিরোনাম 'ওসমানী উদ্যান ময়লা আবর্জনার ভাগাড় ঃ অপরাধীদের অভয়ারণ্য।'

ওসমানী উদ্যান ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের বিপরীত দিকে এর অবস্থান। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিস থেকে এর দূরত্ব আধা কিলোমিটারও নয়। নগর ভবনও এর থেকে দূরে নয়। তাহলে ওসমানী উদ্যানের এ অবস্থা কেন?

ওসমানী উদ্যানের এ অবস্থা একটি প্রতীক মাত্র। গোটা দেশের একই অবস্থা। দেশের অধিকাংশ স্থানই অপরাধীদের অভয়ারণ্য এবং ময়লার ডিপোতে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করছে না। যদি এসব প্রতিষ্ঠান, বিভাগ ও ব্যক্তি তাদের দায়িত্ব পালন করতো তাহলে দেশের এ অবস্থা হত না।

জাতির সামনে একটি বড় কাজ হচ্ছে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেককে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাকে জবাব দিতে হবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এটি অন্যতম প্রধান কাজ হওয়া উচিত। আজ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি কাজ না করে পার পেয়ে যাচ্ছে। কেউ তাদের কাজ দেখছে না। কেউ হিসাব নিচ্ছে না। প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট প্রধানের দায়িত্ব হওয়া উচিত তার অধীনস্থ কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা দেখা। এজন্য বিভাগীয় প্রধান ও তার প্রধান সহকারীদের বেশি বেশি যথার্থ পরিদর্শন করা উচিত। বিভাগীয় প্রধানদের কাজ আরো গভীরভাবে সেক্রেটারি ও মন্ত্রীদের তদারকি করা প্রয়োজন। মন্ত্রীদের কাজ আরো গভীরভাবে প্রধানমন্ত্রীর তদারকি করা প্রয়োজন।

কতগুলো বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান আছে যাদের তদারকি করা তুলনামূলকভাবে সহজ। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোর কারা আবর্জনা পরিস্কার না করার জন্য দায়ী তা তদারকি করা মেয়র সাহেব বা তার অধীনস্থ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পক্ষে অনেক সহজ। কেননা তা প্রকাশ্যে দেখা যায়।

www.pathagar.com

রাস্তাগুলোর অবস্থা তদারকি করা মন্ত্রী, সচিব বা মেয়রের পক্ষে খুবই সহজ। কেননা তা চোখেই দেখা যায়। রাস্তায় দিনে কেন আলো জ্বলছে অথবা ম্যানহোলগুলোর ঢাকনা কেন নেই, তা তদারকি করাও সহজ। তা সত্ত্বেও তদারকি হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারকে এবং তার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়কে শক্ত হাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। মন্ত্রী ও সচিবদের শৈথিল্য ঝেড়ে ফেলতে হবে। বাংলাদেশের উন্নতি যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তদারকি জোরদার করা।

ওসমানী উদ্যান কেন অপরাধীদের অভয়ারণ্য এবং আবর্জনার ভাগাড়—সে বিষয়টি আমরা আশা করি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও পুলিশ বিভাগ জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করবেন। আমরা আশা করি স্থানীয় সরকার, মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর ওপর তাদের নযরদারি বৃদ্ধি করবেন, যাতে তারা নাগরিক সুবিধাগুলো বহাল রাখেন। এসব কাজের জন্য যখন লোক আছে, টাকাও ব্যয় হচ্ছে, তখন কাজ কেন হবে না?

দৈনিক অর্থনীতি, ১৯ অক্টোবর ১৯৯৯

www.pathagar.com

মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বস্তি উচ্ছেদ

ঢাকার একটি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, যুগ্মসচিব নিকুঞ্জ বিহারী নাথকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় প্রকাশ্যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বস্তির ছিনতাইকারীদের জড়িত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে পুলিশ কিছু ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করে হত্যাকারীদের শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

এ ঘটনার জের হিসেবে প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন সাতটি বস্তি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বিষয়ে উচ্ছেদ কাজ শুরু করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে।

বস্তি উচ্ছেদ বিষয়টি স্পর্শকাতর সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে সরকার যে ব্যবস্থাই নেন না কেন তার ওপর নানা আপত্তি উঠবে। আমাদের রাজনীতি দ্বারা অসহনীয়ভাবে বিভক্ত সমাজে এটা বেশি হয়ে থাকে। সরকারের পক্ষেই আমাদের দেশে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক জটিল হয়ে থাকে।

কোন বড় শহরেই ব্যাপকভাবে বস্তির অবস্থান মেনে নেওয়া যায় না। বিশ্বের অধিকাংশ বড় শহরে ঢাকার মত বস্তি নেই। এত বস্তি কেবল পাশ্চাত্যের বড় শহরে নেই তাই নয়, এমনকি উপমহাদেশের করাচি, লাহোর, দিল্লিতেও বস্তি সংখ্যা ঢাকার চেয়ে অনেক কম।

সুতরাং দীর্ঘ মেয়াদে ঢাকায় বস্তি রাখা যেতে পারে না। এসব বস্তি তুলে দিতে হবে। বিশেষ করে সরকারি জায়গায় যেসব বস্তি অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে সেসব বস্তি। রাস্তা এবং রেললাইনের পাশের বস্তি পরিবেশকে নষ্ট করে এবং যোগাযোগকে সমস্যাসঙ্কুল করে।

বেসরকারি জমিতে যেসব বস্তি গড়ে উঠেছে, সেগুলোর ব্যাপারেও কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বাড়ির কি ধরনের মান হবে, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের কি ব্যবস্থা থাকতে হবে, রাস্তার ব্যবস্থা কি হবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া দরকার। যদি এসব মানা না হয় তবে বিধি মোতাবেকই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আইন মানতে বাধ্য করতে হবে। সর্বশেষে প্রয়োজনে ঐ সব বস্তিকে ভেঙে দিতে হবে।

www.pathagar.com

তবে জনগণের একটি বিপুল অংশ মনে করে যে, পুনর্বাসনের পূর্ণ ব্যবস্থা না করে বস্তি তুলে দেওয়া সঙ্গত নয়। প্রথমত এভাবে বস্তি গড়ে উঠতে দেওয়াই সঙ্গত হয়নি। সরকারি জমিতে এসব বস্তি গড়ে ওঠাই প্রমাণ করে যে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তারা যদি সরকারি মালিকানাধীন জায়গা-জমির যে সংরক্ষণ দরকার তা করতো, তাহলে এত বস্তি গড়ে উঠতে পারে না। এটা অত্যন্ত জরুরি যে, রেলওয়ে, যোগাযোগ ও ভূমি মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে অবৈধভাবে কোন বস্তি আর গড়ে উঠতে না পারে।

ঢাকার যে কোন বস্তি উচ্ছেদের পূর্বে পুনর্বাসনের একটি পরিকল্পনা নিতে হবে। এ দাবি প্রায় সবার। এটা সবারই জানা যে বস্তি কেন গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে নদীভাঙনে প্রতিবছর প্রায় এক লাখ লোক বাসস্থানচ্যুত হয়। তাদের জন্যে সরকারের একটি নিয়মিত পরিকল্পনা না থাকায় ঐসব লোকের একটি অংশ শহরে এসে বস্তিতে আশ্রয় নেয় বা বস্তি গড়ে তোলে। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকাও শহরে লোক চলে আসার এবং বস্তি গড়ে তোলার কারণ। বস্তি শিকস্তি এলাকার লোকদের নিয়মিত সঠিক পুনর্বাসনের একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সুতরাং, বস্তি নানা কারণে গড়ে উঠেছে। এ পরিস্থিতিতে এদের পুনর্বাসন না করে উৎখাত করা অমানবিক হবে। এদের পুনর্বাসন গ্রামঞ্চলে এবং শহরের আশপাশে করতে হবে। এনজিওদের উচিত এ কাজে সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতা করা। মানবাধিকার গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মানবাধিকারের নামে বস্তি অব্যাহত রাখা, অপরাধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং পরিবেশ ধ্বংস করা কারো নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। বিদেশী দাতা সংস্থা ও সরকারকে এ ব্যাপারে সাহায্য করা উচিত, যাতে ঢাকা শহরের সকল বস্তি তুলে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসন করা যায়।

আশা করি সবাই আমাদের পরামর্শ বিবেচনা করে দেখবেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ২০শে জানুয়ারি ২০০০

www.pathagar.com

ছিন্নমূলদের পুনর্বাসন

ঢাকার কিছু বস্তি উচ্ছেদের পর ছিন্নমূলদের পুনর্বাসনের বিষয়টি নতুন করে একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বস্তি বহাল রাখার পক্ষে বলার মত বেশি কিছু নেই। বস্তিগুলো অধিকাংশই অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে সরকারি জমিতে। এখানে থাকা খাওয়ার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। এখানে অপরাধীরা আস্তানা গাড়ে। এখানেই রয়েছে মাদকের ব্যবসা-কেন্দ্র। এখানে নারী ব্যবসা গড়ে উঠেছে। অনেক নারীকে বাধ্য করে অসামাজিক কাজে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং বস্তি রাখার যুক্তি নেই। বস্তি তুলে দিতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে পরিকল্পনার মাধ্যমে। সরকার ঢাকার যে ক'টি বস্তি কিছুদিন পূর্বে তুলে দিলেন তা ছিল একেবারেই অপরিকল্পিত। হঠাৎ রাগ করে তো সরকার কাজ করতে পারে না। একজন কনস্টেবল মারা গেল বলেই এ কাজে অপরিকল্পিতভাবে সরকারের হাত দেওয়া উচিত হয়নি।

অধিকাংশ বস্তিবাসী নিরপরাধ। তারা কাজের খোঁজে ঢাকা শহরে এসেছে। তারা তো বড় বাড়িতে ভাড়া থাকতে পারে না। তাই তারা ঝুপড়ি তুলেছে বা বস্তিতে ঝুপড়ি ভাড়া করে থাকছে। সমস্যাটি কাজের, সমস্যাটি গৃহসংস্থানের, সমস্যাটি পুনর্বাসনের।

কেবল বস্তিবাসীর নয়, সামগ্রিকভাবে পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। ১৯৭৪-৭৫ সালের দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার পরিবার ঢাকা ও অন্যান্য শহরে পাড়ি জমায়। পরবর্তীতে নদী শিকস্তির কারণে প্রতি বছর অনেক লোক ঢাকা ও অন্যান্য শহরে আসে। প্রত্যেক বছর বাড়িঘর, জমিজমাসহ অনেক গ্রাম ও এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অথচ নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের নিয়মিত পুনর্বাসনের জন্য আমরা কোন ব্যবস্থা গড়ে তুলিনি। তাদেরকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছি।

উপরিউক্ত কারণে দুস্থদের পুনর্বাসন বাংলাদেশে একটি বড় এবং নিয়মিত সমস্যা। বস্তির লোকদের পুনর্বাসন করে বস্তিগুলো ভেঙে ফেলা যায়। অন্যদিকে প্রতি বছর নদীভাঙনের শিকার লোকদের পুনর্বাসন একান্ত জরুরি। অথচ আমাদের কোন সুসংগঠিত পুনর্বাসন বিভাগ নেই।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে দুস্থদের পুনর্বাসনের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের একটি সুসংগঠিত পুনর্বাসন বিভাগ থাকতে হবে। অনেক বিভাগ আছে যাদের এত কাজ নেই বা যাদের জনশক্তি অনেক বেশি। ঐসব বিভাগ থেকে লোকদের 'অতিরিক্ত' ঘোষণা করে নতুন বিভাগটি গঠন এবং শক্তিশালী করা যেতে পারে। সকল প্রধান নদীভাঙন এলাকায় এ বিভাগের ফিল্ড অফিস থাকতে পারে। এ বিভাগের হাতে প্রয়োজনীয় বাজেট থাকা প্রয়োজন। নদীভাঙনের লোকদের এখন সাময়িক আশ্রয় নেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। এজন্য এ বিভাগ নদীভাঙন এলাকায় রিসেপশন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। সেখানে নদীভাঙনের শিকার লোকেরা সাময়িক আশ্রয় নেবে। পরবর্তীতে সরকার তার 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসন করবে। তাদের 'আত্মকর্মসংস্থান'-এর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সরকার যদি এ বিভাগ স্থাপন করতে না চায় তাহলে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে এ কাজ করার উদ্যোগ নিতে পারে। এজন্য অবশ্য সেভাবেই জেলা প্রশাসকদের অফিসকে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করতে হবে।

পুনর্বাসনে সরকার সবসময়ই এনজিওদের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে পারেন। তবে এনজিওদের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা রাজনীতিতে যাবেন না। এ জন্য রাজনৈতিক দল রয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাসমূহ আছে। আপনাদের রাজনীতিতে জড়ানো অধিকাংশ জনগণ পছন্দ করে না। ঢাকার বস্তি প্রসঙ্গে সরকারি ব্যবস্থা নেওয়ার পর আপনারা এমন অনেক কিছু করেছেন যাকে জনগণ রাজনীতি মনে করে।

সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, দুস্থদের পুনর্বাসনকে একটি সামগ্রিক ও নিয়মিত বিষয় হিসেবে দেখতে হবে। আমরা আশা করি, সরকার আমাদের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করে দেখবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৭ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

ছিনতাই প্রতিরোধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা প্রয়োজন

এবারের ঈদের ছুটির সময়ের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব নিকুঞ্জ বিহারী নাথের ছিনতাইকারীদের হাতে নিহত হওয়া। তিনি ঈদের ছুটিতে চট্টগ্রাম যান। সেখানে স্ত্রী-কন্যাকে রেখে ট্রেনযোগে ঢাকায় কমলাপুর আসেন। সেখান থেকে রিকশায় করে আজিমপুরে বাসায় যাওয়ার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে নিতহ হন। তিনি তার হাতের শেষ ১০০ টাকা দিয়েও ছিনতাইকারীদের নিকট থেকে রক্ষা পাননি।

এ ঘটনা গোটা জাতিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যেই অপরাধীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা অপেক্ষায় থাকবো পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেন।

কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে গোটা জাতির, আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের এবং সরকারের ব্যাপক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। এটা স্বীকার না করে পারা যায় না যে, ঢাকা শহর ছিনতাইয়ের শহরে পরিণত হয়েছে। কেস রেকর্ড করা হোক বা না হোক দৈনিক অসংখ্য ছিনতাই ঢাকায় হচ্ছে। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, অধিকাংশ ছিনতাইয়ের ঘটনা কেউ রিপোর্ট করে না। কেননা, জনগণের আস্থা পুলিশের ওপর নেই। তারা বরং রিপোর্ট করলে আরো হয়রানির শিকার হতে পারে বলে মনে করেন। অসংখ্য ছিনতাই গ্যাঙ বা দল (Sindicate) গড়ে উঠেছে। জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মানুষের নিরাপত্তা প্রায় শূন্যের কোঠায়। ছিনতাইকারীরা ধরা পড়ার আশঙ্কা প্রায় করে না বলেই মনে হয়।

এ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে জাতিকে এবং ঢাকা শহরকে উদ্ধার করতে হলে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিতে হবে। সাধারণ পদক্ষেপে বিশেষ কিছু হবে না। পুলিশ টহল ব্যবস্থা একেবারেই অপর্যাপ্ত। যেসব পুলিশকে টহল দিতে আমরা রাস্তায় দেখি তারা খুব প্রশিক্ষিত বলে মনে হয় না। তাদের চলাফেরায়ও কোন স্মার্টনেস নেই। সব ঢিলেঢালা ভাব। কিছুতেই তারা গা করেন বলে মনে হয় না। কোন কিছুতেই তারা জড়াতে বা দায়িত্ব নিতে চান না।

www.pathagar.com

পুলিশ ট্রেনিংয়ের ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা আনতে হবে। তাদেরকে তরিৎকর্মা করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের টহল হতে হবে দৃষ্টি আকর্ষণী; যাতে অপরাধীরা তাদেরকে সমীহ করতে বাধ্য হয়।

অবিলম্বে যেটা করা দরকার তা হলো পুলিশের টহল বাড়ানো। বিশেষ করে ভোরবেলায় ও রাতে। তাদের ছিনতাই রোধ সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। পুলিশের গোয়েন্দা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা দরকার। অপরাধী চক্রসমূহকে ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

অপরাধীদের একটি অংশকে কাজ দিয়ে অপরাধ থেকে বের করে আনা যায় কিনা এ ব্যাপারেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় উদ্যোগ নিতে পারে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অপরাধের এ বিস্তৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে সম্পর্কে বিদেশী কিছু পুলিশ কর্তৃপক্ষের পরামর্শ নিতে পারে।

মাদকের সমস্যাটিকেও একই সাথে দেখতে হবে। মাদকের নেশাই ছিনতাইয়ের বড় কারণ। দেশ থেকে মাদক সেবন বন্ধ করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে এবং যারা মাদকাসক্ত তাদের চিকিৎসার ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। এ সমস্যাটি ছিনতাইয়ের গোড়ায় রয়েছে। এটাকে অবহেলা করা যাবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এ ঘটনাটি ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের এলাকাকে নিরাপদ করার জন্য ব্যবস্থা নেবেন, এটাই আমাদের অনুরোধ।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৩ই জানুয়ারি ২০০০

www.pathagar.com

স্যাটেলাইট টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ

এপি পরিবেশিত সংবাদে দেখা যায় যে, সিঙ্গাপুরের শতকরা ৮৫ জন মানুষ স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ওপর সেন্সরশিপ আরোপের পক্ষে মত দিয়েছেন। তারা মনে করেন যে, সেন্সরশিপ আরোপ হলে তা শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ ও নৈতিক চরিত্র বিকাশের ওপর একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হবে। তবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে বলে তারা মত দিয়েছেন। শতকরা ৮০ জন পর্ণগ্রাফি ও মারদাঙ্গা ছবির ওপর কড়াকড়ি আরোপের পক্ষে। অবশ্য রাজনৈতিক মতামতের ওপর সেন্সরশিপ ক্ষতিকর বলে তারা বলেছেন।

অন্যদিকে ইন্টারনেটের ওয়েবসাইটে পর্ণ ছবির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিত বলে শতকরা ৯৭ জন মতামত প্রকাশ করেছেন।

উপরিউক্ত জরিপ বাংলাদেশের পলিসি নির্ধারণের জন্য সহায়ক বলে আমরা মনে করি। সমস্যাটি আরো বড় হওয়ার পূর্বেই আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

বাংলাদেশে ক্যাবল টিভির যাত্রা বেশি দিনের নয়। ক্যাবলের ব্যবহার ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। ঢাকা ও প্রধান প্রধান শহরে এর ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি ক্রমে ক্রমে সকল শহর, গ্রামে যাবে।

এ প্রেক্ষিতে বিবেচ্য বিষয়, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা কি পেয়েছি। একদিকে রয়েছে বিবিসি, সিএনএন, ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক ধরনের চ্যানেলসমূহ; যেগুলো খুবই ভাল চ্যানেল। অন্যদিকে রয়েছে বিপুলসংখ্যক নোংরা চ্যানেল, যেগুলো আমাদের শিশু-কিশোরদের মন ও চরিত্রকে প্রভাবিত করছে। এগুলো তাদের নৈতিকতাকে ধ্বংস করছে। এগুলো মাদক বা ড্রাগের চেয়ে কোন অংশে কম ক্ষতিকর নয়। এসবের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা অবশ্য কর্তব্য এবং তা করা উচিত, ক্যাবল টিভি আরো ছড়িয়ে যাবার আগে। গোটা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর পদক্ষেপ নিলে কি কল্যাণ হবে?

ক্যাবল টিভি এখনো নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। ক্যাবল অপরাটেরদের আইনানুযায়ী নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে যে, কোন্ কোন্

www.pathagar.com

চ্যানেলের লাইন তারা জনগণকে দিতে পারবে, কোন্‌টি পারবে না। এজন্য যদি আইন বা বিধি না থাকে তাহলে সে শূন্যতা পূরণ করা দরকার। এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

আমরা দেশের সামগ্রিক স্বার্থে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদন করি। সরকারকেও এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। তবে কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক মতামত নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ যেন নেওয়া না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

গেস্ট হাউজে অবৈধ কাজকারবার

সম্প্রতি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় রাজধানীর গেস্ট হাউজসমূহে অবৈধ কাজকারবারের উপর বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রতিবেদনে দেখা যায় রাজধানীর বনানী, গুলশান, বারিধারাসহ অভিজাত এলাকার গেস্ট হাউজসমূহে নারী, মাদক ব্যবসা ও অন্যান্য অবৈধ কাজকারবার চলছে। অনুমোদনহীন এসব গেস্ট হাউজের সংখ্যা প্রায় দু'শতাধিক। এদের কোন বৈধ লাইসেন্স নেই।

এসব গেস্ট হাউজে পার্টির নামে চলছে দেহ ও মাদক ব্যবসা। অপরাধী চক্র এসব গেস্ট হাউজের মাধ্যমে পুলিশ, কাস্টমস, প্রশাসকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চতর ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করছে। মদ ও নারীর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের তারা কিনে নিচ্ছে এবং তাদের অপরাধের কাজে ব্যবহার করছে। এসব কাজে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের নায়িকাদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে।

উপরিউক্ত তথ্য রীতিমত আতঙ্কজনক। পুলিশের নাকের ডগায় কিভাবে এতগুলো অবৈধ গেস্ট হাউজ গড়ে উঠতে এবং চলতে পারে? মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং কাস্টমস বিভাগই বা এ ব্যাপারে কি করছিল? এটা সুস্পষ্ট যে, এসব গেস্ট হাউজে অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য রাখা ও ব্যবহার করা হতো। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকায় বেশ বড় ধরনের নেটওয়ার্ক আছে। তাহলে তারা কেন এ সমস্যা এত বড় হওয়ার পূর্বে এদিকে নজর দেননি? তাদের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য ফান্ডও আছে। চোরাচালানকৃত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কাস্টমসেরও দায়িত্ব আছে। তারাই বা কি করল?

এটা সুস্পষ্ট যে, পুলিশ বিভাগ আইন প্রয়োগে তেমন কোন নজর দিচ্ছে না। তারা বেশি ব্যস্ত রাজনৈতিক বিষয়সমূহে; সভা ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণে। এরই ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে অপরাধ মহীরুহ হয়ে দেখা দিয়েছে। অপরাধ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ভাবতে হবে পুলিশের প্রধান কাজ কি? আইন প্রয়োগ, না রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। আমরা সরকারের নিকট বিনীতভাবে আরজ করি, যেন অন্তত অর্ধেক পুলিশ ফোর্সকে কেবল অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও অপরাধ দমনে ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে গেস্ট হাউজ সংক্রান্ত বিভিন্ন কেলেংকারি প্রকাশিত হয়েছে এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ যৌথভাবে অভিযান শুরু করেছে। বিলম্বে হলেও তাদের এ অভিযানের জন্য আমরা তাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তবে এতদিন তারা কেন ব্যবস্থা নেননি তা জাতির সামনে তাদের ব্যাখ্যা করা উচিত।

গেস্ট হাউজের ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে যে, আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে গভীর সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বে সিটি কর্পোরেশন (যারা ট্রেড লাইসেন্স দেয়), মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (যারা বার লাইসেন্স দেওয়ার অধিকারী এবং মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ যাদের প্রধান দায়িত্ব) এবং পুলিশের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ছিল না। অপরাধ দমনে ইন্টার এজেন্সি সমন্বয় একান্ত জরুরি। এ ব্যাপারে বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে যেসব সমন্বয় আছে তা রুটিন ধরনের। এতে কাজ হয় না। এসব সমন্বয়কে যথার্থ এবং গভীরতর করার জন্য আমরা সরকারের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রথম উদ্যোগ নিতে পারে।

দৈনিক অর্থনীতি, ১ নভেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

ঢাকায় ছিনতাই রোধ

ঢাকায় ছিনতাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন অসংখ্য ছিনতাই হচ্ছে। যদি একটি সার্ভে করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, প্রতি ১০ জনের মধ্যে ২/৩ জন কোন না কোন সময়ে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছে। অবশ্য ছিনতাইয়ের শতকরা ১ ভাগ ঘটনাও বোধ হয় পুলিশে রিপোর্ট করা হয় না। কেননা পুলিশের ওপর জনগণের আস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। আর কোন ফল হবে বলে জনগণ মনে করে না। অন্যদিকে হয়রানিরও আশঙ্কা জনগণ করে।

ছিনতাইকালে অনেক লোক আহত হয়। কেউ কেউ মারাও যায়। গত ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে একজন পুলিশ সার্জেন্ট আহত হন এবং পরবর্তীতে মারা যান। এটিকে পুলিশের একটি ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা গ্রহণের ঘটনা বলে উল্লেখ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট পুলিশ সার্জেন্টের সাহস এবং কর্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করতে হয়। সরকারের কর্তব্য তার পরিবারের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা, যাতে অন্যান্য অফিসাররাও দায়িত্ব পালনে সাহসিকতার সাথে ভূমিকা পালন করতে পারে।

কিন্তু মূল প্রশ্ন হচ্ছে, ছিনতাই এত ব্যাপক কি করে হতে পারলো? এতে সন্দেহ নেই যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সময়মত ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলেই ছিনতাই এত ব্যাপক হতে পেরেছে। ছিনতাই একদিনে বাড়েনি। প্রতি বছর এটি বাড়ছে। এটিকে প্রতিহত করার কোন পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা অবহিত নই।

আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করি যে, বিভিন্ন এলাকায় যেসব পুলিশ টহল দেন তারা খুব কর্মতৎপর নন। তাদের গল্প-গুজবই বেশি করতে দেখা যায়। তাদের চলাচলও খুব ভারিক্কি ধরনের, এরা গল্প-গুজব করেই বেশি সময় কাটায়। পুলিশদের ট্রেনিং-এর অভাব বা ট্রেনিং-এর মানের অভাব রয়েছে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা নিম্নস্তরের পুলিশদের যথাযোগ্য ব্রিফিং করে না। ফলে পুলিশের মধ্যে কোন চৌকস ভাব লক্ষ্য করা যায় না। এদের দায়িত্ব কি তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিলে কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধি পেতো। পুলিশদের ওপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকিও যথাযথ নয় বলে মনে হয়। টহল এলাকার যে কোন ছিনতাই বা

www.pathagar.com

ইত্যাকার অপরাধের জন্য তাদের শক্ত জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা উচিত; কিন্তু তা নেই, যার ফলে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হচ্ছে না।

দেশে মাদকের প্রচলনের ফলেও ছিনতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। যেসব যুবক মাদকাসক্ত তারা তাদের পরিবার থেকে অর্থ না পেলে ছিনতাইয়ের আশ্রয় নিয়ে থাকে। সুতরাং, ছিনতাই পরিস্থিতির উন্নতি করার জন্য মাদক সমস্যার দিকেও নজর দিতে হবে, বিশেষ করে মাদক সমস্যা যাতে আর বৃদ্ধি না পেতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। একই সাথে মাদকাসক্ত যুবক ও অন্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ব্যাপক করা দরকার, যাতে তারা এ আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারে। এটা যদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় করা যায় তাহলে দেশের অপরাধ পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হতে পারে।

অবিলম্বে ছিনতাই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে; ক্রমাগতভাবে অন্তত কয়েক মাস ঢাকার যেসব এলাকায় ছিনতাই অধিক হয়, ঐসব এলাকায় সাদা পোশাকে পুলিশের টহল বৃদ্ধি করা। এসব টহল বিভিন্ন শিফ্‌টে সকাল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত হওয়ার প্রয়োজন। ছিনতাইকারীদের দ্রুত কোর্টে সোপর্দ করার ব্যবস্থা করা দরকার। এসব ক্ষেত্রে সামারি বিচারের ব্যবস্থাও করা যায়।

ছিনতাইয়ের সমস্যা বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় শহরে আছে। এ সমস্যা আমাদের দেশে ছিল না। বিগত ১৫/২০ বছরে এ সমস্যা ব্যাপক হয়েছে। আমরা যদি এখনো কঠোর ব্যবস্থা নিই তাহলে এ সমস্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে মনে করি। এ ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশা করি।

দৈনিক অর্থনীতি, ০২ নভেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

দোকানের তৈরি খাবারের মান

দৈনিক অর্থনীতিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে যে বিপুল পরিমাণ তৈরি খাবার বিক্রি হচ্ছে তার মান ও গুণাগুণ যাচাইয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। ঢাকাতে সিটি কর্পোরেশনও তা যাচাইয়ের কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়নি। কর্মব্যস্ত সাধারণ মানুষ খাবারের জন্য হোটেল ও ফাস্টফুডের দোকান ছাড়াও বেকারি ফুড, স্ন্যাক্স ও বিভিন্ন ধরনের পানীয়ের উপর নির্ভর করে থাকে। এছাড়া রাস্তায়ও নানা ধরনের খাবার বিক্রি হচ্ছে, যাদের মান ও বিশুদ্ধতা নেই বললেই চলে। এসব থেকে মানুষ নানা ধরনের রোগে ক্রান্ত হচ্ছে। বোতলের পানীয়ের মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

খবরটি রীতিমত আতংকের। এসব খাবার আমাদের জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এটা অসম্ভব নয় যে, যে কোন সময় এর ফলে যে কোন স্থানে দূষিত খাদ্যের কারণে মানুষ বিষক্রিয়ার শিকার হতে পারে এবং তা অনেক মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এর ফলে এমনকি মহামারীও দেখা দিতে পারে। এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এখন পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটেনি। বহু পূর্বেই এ সম্পর্কে আমাদের পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যা আমরা পারিনি। বিষয়টি এতই জরুরি যে, এটি আরো ব্যাপক হওয়ার পূর্বেই অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।

সর্বত্র যেসব পানি বাজারজাত করা হচ্ছে তার মান নিশ্চিত করতে হবে। এসব পানির ব্যবহার বাড়ছে। এতে দূষণ গোটা জাতির স্বাস্থ্যকে বিপদাপন্ন করতে পারে। শিল্প মন্ত্রণালয় ও পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগকে এ ব্যাপারে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতটা কাজ করছে তা আমরা জানি না। মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম গুরুত্বের দাবি রাখে খাদ্যদ্রব্যের এবং ওষুধের। আমাদের পণ্যমান নিশ্চিত করার বিষয়টি কাজ করছে কিনা তা উচ্চপর্যায়ে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একত্রে বসা উচিত এবং সামগ্রিক বিষয়টি বিবেচিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে খাদ্য, পানীয় ও রফতানি পণ্যের মান। মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগকে

www.pathagar.com

অবশ্যই উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে। পরিদর্শন ব্যবস্থা ও ল্যাবরেটরি সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। যোগ্য জনশক্তি থাকতে হবে।

বিভিন্ন কারখানায় যে আচার, জেম, জেলি ইত্যাদি তৈরি হয় এসব ব্যাপারেও আমাদের একই কথা। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এসব তৈরি ও রক্ষিত না হলে একই সমস্যা দেখা দিতে পারে। হোটেল ও ফাস্টফুডের দোকানের খাবার পরিদর্শনের ব্যবস্থা উন্নত করা নেহাত জরুরি। এক্ষেত্রে পরিদর্শনের নামে কেবল দুর্নীতিই চলছে বলে জানা যায়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে আশা করি। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় প্রত্যেক পৌরসভাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করতে পারে এবং নির্দেশ দিতে পারে যে, হোটেলের খাবারের মান নিশ্চিত করার দিকে প্রত্যেক পৌরসভাকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। কেননা এর সাথে জাতির স্বাস্থ্যের সম্পর্ক। রাস্তায় যাতে না ঢাকা অবস্থায় অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বিক্রি না হতে পারে, এ ব্যাপারেও পৌরসভাগুলোকে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা জানি না যে, এ ব্যাপারে সরকারের কোন পলিসি আছে কিনা। যদি না থেকে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে পলিসি থাকা প্রয়োজন।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৬ অক্টোবর ১৯৯৯

www.pathagar.com

জনসংহতি সমিতির কংগ্রেস

কয়েকদিন পূর্বে জনসংহতি সমিতির কংগ্রেস হয়ে গেল। তারা একটি স্থানীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে ভবিষ্যতে ভূমিকা পালন করবে। তারা তাদের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে শান্তিপূর্ণ দল হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এটি তাদের একটি যথার্থ সিদ্ধান্ত। তবে তাদের কেবল একটি জাতি-গোষ্ঠীর দল হিসেবে থাকা উচিত নয়। তাদেরকে বসবাসকারী স্থানীয় বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গিও বুঝতে হবে এবং তাদের সত্যিকার দাবি-দাওয়াকে মেনে নিতে হবে। তাদের এটাও বুঝতে হবে যে, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ব্রিটিশ সময়ের পরিস্থিতি এক নয়। এটাও তাদের বোঝা প্রয়োজন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে বসবাসকারী সকলেই এক সময় বাইরে থেকেই এসেছিল, আগে বা পরে। সে অর্থে সবাই এক এবং সবার স্বার্থ দেখার প্রয়োজন আছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, কিছুদিন পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা ও বাবুছড়া এলাকায় বেশ কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। কয়েকজন নিহত হয়েছে, অনেকে আহত হয়েছে, অনেক বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এসবই অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বাংলাদেশের কোন কল্যাণকামী ব্যক্তি এসব সমর্থন করতে পারে না। আমরা জানি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিচুক্তির সমর্থক এবং অসমর্থক রয়েছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটা হতেই পারে। বিশ্বে এমন কোন চুক্তি হয় না, যার সকলে সমর্থক হয়। সাধারণত চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে লোক থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যে চুক্তি হয়েছে তাতে বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন স্বাক্ষর করেছে। এটি একটি বৈধ এবং আইনসম্মত চুক্তি। এটি কার্যকরী করা চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের দায়িত্ব। বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের। আমরা আশা করি, উভয় পক্ষ তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবে।

শান্তিচুক্তির পর বর্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন এসব হত্যাকাণ্ড, সংঘাত এবং অন্যান্য

www.pathagar.com

ধ্বংসাত্মক কাজ হলো, তার তদন্ত হওয়া দরকার। কারা এসব করলো, কারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করছে, তাদের চিহ্নিত করা দরকার। এজন্য সরকার একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বহাল রাখা অবশ্যই একটি জটিল কাজ। এ এলাকায় বিগত দু'যুগ ধরে অশান্তি বিরাজ করছিল। এখানে জাতি-গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে পুরানো ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। এগুলো দূর করতে সময় লাগবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে এবং বুদ্ধিজীবীদেরকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। এসব পুরানো ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে হবে।

এখন সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে এলাকায় শান্তি রক্ষা। এটি সেনাবাহিনী এতদিন করছিল। তাদেরকে বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ এবং আনসার সাহায্য করছিল। এ দায়িত্ব এখনো সেনাবাহিনীকে পালন করতে হবে। নিকট অতীতের প্রেক্ষাপটে দেখা হলে এ দায়িত্ব সেনাবাহিনী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এখন পালন করা সম্ভব হবে না। কেউ কেউ সেনাবাহিনীকে কোন কোন এলাকা থেকে প্রত্যাহারের দাবি করছেন। এ দাবি মানা যায় না। চট্টগ্রামের জটিল পরিস্থিতিতে কোন অশান্তিপূর্ণ এলাকা থেকে সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সরকারকে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব স্থানে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর লোক বাস করে সেখানে শান্তির জন্য সেনাবাহিনীকে থাকতে হবে। এ ব্যাপারে কোন গোষ্ঠীর একতরফা দাবি যেমন সরকার গ্রহণ করতে পারে না, তেমনিভাবে পাহাড়ি বাঙালি নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের আবেদন, সকল অবস্থাতেই আপনারা শান্তি রক্ষা করুন।

দৈনিক অর্থনীতি, ০৯ নভেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

এগার জন উপাচার্যের যুক্ত বিবৃতি

কয়েকদিন পূর্বে বাংলাদেশে এগারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের একটি যুক্ত বিবৃতি বের হয়েছে। তাতে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। যুক্ত বিবৃতিতে কথায় কথায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার দুর্ভোগ না বাড়ানোর জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে। অযৌক্তিক অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অচল করে দেওয়ার চেষ্টায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের এ যুক্ত বিবৃতি সময়োচিত ও যথার্থ। আমাদের শিক্ষাঙ্গন সমস্যা কি জটিল আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এ যুক্ত বিবৃতি তার একটি প্রকাশ। মূলত আমাদের শিক্ষা প্রশাসনে খুবই খারাপ অবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষাঙ্গনে চলছে সন্ত্রাস, অনিয়ম ও অরাজকতা। ছাত্রদের একটি অংশ কোন নিয়ম মানছে না। তারা আইনকে হাতে তুলে নিচ্ছে। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত এবং হানাহানিতে ব্যস্ত। ছাত্রদের একটি অংশ চাঁদাবাজিতেও লিপ্ত। তাদের অত্যাচারে কন্ট্রাকটররা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কাজ করতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। উন্নয়ন কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এং বিলম্বিত হয়। এর ফলে সকল ছাত্রেরই ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং তারা সকলেই ভোগান্তির শিকার হয়।

ইতোমধ্যে যে দু'টি ঘটনা ঘটেছে তাও জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ৩০ সেপ্টেম্বরের পত্রিকায় দেখা যায় যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় বন্ধ করে দিতে হয়েছে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (সরকার নয়) কিছুদিন পূর্বে ছাত্রদের ফি বৃদ্ধি করেছিল। এর বিরুদ্ধে শুরু হয় আন্দোলন, অনশন ধর্মঘট, রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি। সিন্ডিকেট ফি পুনরায় কিছুটা হ্রাসও করে। তারপরও ছাত্ররা সন্তুষ্ট হয়নি। আন্দোলন অব্যাহত রাখে এবং শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। এর ফলে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটাই চলছে বাংলাদেশে। ছাত্রদলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার যথাযথ উদ্যোগ তাদের রাজনৈতিক দলগুলো নিচ্ছে না। একক বা যৌথ উদ্যোগ নেই। দেশের সব পণ্য ও সেবার দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক অর্থনীতিতে এটাই হয়ে থাকে। সবকিছুর দাম বাড়বে, কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রে বাড়বে না এটা অবাস্তব। তাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর ফি বৃদ্ধির

www.pathagar.com

প্রচেষ্টাকে আমরা অন্যায় বলতে পারি না। তবে হতে পারে কিছুটা বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে সিন্ডিকেট ফি কমিয়েছেও কিছুটা। এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের উচিত ছাত্রদেরকে বোঝানো। কোন অবস্থাতে অন্যায় সমর্থন না দেওয়া।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটি ঘটনাও জনগণকে দুঃখিত করছে। কিছু ছাত্র আইন হাতে নিয়ে কিছু নামাযী ছেলেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অন্য একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মী সন্দেহে হল থেকে মারপিট করে বের করে দিয়েছে। এভাবে আইন হাতে তুলে নেওয়া এবং ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব করা কোন বিবেকবান মানুষ সমর্থন করতে পারে না। আমরা আশা করি, এ ঘটনা আর ঘটবে না এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা উপাচার্যদের বিবৃতির জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি, তারা রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে সকল প্রশাসনিক শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি ও ছাত্র শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়সমূহে নিরপেক্ষভাবে সুবিচারের নীতিকে উন্নত রাখবেন।

দৈনিক অর্থনীতি, ০৩ অক্টোবর ১৯৯৯

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা

বিগত কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশে ধর্মীয় সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। দেওয়ানবাগের পীর সাহেব এবং চরমোনাইয়ের পীর সাহেবের অনুসারীদের মধ্যে সংঘাতে কয়েকজন মারাও গেছেন। দেওয়ানবাগের পীর সাহেবের বিরুদ্ধে ইসলামের শিক্ষার বিপরীত বক্তব্য রাখার এবং লেখার অভিযোগ করেছেন অনেকেই।

এ প্রেক্ষিতে একজন পীর সাহেব অন্য পীর সাহেবের সম্মেলন নস্যাৎ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর পূর্বে একই স্থানে দু'পক্ষই সভা ডাকেন। প্রশাসন দু'টি সভা-ই বন্ধ করে দেয় এবং ১৪৪ ধারা জারি করে। এভাবে তখনকার মত পরিস্থিতি রক্ষা পায়। সম্মেলন নস্যাৎ করার ঘোষণার পর একপক্ষ অন্যপক্ষের বিশ্ব সূফী সম্মেলন বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং জনগণকে সমবেত করে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও সংঘর্ষ হয় এবং কয়েক জন মারা যায়।

অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক দলও একে অন্যকে 'কাফির' বলেছে; যেটা দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দল থেকে কেউ আশা করে না।

এ প্রেক্ষিতে বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমরা যতটুকু জানি ইসলাম কোন অসহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করে না। কুরআন মুসলিম জাতিকে মধ্যপন্থি জাতি বলে উল্লেখ করেছে। ইসলাম সবাইকে তার নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে। ইসলাম কাউকে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার অধিকার দেয়নি।

ইসলামের ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু মতবিরোধ সব সময় ছিল। তা থাকতেই পারে। এসব মতবিরোধ দূর করতে হবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। প্রত্যেকে তাদের মতামত শালীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন। প্রচার করতে পারেন। জনগণ তার ফলে প্রত্যেকের যুক্তি বুঝতে পারবেন এবং তারা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। জোর করে একটি গণতান্ত্রিক দেশে কিছু করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের মানবাধিকারকে সম্মান করতে হবে। যুক্তিপূর্ণ প্রচারের মাধ্যমেই প্রত্যেককে তার মতামত তুলে ধরতে হবে। এখানে বাড়াবাড়ি কোন সরকার

www.pathagar.com

এবং বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মেনে নিতে পারে না। সরকারের পক্ষে কোন সন্ত্রাস ও অসহিষ্ণুতা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এটা সকল দেশের সকল সরকারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আমরা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে আবেদন করি যে, আপনারা ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সহিষ্ণুতার পরিচয় দিন। আপনারা কেউ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না। আমরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছেও আবেদন করি, আপনারা একে অপরকে 'কাফির' বা অন্য কোন অশালীন পরিচয়ে আখ্যায়িত করবেন না। এরকম করা জাতির কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।

দৈনিক অর্থনীতি, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

অকল্যান্ডে এপেক সম্মেলন

নিউজিল্যান্ডের রাজধানী অকল্যান্ডে ১৩ সেপ্টেম্বর এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সংস্থা (এপেক)-এর শীর্ষ সম্মেলন ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনসহ অনেক নেতা এতে যোগদান করেন। এপেক-এর সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ২১। এদের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি দেশ।

এ সংস্থাটি যদিও মাত্র কয়েক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তথাপি এর সম্ভাবনা অনেক। বিশেষ করে এর ফলে এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান সম্পর্ক ছিল ইউরোপের সঙ্গে অর্থাৎ আটলান্টিকের দু'তীরের দেশসমসূহের মধ্যে। কিন্তু এ নতুন সংস্থার মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরের দু'তীরের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহযোগিতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এ সংস্থার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

এপেক সম্মেলন প্রধানত অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা হলেও সম্মেলনে দ্বিপক্ষীয় গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সম্মেলনে চীনের নেতা জিয়াং জেমিন ও জাপানি প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চীনা প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে বেইজিং কখনোই পুনরায় উত্তর কোরিয়ার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাকে মেনে নেবে না। এটা সুখবর। প্রকৃতপক্ষে উত্তর কোরিয়ার এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার কোন সত্যিকার প্রয়োজন নেই। যদি নিরাপত্তায় কোন সংকট দেখা দেয় তবে বন্ধুরাষ্ট্র চীন তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

সম্মেলনে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মধ্যেও আলোচনা হয়েছে। কসোভো সংকটের সময় বেলগ্রেডে চীনা দূতাবাসে বোমা পড়ার কারণে দু'দেশের মধ্যে কয়েকবার আলোচনা হয়। এবারে এপেক সম্মেলনে দুই প্রেসিডেন্টের আলোচনার ফলে তাদের সম্পর্কের উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। এপেক

www.pathagar.com

সম্মেলনে পূর্ব তিমুর পরিস্থিতিও আলোচিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুরে আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েনে সম্মত হয়েছে। এপেক সম্মেলনকে মোটামুটিভাবে সফল বলা যায়। তবে কোন কোন দেশ সাবধান করে দিয়েছে যে, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর মধ্যে গবেষণা এবং উদ্ভাবনের ব্যবধান ব্যাপক এবং তা বাড়ছে। এ ব্যবধান এত ব্যাপক হতে দেওয়া যায় না, যাতে বিশ্ব দু'টি বিরোধী অর্থনৈতিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এসব সতর্কবাণীর দিকে এপেকের উন্নততর দেশগুলোকে নজর দিতে হবে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিগত ৫০ বছরে উন্নত বিশ্ব অনুন্নত বিশ্বের দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের সমস্যা সমাধানে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে কমেনি। দারিদ্র্য উন্নয়নের যে কর্মকৌশল উন্নত দেশগুলো হতে দেওয়া হয়েছিল তাও পুরাপুরি সাফল্য লাভ করেনি। এ সকল বিষয় কেবল এপেককে নয়, জি-৮ ও অন্যান্য বিশ্ব সংস্থাকে ভেবে দেখতে হবে।

সম্মেলনে বিশ্ব বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য নানা উদ্যোগ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করি যে, এসব উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে বিশেষ করে আমেরিকান ও এশিয়ান রাষ্ট্রসমূহ উপকৃত হবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

তুরস্কে কুর্দি পরিস্থিতিতে নতুন মোড়

তুরস্কের কুর্দি আন্দোলনের নেতা আবদুল্লাহ ওজালানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্কের কুর্দি দল পিকেকে সশস্ত্র আন্দোলন পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাদের সশস্ত্র গেরিলা বাহিনীকে তুরস্কের সীমান্তের বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

আবদুল্লাহ ওজালানের গ্রেফতারের পর থেকেই তুরস্কের কুর্দি পরিস্থিতিতে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আবদুল্লাহ ওজালান তুর্কি আদালতে তার দণ্ড ঘোষণার পূর্বেই এক বিবৃতিতে কুর্দিদের অধিকার প্রদান সাপেক্ষে তুরস্কে কুর্দি সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপরও আদালত ওজালানের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ওজালান আপিল করেছেন। এর মধ্যে ওজালান তার আইনজীবীর মাধ্যমে এক বিবৃতি পাঠান; তাতে তিনি পিকেকে দলকে সশস্ত্র আন্দোলন পরিহার করে তুরস্ক পরিত্যাগ করার অনুরোধ করেন এবং ভবিষ্যতে কুর্দি অধিকার রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার আবেদন করেন। পিকেকে ইতোমধ্যেই ওজালানের আবেদন মেনে নিয়েছে। কিন্তু তুরস্ক সরকার এসবের প্রতি কোন সাড়া দিচ্ছেন না বরং এগুলোকে আবদুল্লাহ ওজালানের জীবন বাঁচাবার কৌশল বলে মনে করছেন। তুরস্ক সরকার যাই মনে করুন না কেন, আমরা মনে করি, ওজালানের আবেদন এবং পিকেকের পদক্ষেপ তুরস্কে কুর্দি সমস্যা সমাধানের একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একে প্রত্যাখ্যান করা অত্যন্ত দুঃখজনক হবে।

তুরস্কে কুর্দি সশস্ত্র আন্দোলনের ফলে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক নিহত হয়েছে। নিহতদের অধিকাংশই কুর্দি, যারা তুরস্ক সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নিহত হয়। অনেক তুর্কিও নিহত হয়েছে। এছাড়া তিন হাজার গ্রাম বিধ্বস্ত হয়েছে, ত্রিশ লক্ষেরও অধিক লোক দেশের মধ্যেই উদ্বাস্তু হয়েছে। এ পরিস্থিতি চলতে পারে না। এর সমাধান প্রয়োজন। যারা মনে করেন কেবল অস্ত্রের জোরে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব তারা ভুলের মধ্যে আছেন। কুর্দিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অগ্রাহ্য করে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তুরস্কে কুর্দিদের অধিকারও নানাভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। কুর্দি ভাষার যথাযথ মর্যাদা

www.pathagar.com

দেওয়ার যে দাবি কুর্দিদের রয়েছে, তার প্রতি কোন মনোযোগ দেওয়া হয়নি। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিও রয়েছে। এসব দাবির প্রতি নজর দিতে হবে।

একথা সত্য যে তুরস্কে গণতন্ত্রের বিকাশ না হওয়ার কারণেই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সে দেশে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে নাজিমুদ্দিন আরবাকানকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়। পরবর্তীতে তাকে এবং আরো অনেকের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতি সাধারণ কারণে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপে দেশের সবচেয়ে বড় দল রাফাহ্ পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। এসবই গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য এবং এসবের পরিবর্তন প্রয়োজন।

ওজালানকে ফাঁসি দিয়ে তুরস্কের কোন লাভ হবে না বরং তুরস্কে কুর্দি-তুর্কি সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হবে। সে ভয়াবহ পরিস্থিতির শেষ কোথায় হবে, তা বলা মুশকিল। কিন্তু তা যে তুরস্কের জন্য মঙ্গলজনক হবে না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ওজালানের আবেদন গ্রহণ করে পিকেকের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমরা তুরস্ক সরকারের প্রতি আবেদন জানাই। তুরস্কে যাতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, মানবাধিকার এবং সকলের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়, সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অনুরোধ করি।

দৈনিক অর্থনীতি, ৯ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়ার নির্বাচনী ফলাফল

ইন্দোনেশিয়ার নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে দু'মাস পূর্বে; কিন্তু তাদের পূর্ণ ফলাফল প্রকাশ করতে সময় লেগেছে দু'মাস। এ বিলম্ব একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার, যা পৃথিবীতে এর পূর্বে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচন সঠিক হয়নি বা নির্বাচনী ফলাফলে রদবদল করা হয়েছে এ ব্যাপারে কোন ব্যাপক অভিযোগ হয়নি। এটাও ইন্দোনেশীয় সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য।

নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, সাবেক রাষ্ট্রপতি সুকর্নর কন্যা মাদাম মেঘবতী সুকর্নপুত্রীর দল পেয়েছে আনুমানিক শতকরা ৩৩ ভাগ ভোট। ইন্দোনেশিয়ায় সরকারি দল এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট বি জে হাবিবির দল পেয়েছে শতকরা ২৩ ভাগ ভোট। তিনটি ইসলামী দল এবং একটি ইসলামী দলের কোয়ালিশন পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ১৬ ভাগ, ৮ ভাগ, ৮ ভাগ এবং ৮ ভাগ অর্থাৎ মোট শতকরা ৪০ ভাগ ভোট।

এখানে উল্লেখ্য যে, বি জে হাবিবি নিজেই একজন ইসলামী পণ্ডিত হিসেবে গণ্য। তিনিই প্রায় একযুগ পূর্বে ইসলামী পণ্ডিতদের একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এদিক থেকে তার দলের এজেন্ডাতে রয়েছে প্রধানত ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও ইসলামী ধারাসমূহ। মূলত ইন্দোনেশিয়ার সকল দলের মধ্যেই রয়েছে ধর্মীয় ভিত্তি। কেননা, ইন্দোনেশিয়ার পঞ্চশীলার প্রথম দফা হচ্ছে এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস।

ইন্দোনেশিয়াতে আনুপাতিক নির্বাচনী ব্যবস্থা (Proportional representation) চালু আছে অর্থাৎ প্রত্যেক পার্টি যে হারে ভোট পেয়েছে সে হারে পার্লামেন্টে আসন পাবে। এদিক থেকে ভোটের হারের অনুপাতে উল্লিখিত দলসমূহের আসন থাকবে দেশের সংসদে। সামরিক বাহিনী পাবে শতকরা আট ভাগ আসন বা ৫০০ আসনের মধ্যে প্রায় ৪০টি। ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্রের এটা এমন একটা দিন যা গণতন্ত্রের সাথে মিল খায় না। ইন্দোনেশিয়ার জনগণও এটা চায় না; কিন্তু এটা পরিবর্তন করা যায়নি। সামরিক বাহিনীর আসন পূর্বে ছিল প্রায় ১০০টি। এটা এখন কমেছে আন্দোলনের কারণে; কিন্তু জনাব হাবিবি তার পরিস্থিতির কারণে এটাকে তুলে

www.pathagar.com

দিতে পারেননি। রাজনৈতিক দিক থেকে এ বিষয়টি জনাব হাবিবির জন্য একটি জটিল বিষয় ছিল।

জনাব হাবিবি যে একটি উত্তাল পরিস্থিতির পর দেশে মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে পেরেছেন এটা তার সাফল্যের একটি দিক। আইএমএফ-এর সাথে চুক্তি করে তিনি অর্থনীতিকেও কিছুটা সামলে নিয়েছেন। এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সামনের সরকার কি রকম হবে সে বিষয়টি। যদি মেঘবতী ক্ষুদ্র দলগুলোর সমর্থন পান তবে তিনিই প্রেসিডেন্ট হবেন। একই চেষ্টা হাবিবিও করবেন। তিনি সামরিক বাহিনীর সমর্থন পাবেন। যদি ইসলামী দলসমূহের ৪০ ভাগ সদস্যের সমর্থন তিনি পান তবে তিনিই প্রেসিডেন্ট হবেন। অন্য কেউ যে হবেন না, তাও বলা যায় না। কোন সমঝোতা প্রার্থী (Compromise candidate) বেরিয়ে আসতে পারেন। এ বিষয়টি সারা বিশ্বই গভীর আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করবে।

আমরা ইন্দোনেশিয়াকে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ মনে করি। এ দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক অনেক পুরানো। ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি, ইন্দোনেশিয়ার দলগুলো সমঝোতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেবে এবং ইন্দোনেশিয়াকে স্থিতিশীল রাখার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ২৬ জুলাই ১৯৯৯

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

আফগানিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কয়েকদিন পূর্বে কাবুলের তালেবান প্রশাসন নতুন করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তালেবান বিরোধীদের আয়ত্তাধীন এলাকার উপর হামলা করে। তারা কয়েকটি এলাকা দখল করে নেয়। কিন্তু আহমদ শাহ মাসুদের নেতৃত্বাধীন বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে পুনরায় নতুন করে তালেবান অধিকৃত সকল এলাকা থেকে তালেবানদের বিতাড়ন করে।

নতুন করে যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে প্রায় তিন লাখ লোক অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে এবং তারা পাঞ্জশীর উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এছাড়া দু'পক্ষে অসংখ্য লোক হতাহত হয়েছে। তালেবান পক্ষে প্রায় এক হাজার লোক নিহত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

ওআইসি এক বিবৃতিতে আফগানিস্তানে ব্যাপক জানমালের ক্ষতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় পুনরায় আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছে।

মাসখানেক পূর্বে তাসখন্দে দুই পক্ষের মধ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে আলোচনা শুরু হয়েছিল। তাতে পাকিস্তান, ইরান এবং আফগান সীমান্ত সংলগ্ন মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কোন অগ্রগতি ছাড়াই আলোচনা শেষ হয়ে যায়।

১৯৯৮ সালেও একবার দু'পক্ষের মধ্যে ইসলামাবাদে জাতিসংঘের উদ্যোগে আলোচনা হয় এবং তারা একটি চুক্তিতেও উপনীত হয়। চুক্তিতে স্বীকৃত হয়েছিল যে, দু'পক্ষ থেকে সমসংখ্যক আলেম নিয়ে একটি কমিশন হবে যারা অমীমাংসিত বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত দেবেন। কিন্তু তালেবান প্রতিনিধি দল কাবুলে ফিরে গিয়ে চুক্তি মেনে চলতে অস্বীকার করে। ফলে জাতিসংঘের ঐ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়।

আফগানিস্তানের বেদনাদায়ক পরিস্থিতির অবসান একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে তালেবান কর্তৃপক্ষের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। তারা যুদ্ধের মাধ্যমে

www.pathagar.com

গত তিন বছরে আফগান সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। তাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে, তারা একটি মিলিশিয়া বাহিনী, আফগানিস্তানের পুরানো রাজনৈতিক দলের একটি নয়। তালেবান কর্তৃপক্ষ কোন নির্বাচিত সরকারও নয়। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলীয় জোটকেও তাদের উপেক্ষা করা অনুচিত।

তালেবান কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধ পরিহার করে অন্য পক্ষের সাথে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আফগান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করতে হবে। লোক দেখানো আলোচনায় কোন ফল হবে না। আলোচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি জাতীয় সরকার গঠন করা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচন করা। জাতীয় সরকার গঠিত হলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং দেশের পুনর্গঠনও সম্ভব হবে।

জাতিসংঘকেও এ ব্যাপারে আরো তৎপর হতে হবে। ইরান ও পাকিস্তান যদি এ ব্যাপারে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হবে। এক্ষেত্রে এ দু'টি দেশকে তাদের পলিসির সমন্বয় করা প্রয়োজন।

আফগানিস্তানের মানবাধিকার পরিস্থিতির দিকেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নজর রাখতে হবে। তালেবান কর্তৃপক্ষের উচিত সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল নারী-পুরুষের স্বীকৃত মানবাধিকারের সম্মান করা। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা জাতিসংঘ এবং ওআইসির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৮ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

চেচনিয়া পরিস্থিতি

উত্তর ককেশিয়ার চেচনিয়ায় রাশিয়া পুনরায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকা দখল করে নিয়েছে। তারা চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনি দখল করবে কিনা তা কিছুদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হবে।

চেচনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির কারণ খোদ রাশিয়ার কিছু হাউজিং ব্লকে বোমা হামলা, যাতে কয়েকশ' ব্যক্তি নিহত হয়েছে। রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ এজন্য চেচনিয়ার যোদ্ধাদের দায়ী করেছে? অথচ এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তারা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। এর পূর্বে দাগেস্তান প্রজাতন্ত্রেও একদল লোক একটি এলাকা দখল করে নিয়ে সেখানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। রাশিয়া সামরিক অভিযান করে তাদেরকে হটিয়ে দেয়। এজন্যও রাশিয়া চেচনিয়াকে দায়ী করে। কিন্তু চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট আসলাম মাসখাদভ বলেছেন যে, এজন্য চেচনিয়া কোন অংশে দায়ী নয়।

১৯৯৪ সালে চেচনিয়া তৎকালীন প্রেসিডেন্ট দুদায়েভের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এর ফলে রাশিয়া এবং চেচেন জনগণের মধ্যে দু'বছরের মত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রায় এক লাখ লোক নিহত হয় এবং রাশিয়ারও অনেক সৈন্য নিহত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয় এবং চেচনিয়ার সাথে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়, যাতে চেচেনদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মূলত স্বীকার করে নেওয়া হয়। এর ফলে ১৯৯৬ সাল থেকে চেচনিয়ায় শান্তি বিরাজ করছিল। কিন্তু হঠাৎ করে রাশিয়া নতুন করে চেচনিয়ায় আক্রমণ শুরু করায় বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

মস্কোতে বোমা হামলার জন্য চেচেন জনগণ ও সরকারকে দায়ী করা হয় এবং এ কারণে চেচনিয়ার ওপর আক্রমণ করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। এর ফলে গোটা ককেশাস এলাকায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে, যার ফলাফল কারো জন্য ভাল হবে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৭৮২ সালে জার শাসিত রাশিয়া উত্তর ককেশাস-এ আক্রমণ পরিচালনা করে। প্রথমত রাশিয়ান কসাকদের সহযোগিতায় উত্তর ককেশাসের সমতলভূমি থেকে বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীকে

www.pathagar.com

ককেশাসের পার্বত্য অঞ্চলে ঠেলে দেওয়া হয়। সেখানে রাশিয়ান অভিযান বিপুল বাধার সম্মুখীন হয়। ১৭৮৪ থেকে ১৮৭৭ পর্যন্ত একশ' বছর এ প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে এবং ১৮৭৭ সালে দাগেস্তানে পরাজয়ের পর ককেশীয় প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এবং এ এলাকা রাশিয়ান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

একথা সুস্পষ্ট যে, এসব এলাকা মূলত রাশিয়ার অংশ নয় এবং এর জনগণও রাশিয়ান নয়। এ সকল এলাকা মূলত রাশিয়ান কলোনি এবং এর জনগণ প্রধানত মুসলিম। সুতরাং, এসব এলাকাকে রাশিয়ার কলোনি করে রাখার কোন যুক্তি নেই। এসব এলাকার জনগণের ইচ্ছা অনুসারে তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। যদি তারা স্বাধীনতা চায় তবে তা পাওয়া তাদের অধিকার। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানও তাই বলে।

আমরা আশা করি, রাশিয়া এ সত্য মেনে নেবে এবং এ অঞ্চলের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দেবে। আমরা আশা করি, জাতিসংঘ চেচনিয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে অবিলম্বে এগিয়ে আসবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ১১ অক্টোবর ১৯৯৯

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্ ওজালানের মৃত্যুদণ্ড

তুরস্কের একটি আদালত তুর্কি কুর্দিদের প্রধান নেতা আবদুল্লাহ্ ওজালানকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। তুরস্কের একটি দ্বীপে এ বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আদালতে প্রথমত একজন সামরিক অফিসার ছিলেন, পরে তাকে প্রত্যাহার করা হয়। আবদুল্লাহ্ ওজালান রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। আপিলে রায় যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তুর্কি সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে কিনা।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, তুরস্কে গণতন্ত্রের সত্যিকার বিকাশ না হওয়ার কারণেই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সে দেশে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে সরকারকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়। নাজমুদ্দিন আরবাকানের সরকার সামরিক বাহিনীর চাপের মুখে পদত্যাগ করেন। তেমনিভাবে তুরস্কের আদালত সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দিন আরবাকানের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আগামী পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ এবং রাফাহ্ পার্টিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এসব পদক্ষেপ তুরস্কের আদালতের বিশ্বাসযোগ্যতাকে সন্দেহজনক করে তোলে। এ সম্পর্কে অনেক মহলের অভিযোগ আছে।

তুরস্কের কুর্দিদের অধিকারও নানাভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। কুর্দি ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, তাদের ভাষার প্রগতি নানাভাবে রুদ্ধ করা হচ্ছে। এসব কারণেই কুর্দিদের যত অসন্তোষ। তারা এজন্যই বিগত কয়েক যুগ ধরে আন্দোলন করে আসছে। বিভিন্ন সময়ে তুরস্কে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং তাদের নীতির কারণেই সম্ভবত অনেক কুর্দি অস্ত্র হাতে তুলে নেয়।

কুর্দিদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে তুরস্কে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, কুর্দি এলাকায় স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও তাদের ভাষার সত্যিকার মর্যাদা দান। এসব না করার কোন সত্যিকার যুক্তি তুর্কি সরকারের নেই। আবদুল্লাহ্ ওজালান সে কথাই তার বিচারের সময় বলেছেন। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে কুর্দি অধিকার প্রদান সাপেক্ষে তুরস্কে কুর্দি সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

তুরস্ক সরকারের উচিত হবে সমস্যাটিকে রাজনৈতিকভাবে দেখা। ওজালানের হত্যা কোন সমস্যার সমাধান করবে না। এর ফলে তুরস্কে কুর্দিদের আন্দোলন নতুন মাত্রা পাবে। এ অবস্থায় সমঝোতার পথে অগ্রসর হওয়াই উত্তম। কুর্দিদের নেতা আবদুল্লাহ্ ওজালানকে তুরস্কের তুর্কি-কুর্দি সংঘাত দূর করার কাজে ব্যবহার করাই তুরস্ক সরকারের জন্য রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে, এ কথাই অনেকে বলেছেন। আশা করি, তুরস্ক সরকার বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করবেন এবং অধিকতর সংঘাতের পথে পা বাড়াবেন না।

দৈনিক অর্থনীতি, ৫ জুলাই ১৯৯৯

www.pathagar.com

অসলো সম্মেলন ও ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান

ফিলিস্তিন সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য ২ নভেম্বর তারিখে অসলোতে যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়েছেন। তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ইসরাইলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের অবদানের কথা স্মরণ করেছেন। সম্মেলনে ইসরাইলের বিশিষ্ট নেতা শিমন পেরেজ বলেছেন যে, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সমস্যা সমাধানের মূল বিষয়গুলো আলোচিত হবে। এসব বিষয় হচ্ছে জেরুজালেমে ফিলিস্তিনের রাজধানী, ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের তাদের দেশে ফেরার অধিকার এবং ফিলিস্তিনি এলাকায় ইহুদি বসতি প্রত্যাহার।

ফিলিস্তিন সমস্যা প্রায় এক শতাব্দীর। তবে সমস্যাটি গভীর হয় ১৯৪৭ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর। এ পর্যন্ত আরব ইসরাইলের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হয়নি। বর্তমান পর্যায়ের শান্তি আলোচনা ১৯৯১ সনে অসলোতে শুরু হয়। পরবর্তীতে আইজ্যাক রবিন ও ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের মধ্যে ওয়াশিংটনে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ শান্তি চুক্তিতে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার সমস্যা সমাধানের প্রধান মূলনীতি স্বীকৃত হয় এবং শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্ত করার একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। সে মোতাবেক এ আলোচনা ২০০০ সালেই সমাপ্ত হওয়ার কথা। মধ্যবর্তীকালে জনাব নেতানিয়াহু ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। জনাব ইহুদ বারাক শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। আশা করা যায় যে, তার আমলে শান্তি প্রক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধান এত দীর্ঘায়িত হওয়ার কোন যথার্থ যুক্তি দেখা যায় না। প্রথমত 'জমির বিনিময়ে শান্তি' (Land for peace) কথাটিই ভুল। বলা হচ্ছে, ইসরাইল জমি দিচ্ছে এবং ফিলিস্তিন পক্ষকে শান্তি দিতে হবে। এটা কেমন কথা? ইসরাইল তো এ জমির মালিক নয়। ১৯৪৭ সালের যে জাতিসংঘ প্রস্তাবে ইসরাইল রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে সে প্রস্তাবেও পশ্চিম তীর ও

www.pathagar.com

গাজা ইসরাইলের নয়। এ জমি তো ফিলিস্তিনিদের এবং এ জমি ইসরাইল জোর করে অস্ত্রের জোরে দখল করেছে। এটা ফেরত দিতে ইসরাইল আন্তর্জাতিক আইনে বাধ্য। এটা কোন দান নয়। এতদিন অন্যের স্থান দখল করে রাখা সম্পূর্ণ বেআইনি ও অনৈতিক। বিশ্বের কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সমর্থনের কারণে তা তারা করতে পেরেছে। সুতরাং, 'জমির বিনিময়ে শান্তি' শ্লোগানটি সম্পূর্ণ একপেশে ও ভুল। অথচ এ শ্লোগানই পাশ্চাত্য মিডিয়া ও শক্তিবর্গ ব্যবহার করছে।

যাহোক, পূর্ব জেরুজালেম যা পূর্বেও ইসরাইলের অংশ ছিল না বরং জর্দানের নিয়ন্ত্রণে ছিল তাকে নতুন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী হতে বাধা দেওয়া একেবারেই অসঙ্গত।

তেমনিভাবে পশ্চিম তীরে এবং গাজাতে ইসরাইলে ইহুদি নাগরিকরা কেন বসতি স্থাপন করবে? এর কোন যুক্তি ছিল না। সুতরাং, এসব বসতি ইসরাইলকে তুলে নিতে হবে এটাই স্বাভাবিক। ইসরাইলি নাগরিকরা কিভাবে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রে থাকবে, আবার তা হবে ইসরাইলি আইনের অধীন।

তেমনিভাবে যেসব ফিলিস্তিনি ১৯৪৮ সালের এবং ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে উদ্বাস্তু হয়েছে তারা কেন তাদের দেশে ফিরতে পারবে না। তাদের অবশ্যই তাদের দেশে ফিরতে দেওয়া উচিত। আমরা ফিলিস্তিনি পক্ষের দাবি খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। আশা করি, ইসরাইলি পক্ষ এসব দাবি মেনে নেবে। বিশ্বের সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দায়িত্ব ফিলিস্তিনিদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা। আমরা আশা করি, শান্তি প্রক্রিয়া আলোচনা যথাসময়ে শেষ হবে এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ০৬ নভেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

পূর্ব তিমুরের গণভোট ও স্বাধীনতা

১৯৭৫ সনের দিকে পূর্ব তিমুর ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃত্বে আসে। এর পূর্বে এ ক্ষুদ্র অঞ্চলটি পর্তুগালের কলোনি ছিল। পর্তুগালের কলোনি থাকা অবস্থায় এ এলাকার অধিকাংশ জনগণ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। এর পূর্বে এরা আদিবাসী ছিল। পর্তুগালের কর্তৃত্বে থাকা অবস্থায় পূর্ব তিমুরের উল্লেখ করার মত কোন উন্নয়ন হয়নি। শিক্ষা ও শিল্পের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ।

ইন্দোনেশিয়া কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর পূর্ব তিমুরে ব্যাপক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। বেশ উন্নতিও হয়, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো সরকার ছিল এক স্বৈরাচারী সরকার। তারা শক্তির মাধ্যমে পূর্ব তিমুরে তাদের কর্তৃত্ব বহাল রাখার চেষ্টা করে। জনগণকে জয় করার চেষ্টা করা হয়নি। যথাসময়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বায়ত্তশাসন দেওয়ারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পরিস্থিতি যা হওয়ার তাই হয়েছে। পূর্ব তিমুরে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। সশস্ত্র আন্দোলনও শুরু হয়। ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী শক্তি প্রয়োগে তা দমন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে ফল হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায় এবং সেখান থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে থাকে।

ইন্দোনেশিয়ায় হাবিবি সরকার ক্ষমতায় আসার পর জাতিসংঘের মাধ্যমে চুক্তি হয় যে, পূর্ব তিমুরে গণভোট হবে। তাতে প্রশ্ন করা হবে যে, তারা অধিকতর স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করবে কিনা। যদি গ্রহণ না করে তাহলে এলাকাকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

চুক্তি মোতাবেক গণভোট সংঘটিত হয়েছে। ফলাফলে দেখা যায় যে, শতকরা ৭৮ ভাগ 'স্বায়ত্তশাসন' প্রত্যাখ্যান করেছে অর্থাৎ স্বাধীনতার পক্ষে তাদের মত দিয়েছে। শতকরা ২১ ভাগ 'স্বায়ত্তশাসনে'র পক্ষে মত দিয়েছে।

ফলাফল প্রকাশের পরপরই ব্যাপক সংঘাত শুরু হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সাথে যারা থাকতে চান তারা 'গণভোটে'র ফল মানতে চাচ্ছেন না। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট বি জে হাবিবি ফলাফল মেনে নিয়েছেন এবং সেভাবেই পরবর্তী

www.pathagar.com

পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু সামরিক বাহিনীর অনেকেই তা মানতে পারছেন না বলে প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু বর্তমানে পূর্ব তিমুরের জন্য স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। শতকরা ৭৮ ভাগ জনগণের রায়ের বিপক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সবাইকে তা মেনে নিতে হবে। এছাড়া সংঘাত বাড়বে, ফল কিছু হবে না।

তবে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষের ২১ ভাগ লোকের নিরাপত্তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দু'দল লোকের মধ্যে সমঝোতা করতে হবে। এজন্য সময় দরকার; গণতন্ত্র দরকার। কেবল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই দু'দল লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা আংশিক হলেও মিটাতে পারবে। আমরা মনে করি যে, জাতিসংঘের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যারা এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সমালোচনার মাধ্যমে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করবে। আমরা আশা করি, সকল সমস্যা কাটিয়ে উঠে এ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ০৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

আলজেরিয়ায় সমঝোতার জন্য গণভোট

বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন প্রেসিডেন্ট আব্দুল আজিজ বুতাফলিকার প্রস্তাব মোতাবেক আলজেরিয়ায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণভোটে প্রেসিডেন্টের শান্তি উদ্যোগের প্রতি জনগণের সমর্থন চাওয়া হয়েছে। প্রেস এজেন্সির খবরে দেখা যায় যে, জনগণ এ নির্বাচনে কতটুকু অংশগ্রহণ করেছে তাতে সন্দেহ থাকলেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে শান্তি উদ্যোগকে সমর্থন করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৯২ সাল থেকে আলজেরিয়ায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে। সংঘর্ষের একদিকে রয়েছে আলজেরিয়ার সামরিক জান্তা এবং অন্যদিকে ইসলামি স্যালভেশন আর্মি, আর্মড ইসলামিক গ্রুপ এবং অন্যান্য সংগঠন। ১৯৯২ সালের নির্বাচনে ডা. আব্বাস মাদানীর নেতৃত্বে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করে। কিন্তু আলজেরিয়ার সামরিক বাহিনী নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে। ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে এবং তার কর্মীদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান পরিচালনা করে। এরই ফলে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট-এর সমর্থকরা সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। ইতোমধ্যে প্রায় ১ লাখ লোক এ সংঘর্ষে নিহত হয়েছে।

এ রক্তপাতের পরেও সামরিক বাহিনী পুরাপুরিভাবে এ বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়। এ কারণেই সামরিক বাহিনী প্রেসিডেন্ট আব্দুল আজিজ বুতাফলিকাকে শান্তি উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। প্রেসিডেন্টের শান্তি উদ্যোগে অতীতকে ভুলে গিয়ে নতুন করে জাতীয় পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে। সকল রাজনৈতিক দল ভবিষ্যতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে। এ প্রক্রিয়ার প্রতি ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট ও তার সামরিক শাখা ইসলামিক স্যালভেশন আর্মির সমর্থন রয়েছে, যদিও তারা প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়।

আলজেরিয়ায় সংঘটিত গত আট বছরের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন অন্যায়ভাবে বাতিল করা হয়েছিল এবং গণতান্ত্রিকভাবে একটি দলকে ক্ষমতা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। সেখানে মানবাধিকার

www.pathagar.com

গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। অসংখ্য লোককে সামরিক বাহিনী ও তার সহযোগীরা হত্যা করেছে।

অথচ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ গণতান্ত্রিক নির্বাচন বাতিল ও পরবর্তী হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদ বা ভূমিকা গ্রহণ করেনি। যেমন তারা করেছে পূর্ব তিমুরের ক্ষেত্রে এবং বিলম্ব করে হলেও করেছে কসোভো ও বসনিয়ার ক্ষেত্রে। জোরালো অভিযোগ রয়েছে যে, ইউরোপের একটি শক্তি তার গোয়েন্দাদের মাধ্যমে আলজেরীয় সৈন্যবাহিনীর দ্বারা এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। ঐ ইউরোপীয় শক্তি সামরিক জান্তাকে যেভাবে অস্ত্র ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে তা থেকেই ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়।

পূর্ব তিমুরে ইন্দোনেশীয় সৈন্যবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে যেভাবে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য বিচারের দাবি উঠেছে একই বিচার আলজেরিয়ার সৈন্যবাহিনীর অপরাধীদের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত। আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে এ যুগে আর মানবতার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ মেনে নেওয়া যায় না।

আলজেরিয়ার নতুন প্রেসিডেন্টের শান্তি উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আশা করি আলজেরিয়ার সকল রাজনৈতিক দল ও মতের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে আলজেরিয়া পরিচালিত হবে এবং শান্তি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার নির্বাচনী ফলাফল

মাসখানেক পূর্বে হঠাৎ করে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেন। সে মোতাবেক গত ২৯ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩০ নভেম্বর ফলাফল ঘোষিত হয়। নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী মাহাথিরের ন্যাশনাল ফ্রন্ট ১৯৩টি আসনের মধ্যে ১৪৮ আসন পেয়েছে। পূর্ববর্তী নির্বাচনে মাহাথির সাহেবের এলায়েন্স ১৬৬টি আসন পেয়েছিল। অন্যদিকে মালয়েশিয়ার বিরোধী দলীয় এলায়েন্স পেয়েছে ৪৫টি আসন। পূর্ববর্তী নির্বাচনে বিরোধী দল পেয়েছিল ২১টি আসন অর্থাৎ বিরোধী দলের আসন সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

মালয়েশিয়ার পূর্ববর্তী উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহিমকে পদচ্যুত করা, উমনো (UMNO) দল থেকে বহিষ্কার করা এবং মালয়েশিয়ার জেলে পুলিশ প্রধান কর্তৃক আনোয়ারকে প্রহারের পর বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। মালয়েশিয়ার ভিতরেও অনেক প্রতিবাদ হয়। এ প্রেক্ষিতেই শেষ পর্যন্ত এ নির্বাচন হয়।

নির্বাচনে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বিরোধী দলকে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য মাত্র ৭ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। এটা নিঃসন্দেহে খুব কম সময়। গণতান্ত্রিক দেশে আর কোথাও এত কম সময় দেওয়া হয় না। এটা বিরোধী দলকে যথেষ্ট অসুবিধায় ফেলেছিল। বিরোধী দল এ ব্যাপারে অভিযোগও করেছে।

আনোয়ার ইবরাহিমের স্ত্রী এবং মালয়েশিয়ার প্রধান বিরোধী নেত্রী ফলাফলকে বিরোধী দলের জন্য ভাল বলে উল্লেখ করেন। তবে ৬,৮০,০০০ নতুন ভোটারকে তালিকাভুক্ত না করা এবং সরকারি টেলিভিশনে আতঙ্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টার নিন্দা করেন। এসব কারণে বিরোধী দল জয়লাভ করতে পারেনি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, বিরোধী দলীয় এলায়েন্সের শরীক ইসলামী দল পিএএস (PAS) ১১টি প্রদেশের মধ্যে দু'টি প্রদেশে প্রাদেশিক আইন সভা দখল করেছে। এ দু'টি প্রদেশে তারাই ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার নির্বাচনী ফলাফলে এটা সুস্পষ্ট যে, প্রধানমন্ত্রী মাহাথিরের সমর্থন বেশ হ্রাস পেয়েছে। কেবল তাদের আসনই হ্রাস পায়নি, মালয় ভোটের প্রায় অর্ধেক তারা হারিয়েছে। অন্যদিকে মালয়েশিয়ার বিরোধী দল তাদের আসন ও ভোট সবই বৃদ্ধি করেছে। এ প্রেক্ষিতে মাহাথির সরকারের উচিত তাদের পলিসি পুনর্বিবেচনা করা। বিশেষ করে আনোয়ার ইবরাহিম সম্পর্কিত তাদের নীতি। আনোয়ার ইবরাহিমকে এভাবে জেলে রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাকে জেলে আটকিয়ে না রেখেও নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব। বিষয়টি অবশ্যই মালয়েশিয়ার সরকারকে বিবেচনা করতে হবে। আনোয়ারের মত যোগ্য প্রভাবশালী নেতাকে এভাবে বেশি দিন রাজনীতি থেকে দূরে রাখা মালয়েশিয়ার জন্য কল্যাণকর নয়।

বাংলাদেশের জন্যও এ নির্বাচন থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। এ নির্বাচনে কোন ভোট জাল ও মাস্তানির অভিযোগ দেখা যায়নি। বাংলাদেশেও নির্বাচনী ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য সমগ্র জাতিকে এবং প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। তাতেই দেশে সুষ্ঠু রাজনীতি ফিরে আসার পথ প্রশস্ত হবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

পূর্ব তিমুরের সর্বশেষ পরিস্থিতি

পূর্ব তিমুর পরিস্থিতির নাটকীয় এবং বেদনাদায়ক পরিবর্তন হয়েছে। দু'সপ্তাহ পূর্বেও কেউ ভাবতে পারেনি যে, পূর্ব তিমুরে এরকম হতে পারে। ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্মতিতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট হয়। গণভোটের ফলাফল সকলেরই জানা আছে। শতকরা ৭৮ ভাগ জনগণ পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়। প্রেসিডেন্ট হাবিবি গণভোটের ফলাফল মেনে নেন। এরপর আর কোন বড় অঘটন ঘটবে বলে কেউ মনে করতে পারেনি।

কিন্তু তারপরই শুরু হয় নাটকীয় ঘটনা। পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা বিরোধী মিলিশিয়া দলসমূহ শান্তিপূর্ণ গণভোটে সম্মতি দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল; কিন্তু তারা তা রক্ষা করেনি। গণভোটের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারা পূর্ব তিমুরের প্রধান শহর দিলি, অন্যান্য শহর ও অঞ্চলে হত্যা, পোড়ানো ও ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠে। টেলিভিশন চিত্র থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ দিলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইন্দোনেশীয় সৈন্যবাহিনীর যে অংশ তিমুরে মোতায়েন আছে তারা মিলিশিয়াদের দমন ও নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া রাজধানী শহর ধ্বংস করে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। সকল মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে যে, ধ্বংসযজ্ঞে ইন্দোনেশীয় সৈন্যবাহিনী সহায়তা দিয়েছে এবং অংশ নিয়েছে। ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আলতাস নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ইন্দোনেশীয় সৈন্যবাহিনীর কিছু দুষ্কৃতিকারী এজন্য দায়ী।

পূর্ব তিমুরের জনগণ এ পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ে। কিছু লোক পাহাড় জঙ্গলে চলে যায়। কিছু লোক ঐসব অঞ্চলে চলে যায়, যেখানে স্বাধীনতাপন্থী যোদ্ধারা শক্তিশালী। ইন্দোনেশীয় সৈন্যবাহিনী কিছু লোককে পশ্চিম তিমুরে অপসারণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে কি অবস্থা, কত লোক নিহত হয়েছে এবং কত লোক উদ্বাস্তু হয়েছে তা ভবিষ্যতেই জানা যাবে।

এ অবস্থায় সারা বিশ্ব দাবি জানায় যে, পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ শান্তিবাহিনী মোতায়েন করতে হবে। ইন্দোনেশীয়রা সৈন্যবাহিনী কিছু লোককে পশ্চিম

www.pathagar.com

তিমুরে অপরসারণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে কি অবস্থা এবং কত লোক নিহত হয়েছে এবং কত লোক উদ্বাস্তু হয়েছে তা ভবিষ্যতেই জানা যাবে।

এ অবস্থায় সারা বিশ্ব দাবি জানায় যে, পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ শান্তিবাহিনী মোতায়েন করতে হবে। ইন্দোনেশীয়ার এ ব্যাপারে রাজি হতে চাচ্ছিল না। কিন্তু ইন্দোনেশীয় সৈন্যবাহিনীর ব্যর্থতা ও বিশ্বের চাপের সামনে ইন্দোনেশীয় কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করেছে এবং জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েনে সম্মত হয়েছে। এ ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবেই পাস হবে। এর পরপরই প্রধানত এশীয় দেশসমূহের সৈন্য সমন্বয়ে জাতিসংঘ বাহিনী পূর্ব তিমুরে প্রবেশ করবে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ইন্দোনেশীয় সৈন্যবাহিনী পূর্ব তিমুরে যা করেছে তা একেবারে সুস্পষ্ট। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে যে, সুহার্তো আমলে এ সৈন্যবাহিনী একই আচরণ তিমুরে, আচেনে এবং ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় করেছে। স্বৈরাচারী সরকারের আমলে সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে। তখন কিছু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। কেননা সুহার্তো স্বৈরাচারী হলেও তাদের বন্ধু ছিল। পাশ্চাত্যের দু'মুখো নীতি খুবই পুরাতন। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত হাই কমিশনার মেরি রবিনসন সাবেক যুগোস্লাভিয়ার বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধাপরাধের বিচার করার জন্য যে ধরনের 'যুদ্ধাপরাধ বিচারালয়' (War crime tribunal) স্থাপন করেছিলেন পূর্ব তিমুরের অপরাধীদের বিচারের জন্য সেরকম ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের দাবি করেছেন। এ দাবি যথার্থ। আমরা মনে করি যে, জাতিসংঘ অবিলম্বে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের যেখানেই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হবে সেসব স্থানেই অপরাধীদের বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইতিহাসের এ পর্যায়ে এসে মানবতার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। জাতিসংঘের এ ব্যাপারে সকল স্থানে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

দৈনিক অর্থনীতি, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়ায় সর্বশেষ নির্বাচনী অবস্থা

ইন্দোনেশিয়ার বিগত ৭ জুন নির্বাচন হয়। তিন মাস পর নির্বাচনী কমিশন ফলাফল ঘোষণা করেছে। কোন নির্বাচনের এত বিলম্বে চূড়ান্ত ঘোষণা প্রায় একটি রেকর্ড।

যাহোক, ফলাফলে দেখা যায় যে, মেঘবতী সুকর্নপুত্রীর নেতৃত্বাধীন ডেমোক্রেটিক পার্টি পার্লামেন্টে ১৫৩টি আসন পেয়েছে। প্রেসিডেন্ট বি জে হাবিবির নেতৃত্বাধীন গোলকার দল ১২০টি আসন লাভ করেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে দু'টি ইসলামপন্থী দল অর্থাৎ ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট পার্টি ৫৮টি আসন পেয়েছে এবং ইসলামিক এওয়েকেনিং পার্টি পেয়েছে ৫১টি আসন। অন্যান্য ক্ষুদ্র ইসলামী দলসমূহ বাকি আসনগুলো পেয়েছে। মোট ৪৬২টি আসন নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। ৫০০ আসনের বাকি ৩৮টি আসন সেনা কর্মকর্তারা পাবে।

ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনীর পূর্বে পার্লামেন্টে ১০০ আসন ছিল। এটা কোনভাবেই গণতান্ত্রিক ছিল না। যেসব কারণে সুহার্তো তার ক্ষমতা ৩০ বছর পাকাপোক্ত করে রেখেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল সামরিক বাহিনীর ১০০ আসন। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ সুহার্তোকে এতদিন ধরে সহায়তা ও সমর্থন দিয়ে আসছিল। এটা অত্যন্ত দুঃখের যে, পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ প্রয়োজনে গণতন্ত্রের কথা বলে আবার তাদের প্রয়োজনে জনমত উপেক্ষা করে স্বৈর শাসকদের সমর্থন করে।

সুহার্তোর পতনের পর জনগণের দাবি ছিল সামিরক বাহিনীর আসন সংখ্যা বাতিল করা হোক। এটা প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের দাবি ছিল। কিন্তু বি জে হাবিবির পক্ষে সামরিক বাহিনীর সকল আসন সংখ্যা বাতিল করা সম্ভব হয়নি। তবুও এটি তার সাফল্যই বিবেচনা করতে হবে যে, সামরিক বাহিনীর আসন সংখ্যা তিনি কমাতে সক্ষম হয়েছেন।

জনাব হাবিবি একটি উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে দেশের নির্বাচন করাতে সমর্থ হয়েছেন। এটা তার সাফল্য। তিনি অর্থনীতিকেও মোটামুটি সামলে নিয়েছেন। এ বছর ইন্দোনেশিয়ার কৃষি ফসল ও পাম তেলের উৎপাদনও ভাল হয়েছে।

www.pathagar.com

এখন ইন্দোনেশিয়ার সামনে একটি বড় ইস্যু হচ্ছে দেশের পরবর্তী সরকার। অর্থাৎ কে দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। এক্ষেত্রে মেঘবতী ও জনাব হাবিবি দু'জনেরই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এটা প্রধানত নির্ভর করছে ইসলামী দলগুলো এবং সামরিক বাহিনী কাকে সমর্থন করে তার ওপরে। জনাব হাবিবির সুহার্তো সরকারের অংশ হওয়ায়, এটা তার জন্য একটি সমস্যা। তবে জনাব হাবিবির যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে এবং ইসলামী বুদ্ধিজীবী হিসেবে সবসময়ই একটি ইমেজ ছিল। অন্যদিকে মেঘবতী ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট আহমদ সুকর্নোর কন্যা। চীন ও অন্যান্য দেশে কোন কোন ব্যক্তি তাকে ক্ষমতায় দেখতে চান। চীনের পরোক্ষ সমর্থনের কারণ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ায় চীনারা সুকর্নোপুত্রীর দলে আছেন।

পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় বলা সম্ভব নয়। তবে কোন সমঝোতা প্রার্থী বেরিয়ে আসে কিনা এটাও দেখার বিষয়। তবে যে সরকারই হোক না কেন তা হবে গণতান্ত্রিক। কিছুটা ইসলামিক সরকার। ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতির ভিত্তি পঞ্চশীলা। তাই রাজনৈতিক দলসমূহের মতপার্থক্য এত ব্যাপক নয়। পঞ্চশীলার প্রধান তিনটি দফা হচ্ছে এক আল্লাহয় বিশ্বাস, গণতন্ত্র ও সামাজিক সুবিচার।

ইন্দোনেশিয়া আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ। আমরা আশা করি, ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো সমঝোতার পথে অগ্রসর হবে এবং দেশে স্থিতিশীলতা অব্যাহত রাখবে।

দৈনিক অর্থনীতি, ০৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

ইরাক অবরোধ প্রত্যাহার করুন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন পুনরায় ইরাকের ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে। এর ফলে ১৬ ও ১৭ আগস্ট ইরাকে ২০ জন নিহত হয়েছে। এর পূর্বে ইউএন চিলড্রেন ফান্ড-এর রিপোর্টে দেখা যায়, ইরাকের ওপর অবরোধের কারণে কয়েক লাখ শিশু যথাযোগ্য ওষুধ, খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে মারা গেছে। যারা বিবিসি টেলিভিশনে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেখেছেন তারা জানেন যে, পরিস্থিতি কত ভয়াবহ। হাসপাতালের রোগীদের অবস্থা দেখে কারো স্থির থাকা সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতির কারণ কি? কিভাবে এর সমাপ্তি হতে পারে?

ইরাক যখন কুয়েতে হামলা করে তখন জাতিসংঘ ইরাকের ওপর অবরোধ আরোপ করে। জাতিসংঘ শর্ত আরোপ করে যে, যতক্ষণ ইরাক তার সকল বিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস করবে না ততদিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকবে।

তারপর পানি অনেক গড়িয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে প্রায় ১০ বছর পূর্বে। জাতিসংঘের পরিদর্শক দল ইরাকে প্রেরণ করা হয়। তারা কয়েকশ' স্থান পরিদর্শন করে এবং যেসব বিধ্বংসী অস্ত্র ছিল তা তাদের তত্ত্বাবধানে ধ্বংস করা হয়। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, জাতিসংঘের পরিদর্শক দলের কিছু আমেরিকান সদস্য তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। তারা দাবি করে যে, প্রেসিডেন্টের প্রাসাদসমূহে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এসব ছিল অত্যন্ত অবাস্তব বক্তব্য। ইরাক এসব দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

ইরাক দাবি করে যে দলের নেতা মিঃ বাটলার আমেরিকান এজেন্ট এবং আমেরিকার স্বার্থে কাজ করছেন। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরাকের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। জাতিসংঘ পরিদর্শক দলকে ইরাকের প্রেসিডেন্টের প্রাসাদসমূহ দেখতে দেওয়া হয়; কিন্তু তাতে কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু মিঃ বাটলার বলতে থাকেন যে, কোথাও না কোথাও অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাই আরো পরিদর্শন লাগবে এবং অবরোধ প্রত্যাহার করা যাবে না। জনাব বাটলারের রিপোর্ট আগেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ফাঁক করে দেওয়া হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র গত রমযানে ইরাকের ওপর বিমান হামলা শুরু করে। বৃটেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে। বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা

www.pathagar.com

পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য একঘরে হয়ে যায়। ফ্রান্স, চীন ও রাশিয়া বিমান হামলার নিন্দা করে এবং অবরোধ প্রত্যাহারের দাবি জানায়। মিঃ বাটলারকে ইরাক বের করে দেয়। ইরাকের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলার কোন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা সমর্থন নেই। যুক্তরাষ্ট্র বোধ হয় আজকাল বিশ্বজনমতকে কোন তোয়াক্কা করে না। করলে তারা বুঝতে পারবেন যে, ইরাকে তাদের বর্তমান পলিসি বিশ্বজনমতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু এর মানে এ নয় যে, সাদ্দামের স্বৈরশাসন ও ডিক্টেটরশিপকে কেউ পছন্দ করে। না, তা নয়। বিশ্ব জনমত ইরাকে গণতন্ত্র কামনা করে এবং তা একদিন ইরাকের জনগণের চেষ্টায় হবে।

ইরাকের ওপর অবরোধ অবিলম্বে তুলে নেওয়া প্রয়োজন। নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য তাই চায়। বিশ্ব জনমতও তাই চায়। এর বিরোধিতা করা যুক্তরাষ্ট্রের উচিত নয়।

অন্য একটি সমস্যা বিশ্বকে ভাবতে হবে। একবার একটি অবরোধ প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে পাস হয়ে গেলে তা প্রত্যাহার করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বজনমত এক হয়ে গেলেও তা পারা যাচ্ছে না। সুতরাং, এটা বিবেচনার দাবি রাখে যেন অবরোধ প্রস্তাব পাসের সময়ই কিছু শর্ত আরোপ করা হয়, যা পালিত হয়ে গেলে স্বতঃই অবরোধ অকার্যকর হয়ে যায়। বিষয়টি সকল রাষ্ট্রের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

দৈনিক অর্থনীতি, ০৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯